শ্রীরামকৃষ্ণ : নৈঃশব্দ্যের রূপ

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়

ভাষান্তর

সুবর্ণরেখা ॥ কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৩

প্রকাশক : ইন্দ্রনাথ মজুমদার
সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : তাপস কোনার

গ্রন্থপরিচয় : অমলেন্দু ঘোষ

মুদ্রক : প্রণতি ঘোষ
জুবিলি প্রিন্টার্স, ১২৪ অখিল মিস্ত্রি লেন,
কলিকাতা-৯

আমার কথা

মার্কিন মুলুকে চিরপ্রবাসী ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় স্বনামধন্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের তিরিশ-চল্লিশ বছর পর তিনি স্বদেশে এসেছিলেন ঠাকুরের প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধ অনুসন্ধিৎসার মনোভাব নিয়ে। ততদিনে বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ এবং দেশ-বিদেশের নানা মনীষীর কলমে ও রসনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ইয়োরোপ-আমেরিকায় বহু আলোচিত ও 'বিখ্যাত ব্যক্তি'। ধনগোপাল এসে কিছুদিন থাকলেন বেলুড় মঠে, সন্ন্যাসীদের আচার আচরণ লক্ষ্য করলেন। ঠাকুরের বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তথ্য সংগ্রহ করলেন, নানাজনের কাছ থেকে। শুধু তাই নয়, শ্রীম-র পরামর্শে দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী অঞ্চলে কিংবদন্তি ও জনশ্রুতি কুড়িয়ে বেড়ালেন, কারণ প্রকৃত ইতিহাস ও সত্য নাকি এইসব কিংবদন্তি ও জনশ্রুতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। এইসব শ্রমসাধ্য সংগ্রহ এবং প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ফলশ্রুতি তাঁর *Face of Silence* (1926) বইখানি। প্রাক্-তিরিশের দশকে সাগরপারে গ্রন্থটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন সাড়া পড়ে গেল যে চাহিদা অনুযায়ী এ-দেশে তার কপি পাওয়া গেল না।

তাঁর সংগৃহীত তথ্যের অনেকটাই অবশ্য আজকের দিনে আর নতুন বা অজানা বলে মনে হয় না। অনেকটাই আবার আকর গ্রন্থের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু তবু অন্যদিকে কৌতূহল জাগে। ধনগোপালের সময়ে—আজ থেকে মাত্র পা ষাট বছর আগে—আমাদের হালচাল ও সমাজ-সংস্কৃতির চেহারাটা ভিন্ন ছিল। ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসা। আজও কি আছে, কেননা চিরকাল তা কিছু-না কিছু থাকেই। তবে কিনা আজ চেহারাটা পালটেছে। এমন কি চরিত্রও। আর যাই হোক, 'অকৃত্রিম' ক আর প্রাণ খুলে বলা যায় না।

ঠাকুরের দেহত্যাগের চল্লিশ বছর পর ধনগোপাল 'অবতার' নিয়ে আলোচনা করেছেন, যদিও উনিশ শতকে ঠাকুরের জীবদ্দশায় শাস্ত্র অনুযায়ী সেটা প্রমাণিত। ঠাকুরের অসাধারণ ভক্তশিষ্যদের মধ্যেও এই প্রত্যয় দৃঢ় ছিল যে তিনি শুধু অবতার নন, অবতারবরিষ্ঠ। তবু যে ধনগোপাল 'অবতার' প্রসঙ্গ তুললেন সে কেবল পশ্চিমের মেমসায়েবদের জন্যে। কারণ ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরের অবতরণ ব্যাপারটি যত সহজগ্রাহ্য, খ্রীস্টীয় ঐতিহ্যে ততই অভাবনীয়: Son of God আমাদের কাছে অবতার বলে পূজনীয় হতে পারেন, কিন্তু পশ্চিমের ধর্মীয় ঐতিহ্যে অবতারবাদ অখ্রীস্টীয়।

কিন্তু তৎকালে সমাজের যাঁরা ঠাকুরের কাছে ভিড় করতেন, তাঁরা তাঁকে কী ভাবে দেখতেন? বড় জোর মস্ত বড় সাধু-সন্ত কিংবা অসাধারণ—ইত্যাদি। এগুলোর ব্যাখ্যা এক-একজনার কাছে এক-একরকম। ঠাকুরও যে এসব না-বুঝতেন তা নয়। তাই কারু-কারুকে বলতেন: যাও, যাও, বাগান-বিলডিং ঘুরে ছাখো। কিন্তু জেনে অবাক লাগে যে তৎকালীন শ্রদ্ধাবানেরাও ঠাকুরকে সম্বোধন করতেন 'ও মশায়' বা 'হ্যাঁ মশাই' বলে। এই রকমই রীতি ছিল। সেইজন্যে অসামান্য কথামৃত-লেখক পূজনীয় শ্রীম ছিলেন 'পণ্ডিত' বা 'পণ্ডিতমশাই'। ঠাকুর ডাকতেন—'ও মাস্টার'।

কথাটা পুরনো হলেও সত্য যে, ভাষান্তরের মধ্যে মূল জিনিসটার সৌরভ যায় নষ্ট হয়ে। কিংবা যা থাকে তা সামান্যই। অনেক সময় মূল জিনিসটাই যায় শুকিয়ে। বিশেষত তা যদি হয় কোনো দেশের ধর্ম-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে। ধনগোপালের ইংরেজি গ্রন্থটির ব্যাপারেও সেই একই কথা। মেমসায়েবদের বোঝাতে গেলে এ-রকম না-হয়ে উপায় নেই। সেইজন্যে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মতো আধ্যাত্মিক 'মুক্তি' বা 'মোক্ষ' বোঝাতেও 'ফ্রিডম' কথাটা ব্যবহার করতে হয়। মার্কিনীদের ব্রহ্ম, অমৃত, অজ্ঞেয় তর্জমায় বোঝাতে গিয়ে তিনি গলদঘর্ম! কিন্তু সমাধি যে Samadhi, সেটা ভারতবর্ষের পয়লা নম্বরী সাধুদের সঙ্গলাভের ফলেই তিনি জেনেছিলেন, নয়তো Trance লিখতেন। তাছাড়া আমাদের শাস্ত্র-পুরাণ থেকে বিশেষ বিশেষ শ্লোক ও স্তব সংগ্রহ করে ইংরেজিতে পদ্যাকারে সাজানো—সে কি চাট্টিখানি কথা।

ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তরণের সময়ে সেই একই কেলেঙ্কারি অবস্থা। কানটা আমাদের পরিচিত শ্লোক ও স্তব, কোনটা লোকগাথা বা রামপ্রসাদী—মসায়েবদের ভিড়ে তা ঠাহর হয় না। এমন কি ঠাকুরের কথামৃতও না। এই নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ইত্যাদি গ্রন্থ আকরগ্রন্থ সেবে যথাসম্ভব ব্যবহৃত হয়েছে। যথাসম্ভব মানে সর্বত্র যে তা সম্ভব হয়নি া বলাই বাহুল্য, এবং সে কেবল প্রসঙ্গ ও রচনার পারম্পর্য রক্ষার্থে। তাছাড়া এটাও স্মর্তব্য যে অনুবাদ শুধু ভাষান্তর নয়, সেও এক সৃষ্টিকর্ম। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তা জানা যায়। অভিজ্ঞতাই বলে, বাংলা ও ইংরেজি গীতাঞ্জলির সৃষ্টিকর্তা দু'জন। এক আধারে, এক নামে।

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

উৎসর্গ

প্রয়াত শিক্ষাগুরু

ব্রহ্মর্ষি শ্রীনরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে

স্নেহধন্য সলিল

প্রথম পরিচ্ছেদ

রামকৃষ্ণ মঠ

তিনি এমন এক সাধু তাঁর ভক্ত শিষ্যরা তাঁকে বলতেন ঈশ্বরের অবতার। ভাবতে অবাক লাগে এই সেদিনও তিনি ছিলেন কলকাতার কাছেই। তার চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এই বিশ শতকের আধুনিক প্রগতির ঠিক মধ্যিখানে বসে মধ্যযুগীয় জীবনযাপন করছেন তাঁর যেসব উত্তরসাধক তাঁদের প্রত্যক্ষ করবার জন্য আমাকে সুদূর আমেরিকা থেকে ফিরে আসতে হলো। কলকাতা নগরীর উপকণ্ঠে বসবাস করেন এইসব সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা। আধুনিক কলকাতাকে ঘিরে সকল মূল বিষয়ে এঁদের যোগাযোগ থাকলেও সকল ব্যাপারে এঁরা কেমন সহজে উদাসীন থাকেন। যাই হোক, সকল ইতিবৃত্ত আমার কাছে যেমন উদ্ঘাটিত হয়েছে একটু একটু করে আমি তার বিবরণ দিচ্ছি।

রামকৃষ্ণ মঠে থাকেন তাঁর অনুগামীরা। জনৈক বন্ধুর সহৃদয়তায় আমি একবার মঠে এসে থাকবার আমন্ত্রণ পেলাম। কলকাতার গঙ্গার দিক থেকে, আমরা যখন নৌকোয় এগোচ্ছিলাম, মঠটিকে মনে হলো আশ্চর্য। অস্ত সূর্য-রঞ্জিত রক্তিম আকাশ। আকাশের গায়ে সারি সারি তালগাছ। গাছের মাথা ছাড়িয়ে শুভ্র মেঘের মহনীয়তা নিয়ে নূতন মন্দিরের চূড়ো। নিচে গঙ্গার পাড়ে ধূসর-হলুদ রঙের উঁচু উঁচু পাথরের সারি, তার গা ঘেঁষে গঙ্গা বয়ে যায় ধীরে। আমাদের নৌকো খুব তাড়াতাড়ি মাঝ-গঙ্গা পেরিয়ে এলো। এখন মঠের প্রত্যেকটি বাড়ির হলুদ রঙের চূড়ো দেখা দিল। সব শেষে শ্বেতশুভ্র মায়ের মন্দির, পাতলা রুপোলি ঘোমটার মতো নিমেষের জন্য চোখে পড়লো।

এমন আড়াল-করা উঁচু পাড় যে পাড়ের কাছে আসতেই হঠাৎ সবকিছু অদৃশ্য। নৌকো থেকে ঘাটে নেমে আমরা তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলাম। কারণ বড্ডো দেরি হয়ে গেছে আমাদের, সন্ধ্যারতির সময় হয়ে এলো। একেবারে উপরে উঠে দেখলুম ধূসর রঙের সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা। তা থেকে একটা ছোট্ট পথ সোজা মন্দিরের দিকে। মন্দিরের ওদিকে ঝলসে উঠলো গ্রীষ্মপ্রধান বাগানের তীব্র তীক্ষ্ণ সবুজ। রক্তিম সন্ধ্যা তখন আকাশ থেকে নামছে ডানায় ভর করে। চুপিসাড়ে। তারই স্পর্শে সবুজের তীক্ষ্ণতা মিশলো হালকা সোনার নমনীয়তায়।

ঠিক তক্ষুনি মন্দিরের ঘণ্টা বাজলো। আমরা তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলুম। আরতি শুরু হয়ে গেছে। মন্দিরের দুটো অংশ : অন্দর ও বাহির। বাইরের অংশে লাল-কমলায় রঞ্জিত মেঝের উপর বসে আছেন মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীর দল। আমরা তাঁদের পাশে বসে পড়লুম। সমবেত করতাল, মন্দ্রিত স্তবগান। মন্দিরের ভিতরে অর্থাৎ গর্ভমন্দিরে পীতবস্ত্র পরিহিত একজন সন্ন্যাসী। তিনি পুষ্পমাল্যখচিত বেদীর উপর রামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতিতে পঞ্চপ্রদীপ দোলাচ্ছেন। বেদীর চারদিকে অসংখ্য ঘৃতপ্রদীপ। প্রদীপশিখার সৌগন্ধ্য ঠাকুরের প্রতিকৃতিকে স্পর্শ করছে। এই আলোকমালার মধ্যে দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি একটি অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি করে : পরিপূর্ণ জীবন সত্ত্বেও যেন জড়ের মতো নিশ্চেতন।

'এই অবস্থা তিনি কী করে পেলেন?' নিজের মনেই ভাবতে লাগলুম। ঠিক আছে, পরে তাঁর জীবনধারা খতিয়ে দেখা যাবে। এইসব ভাবছি, অমনি ঝনঝন করতাল থামলো, থামলো সমবেত স্তবগান। গর্ভমন্দিরে পঞ্চপ্রদীপের নাচও বন্ধ হলো। সন্ন্যাসী হাতে তুলে নিলেন শঙ্খ। তিনবার বাজালেন। শঙ্খের মন্দ্রিত ধ্বনি মিলিয়ে যেতেই তিনি বেদীর সামনে শান্ত হয়ে ধ্যানে বসলেন। তদনুযায়ী বাইরের সন্ন্যাসীরাও করতাল রেখে যে-যাঁর ধ্যানে নিমগ্ন হতে উদ্‌যোগী হলেন। একে একে তাঁরা ক্রমশ শান্ত হলেন। স্থির ও নিশ্চল হলো তাঁদের শরীর। নিয়মিত ও মন্থর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠা-নামা। ব্যস, এছাড়া এমন কিছুই নেই যা দিয়ে তাঁদের আলাদা করা যায়। সব এক ঠাঁই, সব একাকার। ঠিক সেই সময়ে বহুদূর থেকে ভেসে আসা মৌচাকের মৌমাছির গুনগুনানির মতো একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল; গর্ভ মন্দিরের সেই সন্ন্যাসী খুব আস্তে অথচ প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করছেন :

"যেখান থেকে চূর্ণ হয়ে ফিরে আসে আমাদের ভাষা, পিঞ্জরাবদ্ধ ও প্রহৃত সারমেয়র মতো আমাদের ভাবনা যেখানে প্রত্যাহত হয়, শব্দের ধূলিসমাচ্ছন্ন সেই অটল অতল নৈঃশব্দ্য হে অপরূপ অলৌকিক সিন্ধু…"

এই গুঞ্জন ও ধ্যানের একটানা খরস্রোত আমার চিন্তা-ভাবনাকে ভাসিয়ে

নিয়ে সমস্ত মন্দির প্লাবিত করে দিলো। আমার সম্মুখে প্রত্যেকটি মুখ সন্ন্যাসের কঠোর কৃচ্ছ্রতায় পাথরের মূর্তির মতো, বীতবাসনায় অগ্নিস্নাত স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল। নিমীলিত চক্ষু, দৃঢ়নিবদ্ধ মুখমণ্ডল, তাঁরা স্তব্ধতার অতলে ডুব দিয়েছেন। সে-অতলে বুঝি বা নক্ষত্রলোকও পৌঁছাতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীদের সম্পর্কে সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমার কাছে তার আকর্ষণ ছিল। এবং যতই আমি ওঁদের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলাম ওঁদের প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি বিষয়ে জানবার কৌতূহল ততই আমার প্রবল হলো। ওঁদের ক্রিয়াকাণ্ড অমন কেন? ওঁদের দৈনন্দিন চালচলন আচার-ব্যবহারের পেছনে কি কোনো অনুশাসন আছে? কী আছে ওঁদের জীবন গঠনের মূলে? কিন্তু প্রশ্ন করলে কী হবে, উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত। ওঁরা অনুনয় করলেন যেন আরো কিছুকাল ওঁদের সঙ্গে কাটিয়ে যাই।

ওঁদের জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে যে-সারল্য ও মসৃণতা আছে সেটা নির্ভেজাল বাস্তবভিত্তিক। ওঁদের আনাগোনার মধ্যেও যে আত্মোৎসর্গের পবিত্র ভাবটি তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে, এটা আমি লক্ষ্য না করে পারিনি। পবিত্রতার নির্মল জ্যোতি ওঁদের চোখেমুখে ঝিকমিক করে। অলীক আশায় ওঁরা বিব্রত নন, উৎকল্পনায় প্রতারিত হন না। যা-কিছু ওঁরা বলেন বা করেন তার মধ্যে একটি কঠোর অথচ সুন্দর বাস্তবতা আছে। প্রত্যহ ভোর পাঁচটার আগে ঘুম থেকে ওঠেন, ঘণ্টা দুই ধ্যান করেন। তারপর যে যাঁর প্রাত্যহিক কর্মে চলে যান: রোগীর সেবা-যত্ন, দরিদ্রের সাহায্য, কারো বা কাজ তরুণদের শিক্ষাদান।

মধ্যাহ্নে স্বল্পক্ষণের জন্য সমবেত ঈশ্বরভজনা। তারপর খাওয়াদাওয়া। ঘুম। বেলা প্রায় দুটো নাগাদ ক্লাশ: বিদ্বান ও পণ্ডিতদের বেদান্তবিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষাদান। উপনিষদের যে-সকল ভাস্বর ভাষ্য আমার জানা ছিল মঠের এই ক্লাসঘরে তাই শুনতে পেলাম।

বিকেল চারটেয় চা-পর্ব। সাড়ে চারটেয় প্রত্যেক সন্ন্যাসীর শরীরচর্চা। যেই সন্ধ্যা নামলো অমনি—আগে যেমন বলেছি—মন্দিরে সবাই সমবেত। সেখানে সন্ধ্যারতি।

এই যে গেরুয়াধারী মানুষগুলো সবুজ ঘাসের উপর চলছেন ফিরছেন, ঠাকুর পরমহংসদেব বা ঈশ্বর বিষয়ে মৃদুস্বরে আলোচনা করছেন, এঁরা সবাই কর্মবীর। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে রোগভোগ দেখা দিলে এঁরা রোগীর দেখাশুনো করেন। ভারতবর্ষের কোনো প্রত্যন্ত প্রদেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ বা প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটলে এঁরা তৎক্ষণাৎ আর্তের সেবায় ছুটে যান। কর্মশেষে আবার ফিরে আসেন মঠে, তাঁদের প্রাত্যহিক কর্মজীবনে। কাজকর্মে

কোনো মালিন্যের দাগ নেই, আবার কর্মহীনতায় নেই কোনো আলস্যের স্পর্শ। এক কথায় তাঁরা স্বাধীন, মুক্ত মানুষ।

ঠিক কোন জিনিস তাঁদের সুখ-দুঃখ থেকে মুক্ত রেখেছে, এই প্রশ্ন করলে তাঁরা নিশ্চিতরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণীর প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করবেন। 'যখন সব সংকেত ঐ একই রাস্তার দিকে তখন সে-রাস্তাই নিতে হয়।' এই তো প্রবাদ। সুতরাং সন্ন্যাসীরা যখন সব ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন তখন তো এ-বিষয়ে আমাকে অনুশীলন করতেই হবে। আমাকে বলা হলো: 'নির্ঝরের উৎসে গিয়ে পরীক্ষা করাই বরং ভালো।'

কিন্তু আমি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে গেলুম না। খুব ছোটো বেলায় মা আমাকে শিখিয়েছিলেন—'তোমার ও তোমার জীবনের মধ্যে ছাপাখানাকে ঠাঁই দিয়ো না।' সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী বিষয়ে গবেষণার জন্য আমি ঘটনাপঞ্জীর ঘনঘটার মধ্যে না গিয়ে ওসব ঘটনাপঞ্জীর রচয়িতাদের সন্ধানে বেরোলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে জনশ্রুতি

একদিন সকালবেলা পণ্ডিতমশাইয়ের* কাছ থেকে আহ্বান পেলাম। ঠাকুরের ভক্তশিষ্যদের মধ্যে তিনি এমন একজন যিনি ঠাকুরকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছিলেন। তিনি গুরুর অনেক বাক্যালাপ লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ লিপিবদ্ধ করেছেন এমন লোকের সন্ধান করছি একথা তিনি কী করে জানলেন বলতে পারি না। সে যাই হোক, তাঁর সাদর আমন্ত্রণ পেয়েই তাঁর বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

কলকাতা শহরের মধ্যিখানে আমহার্স্ট স্ট্রিটে তিনি থাকেন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে এত বড় বাড়ি দেখে অবাক হলাম। বাড়িটা খুব একটা মনোরম বলা যায় না, কিন্তু বড়, আর বেশ পরিচ্ছন্ন। ধূসর রঙের দেয়াল। বড় বড় গরাদ-দেয়া লম্বা লম্বা জানালা। ছোট এক ফালি খেলার মাঠ বাড়ির সামনে, রাস্তা থেকে রেলিং-ঘেরা। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলুম, বাড়িটা

---

* 'পণ্ডিতমশাই' স্পষ্টত রামকৃষ্ণকথামৃত-লেখক মাস্টারমশাই, শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যিনি শ্রীম-র আড়ালে লুকিয়ে আছেন। তৎকালে অনেকে তাঁকে পণ্ডিতমশাই ডাকতেন, কারণ তাঁর মতো দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত ও বিদ্বান বিরল ছিল। ঠাকুর ডাকতেন—'ও মাস্টার!' এই ডাকটি আমাদের কাছে মিষ্টি লাগে।

প্রথমে ছিল ইস্কুল-বাড়ি। সুমুখের গেটে তার চিহ্ন আছে। কিন্তু এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে আমি গেট খুলে খেলার মাঠ পেরিয়ে গেলুম। প্রবেশপথের মস্ত বড় সবুজ রঙের দরজা ঠেলে ভিতরে। ভিতরে চওড়া বারান্দা। কেউ নেই। খানিক অপেক্ষার পর বারান্দার অপর দিকের সিঁড়ি দিয়ে ছুটে এলো দশ-বারো বছরের একটি ছেলে। খালি গা, গায়ের রং তামাটে। আমি তাকে ডাকলুম। ছটফটে দুষ্টু ছেলেটা শুধোল: "হ্যা মশাই, আপনি কি আমাদের গুরুমহারাজ পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে এসেছেন?"

"সেজন্যেই তো হা-পিত্যেশে দাঁড়িয়ে আছি, বাবা।" বললুম আমি।

'তাহলে আমার সঙ্গে আসুন' এই বলে ছেলেটা তক্ষুনি আমাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। হাতির চলার মধ্যে একটা মহত্ব আছে। বারো বছরের ছেলের মধ্যে যে সেটা থাকতে পারে আমার এই কিশোর বন্ধুটিই তার প্রমাণ। এত ক্ষিপ্র অথচ এমন কমনীয় তার হাঁটা চলা।

অসংখ্য সিঁড়ি ভেঙে তিন তলায় উঠলুম। শুভ্র শ্মশ্রু বৃদ্ধের সঙ্গে একবারে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার। খোলা জানালার পাশে চৌকিতে তিনি উপবিষ্ট।

বাচ্চা ছেলেটা সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বললে: "ইনি এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।" আবার বিনম্র নমস্কার করে এমন নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মনে হলো পিছলে গেল।

পণ্ডিতমশাইয়ের সম্মুখস্থ হয়ে আমি তো হতচকিত। সম্মান প্রদর্শনের তাগিদে আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে প্রণাম করলাম। মেঝেতে আমার কপাল ঠেকলো। তক্ষুনি সরে যাওয়ার একটা মৃদু আওয়াজ পেলাম, বেড়ালের লাফ দেয়ার মতো মৃদু, তিনি সরে গেলেন। উপরে তাকিয়ে দেখি পণ্ডিতমশাই আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ভয় মেশানো গলায় তিনি বলে উঠলেন: "এ কী কাণ্ড! তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে একজন অব্রাহ্মণকে প্রণাম করলে!"

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম: "আপনি যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ পেয়েছেন, যে-কোনো ব্রাহ্মণের চেয়ে আপনি অনেক ওপরে!"

এরপর ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলুম তাঁকে। প্রায় ছ' ফিট লম্বা। গরিলার মতো মজবুত বুকের ছাতি। শ্বেতশ্মশ্রু বাঘের মতো তাঁর মুখাবয়ব। ঈষৎ লালচে আশ্চর্য চোখ তাঁর, চোখের কিনারে হলদে আভা। গ্রীকদের মতো জমকালো নাক, প্রায় মেয়েলি ধাঁচের কোমল নাসারন্ধ্র। নাকের উর্ধ্বে একে-বারে বিপরীতধর্মী মস্ত ভুরু। আর মাথাভর্তি ঝোপের মতো অবিন্যস্ত চুল, শুভ্র কেশের আলোকমণ্ডল।

একে তো মানুষটা দীর্ঘকায়, তার উপর লম্বা ঢিলেঢালা বরফ-শাদা আল-খাল্লা সটান পা পর্যন্ত নেমে গেছে। তাতে তাঁকে আরো বেশি দীর্ঘকায় মনে

হয়। তিনি আমার হাত ধরে তাঁর পাশে বসালেন। আমার সঙ্গে যখন তিনি কথা বলে চললেন, আমি ঘরের চার দেয়ালে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলুম। না, তেমন কিছু দেখবার নেই, সাধারণ চুনকাম-করা শূন্য দেয়াল। সিলিঙের উপর যে কড়িবরগা দেখলুম তা যেন বুভুক্ষু মানুষের পাঁজরের মতো। ঘরে যে-চৌকিতে বসেছিলুম তা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো আসবাব নেই। বড্ডো গরম বৈশাখের এই বিকেলবেলাটি। মস্ত মস্ত গরাদ-দেয়া জানালার বাইরে তাকালে দেখা যায় কত অসংখ্য বাড়ির ছাদ। আকাশটা ময়লা, ধাতুময়, উত্তাপে কম্পমান।

সবকিছু দেখাশোনা সাঙ্গ হলে আমি তাঁর প্রতি মনোযোগী হলুম। তিনি যখন কথা বলছিলেন, লক্ষ্য করলুম তাঁর কথার ভেতরের কোমলতাটি, যা তাঁর কণ্ঠস্বরেরই প্রস্ফুটন। তিনি বলছিলেন : "আমার গুরুমহারাজের (শ্রীরামকৃষ্ণের) কাছে যা শুনেছি তা-ই লিখে রেখেছি। কিন্তু স্বর্গের নক্ষত্রের মতো যেসব শব্দ তাঁর শ্রীমুখ থেকে খসে পড়েছিল তোমাকে তা কেমন করে বলি! সে তো মুখ নয়, অমৃতের গহ্বর!"

"ও-কথা বলছেন কেন ?" জিগ্যেস করলুম।

"অন্য কারণের কথা বাদ দিলেও অন্তত এই কারণে যে, যা-কিছু তিনি বলেছিলেন তা-ই সত্য হয়েছে। তাঁর প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণীই ফলেছে। কোনো সন্দেহ নেই তাঁর চিন্তাভাবনার পেছনে অমৃতস্বরূপ ক্রিয়াশীল। তিনি শিক্ষিত বা বিদ্বান ছিলেন না, কথাবার্তায় কোনো নাটকীয় বেগও ছিল না। কথা বলতেন সাধারণ লোকের মতো, সহজ এবং সোজাসুজি। অমর তাঁর বাণী। যারা শুনতো তারা শাশ্বতের আস্বাদ পেত। এখন যদিও তিনি লোকান্তরিত, তবু ক্রমশ বাণীর প্রতিশ্রুতি ফলছে।...আচ্ছা, তুমি তো হাজারো প্রশ্ন নিয়ে আছো, তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করি : শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে তুমি কী জানতে চাও ?"

"তার মানে ?"

"তার মানে এই যে, তুমি কি তাঁর ইতিহাস জানতে চাও, না তাঁর বিষয়ে জনশ্রুতি ?" পণ্ডিতমশাইয়ের এ রকম প্রশ্নের জন্য আমি অবশ্য তৈরি ছিলুম না। উনি তাই আমাকে একটু ভাববার সুযোগ দিলেন।

শেষে আমি বললুম : "দেখুন, যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য আমার চাই যার ওপর ভিত্তি করে প্রত্যয়যোগ্য জনশ্রুতি সংগ্রহ করতে পারি।"

তিনি আনন্দে উছলে উঠলেন : "শাবাস!" পরম সুখে তাঁর কেশগুচ্ছ ও শ্মশ্রু দুলে উঠলো : "শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক জনশ্রুতিগুলো এখনো একসঙ্গে পাওয়া যায়নি। যেসব প্রামাণিক সত্য ঘটনা আমি লিখে রেখেছি তাঁর সম্পর্কে, তার চেয়েও খাঁটি সত্য আছে ঐসব জনশ্রুতিতে। কারণ কিংবদন্তি বা জন-

শ্রুতিই হলো সত্যের আধার। যাকে সত্য ঘটনা বলো তা এমনই নিছক সত্য এবং নিষ্প্রভ যে সে-সবে বিশ্বাস করে কারো স্তরোন্নতি হয় না।"

কথা শুনে আমি বিস্মিত। বললুম! "কিন্তু ইতিহাস তো খুবই জরুরি, আর খুবই বিশ্বাসযোগ্য।"

"হ্যাঁ, জরুরি। কারণ ইতিহাসকে ভিত্তি করে ইতিহাসের চারদিক ঘিরে বেড়ে ওঠে কিংবদন্তি বা জনশ্রুতি। জনশ্রুতির স্থূল উপাদানের দিক থেকে ইতিহাসের চেয়ে সূক্ষ্মতর আর কিছুই নেই। আর:সেইজন্যেই তো শ্রীরামকৃষ্ণের ইতিবৃত্ত লিখে রেখেছি। এখন থেকে পাঁচশো বছর পর, যখন কোনো মহৎ কবি আমার এই ইতিবৃত্ত নিয়ে আমার গুরুমহারাজের মতোই অমর কোনো উপকথা রচনা করবেন, তখনই আমার কর্ম সার্থক হবে।"

"ঠাকুরের বিষয়ে জনশ্রুতি কি এখনো অনেক আছে?"

তিনি মাথা নেড়ে বললেন: "হ্যাঁ। কিছু-কিছু পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বর ও আশেপাশের গ্রামগুলোতে যাও। ওখানকার বৃদ্ধ যাঁরা এখনো আছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করে জিগ্যেসবাদ করো। সেখানে এখানো এমন দু'জন বেঁচে আছেন যাঁরা ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর প্রথম সিদ্ধিলাভের পর। তাঁরা বলেন, সেদিন যখন তিনি কালীমন্দির থেকে বেরিয়ে তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর চোখেমুখে এমন তীব্র আলো উদ্ভাসিত হয়েছিল যে তাঁদের চোখ ঝল্‌সে গেল। যাও, যাও, ওঁদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করো। গুরুমহারাজ সম্পর্কে যা-যা জানি তা তো লিপিবদ্ধই আছে, সে তো কালই ফুরিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু ওই বৃদ্ধরা? ওঁদের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, যে-কোনো সময়ে চলে যেতে পারেন। তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের কথা শোনো, তাঁদের বাঁশিতে যে-সংগীত ভরা আছে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে সে-সংগীত এখনো বাজবে।"

"আচ্ছা, কিংবদন্তির সন্ধানে তো যাচ্ছি, আমার আর কী কী করা দরকার, বলুন?" তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করি।

"আর কী? কিচ্ছু না। তোমার ভেতর তিনি আছেন, তিনিই বলবেন। তোমার কিছু করার দরকার নেই। শুধু একটা কথা মনে রেখো: অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কিছু শুনতে চেয়ো না। যাঁরা সরল মানুষ তাঁদের চেয়েও সরল ছিলেন ঠাকুর। কোনো বীরত্বপূর্ণ কাজে উত্তেজিত করার মতো কোনো কথা তিনি কাউকে বলেন নি কখনো। তাঁর বাণী কালাতীত, তাই বলে তিনি চন্দ্র-সূর্যের মতো কালের প্রতীকগুলোকে নিবিয়ে দেন নি। নাটকীয় এমন কিছু করেন নি যা কোনো গল্পকারকে মাতিয়ে তুলতে পারে, যদিও তাঁর স্পর্শ-মাত্র বহু লোকের মধ্যে ভগবান জাগ্রত হয়েছেন।"

"অ্যাঁ, কী বললেন? তাঁর স্পর্শে মানুষের মধ্যে ভগবান জাগ্রত হয়েছেন?" আমি তো বিস্ময়ে হতবাক!

পণ্ডিতমশাইয়ের উত্তর বেশ গম্ভীর শোনালো: "ভগবানের বিষয়ে যখনই কিছু বলতেন, এই মরজগতের অজানা এক আলো তাঁর মুখে এসে পড়তো। তখন যদি তিনি হাত বা পা দিয়ে কাউকে ছুঁয়ে দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে সে-মানুষ আনন্দস্বরূপের অনন্ত জ্যোতিঃস্নাত বিশ্বচরাচরের দর্শন পেতেন ; এই অবস্থা অন্তত তিন-চারদিন থাকতো। সে-মানুষের চোখে তখন সকলকার মুখ লক্ষ-কোটি নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিত, সমস্ত জলস্থল পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ঝলমল করতো আর রাত্রির অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকদেশ ঝিকিয়ে উঠতো ভোর বেলাকার সূর্যের মতো। একদিন আমিও যখন ভাস্বরতার স্পর্শ পেলাম পাক্কা ছ'দিন ঐ রকম অবস্থা ছিল, সমস্ত জীবন ছিল এক এবং একাকার। মৃত্যু বলে কিছু ছিল না। ছিল না দিন-রাত্রির পার্থক্য। শুধু আনন্দ রূপ। চরাচরের যাবতীয় সমস্ত কিছুতে সমস্তক্ষণ শুধু আনন্দরূপের অপরূপ জ্যোতির্ময়তা। সমস্ত সত্তার অন্তরে শুধু একটি সংগীতের মূর্চ্ছনা: বাক্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, মন তাঁর কাছেও আসতে পারে না—এই সেই অবাঙ্‌মনসাগোচরম্‌। আমিই তা-ই, আমিই সেই অনন্ত ধ্যাননিমগ্ন জ্যোতির্ময় শিখা। আনন্দ, আনন্দ।"

পণ্ডিতমশাই থামলেন। প্রথম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে তাঁর মুখমণ্ডল দ্যুতিমান হলো। আভাময় স্তব্ধতা ছড়ালো। তাঁর দু'চোখ ভরে গেল জলে—টলমল উজ্জ্বল মুক্তোর মতো জল। নানা কথা, নানা প্রশ্ন ছিল আমার মনে। কিন্তু ডুবে গেল। আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম। তারপর উঠে দাঁড়ালুম। শ্রীরামকৃষ্ণকে যারা জেনেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁকে, সেইসব নারীপুরুষের সন্ধানে যেতে হবে আমাকে—তাদের মুখ থেকে সংগ্রহ করতে হবে তাঁর জীবনের বিচিত্র সব কথা ও কাহিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আদিপর্ব

জনশ্রুতি এই, বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশে চট্টোপাধ্যায় পরিবারে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম। সেটা ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকাল। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হলো গদাধর, পরবর্তীকালে এই নামের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হলো গদাই চাটুজ্যে।

উনিশ শতকের চার দশকে ব্রাহ্মণ বালককে যেমন বিদ্যাশিক্ষা দেয়া হতো তাঁর মা-বাবা তাঁকে তাই দিয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় গীতা, রামায়ণ, মহাভারত

শিক্ষাদান তারই অন্তর্ভূত। তাছাড়া ছিল ধ্যানের শিক্ষা। যদিও ধ্যানের শিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর প্রবল ঝোঁক দেখা গেল, কিন্তু দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার বেলা তাঁর বিচক্ষণতার তেমন প্রমাণ পাওয়া গেল না। আসলে অধিবিদ্যা—মেটাফিজিক্স—তাঁর হজম হতো না। বরং তাঁর ভালো লাগতো ধর্মগ্রন্থ; হিন্দুধর্মের দেবদেবী সাধুসন্তদের জীবনী নিয়ে যেসব গাথা ও পাঁচালি প্রচলিত ছিল, সেইসব শত শত গাথা ও পাঁচালি তিনি গোগ্রাসে গিলতেন। বস্তুত এসব জিনিস তিনি স্মৃতি থেকে এত বেশি আবৃত্তি করতে পারতেন যে তাঁর বয়সে তেমন কেউ আর ছিল না।

ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর প্রবল আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখে তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁকে পুরোহিতবৃত্তিতে ছেড়ে দেওয়াই সাব্যস্ত করলেন। এবং ষোল বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই রাণী রাসমণির কালীমন্দিরে তিনি পুরোহিতের সহকারীরূপে নিযুক্ত হলেন। নারী হলেও রাণী রাসমণি তখনকার সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষে বেশ যোগ্যতম শাসনকর্ত্রী ছিলেন। আঠারো বছর পূর্ণ হতেই রামকৃষ্ণকে তাঁর পারিবারিক পুরোহিতরূপে বহাল করতে তাঁর দুই জামাতাকে যে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন এটা তাঁর আধ্যাত্মিক বিচক্ষণতারই প্রমাণ।

কিংবদন্তি এই যে, রামকৃষ্ণ যেদিন প্রথম মন্দিরে এলেন ঠিক সেদিন থেকেই রাণী ও তাঁর পরিবারস্থ লোকেরা তাঁদের নবীন পুরোহিতের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এবং রাণী ও তাঁর জামাতাদের জীবদ্দশায় তাঁরা তাঁকে পরম শ্রদ্ধা ও যত্নে লালন করতেন, রক্ষা করতেন। সহকারি পুরোহিতরূপে রামকৃষ্ণের আগমনের প্রথম দিনেই রাণী ও তাঁর লোকজনেরা আচার-ব্যবহারে রামকৃষ্ণের প্রতি যে-আন্তরিক বন্ধুতার পরিচয় দিয়েছিলেন আজও—তাঁর দেহত্যাগের প্রায় চল্লিশ বছর পরেও—সে-সব কথা দক্ষিণেশ্বরে বলাবলি হয়।

রাজপরিবারের আন্তরিকতায় একেবারে গোড়া থেকেই দক্ষিণেশ্বর যে রামকৃষ্ণের আপন স্থান বলে বোধ হয়েছিল এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জায়গাটাও বেশ চমৎকার। গঙ্গার ধার ঘেঁষে বিস্তৃত কয়েক বিঘে জমি। বাগান, বাগানের ঠিক মধ্যিখানে মন্দির। গঙ্গায় ভেসে গেলে কলকাতা এখান থেকে মাত্র ছ' মাইল। আর সেই গঙ্গায় কত রকমের নৌকো, লাল, নীল, শাদা, সবুজ কত রং-বেরঙের বাহার। এখন তো মন্দির-সংলগ্ন বাগানের কোনো যত্ন নেই, একরকম অবহেলিত ও উপেক্ষিতই বলা চলে। তবু এই জায়গার মহনীয়তা এখনো অনুভব করা যায়। মন্দিরের ধূসর গম্বুজ ও তার খিলান, প্রাসাদের মস্ত মস্ত হল ঘর আর বারান্দা, শত শত আলোকশিখায় উদ্ভাসিত লম্বা ছায়াচ্ছন্ন পবিত্র ভূমি যেখানে মহামৌনের ধ্যানে নিমগ্ন শুভ্র পোশাক পরিহিত পুরোহিতেরা—এইসব মহান পরিবেশ ও দৃশ্য পরম অজ্ঞাতের সান্নিধ্যের জন্য মনকে ব্যাকুল করে তোলে।

বাইরে বাগানে ঘাস গাছ ও আগাছাগুলো প্রখর রৌদ্রের প্রভাবে সবুজ পান্নার মতো জ্বলে উঠছে। আরো দূরে—ঐ উত্তর দিকটায় তাকালে দেখা যায় পঞ্চবটীর জঙ্গল; এই জঙ্গলের ঘননিবদ্ধ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও তার বহুদূরবিস্তৃত শাখাপ্রশাখায় এমন এক নির্জনতা শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানের পক্ষে যার প্রয়োজন ছিল।

তাঁর সম্পর্কে যে সব কাহিনী শোনা যায় তা থেকে এটা বেশ পরিষ্কার যে, পঞ্চবটীর দুর্ভেদ্য নির্জনতায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ শুধু যে তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত পর্যায় লাভ করেছিলেন তাই নয়, রাজকীয় মন্দিরের যাবতীয় জটিল ও আয়াসসাধ্য কৃত্য থেকে রেহাই পাবার জন্যেও তিনি প্রায়শই পঞ্চবটীর জঙ্গলে চলে যেতেন। তাঁর অমিত অন্তঃশক্তির বলে তিনি উপলবধি করেছিলেন যে নিছক পূজারীবামুন তো নয়, তাঁকে হতে হবে মায়ের মন্দিরের প্রধান পুরুষ। ধক করে তাঁর মনে হলো: "ধনে ঐশ্বর্যে বড্ডো বেশি জমজমাট এই রাজকীয় মন্দির। এর আয়ও প্রচুর। এই প্রচুর অর্থ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে পরিচালক পুরোহিতের আত্মা ক্লিষ্ট হয়। ঈশ্বরের উপাসনার জন্যে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না।"

ব্যাপারটা অন্য দিক থেকেও বিবেচনা করা যায়। পাড়াগাঁয়ের সহজ সরল দরিদ্র ও প্রবল ধর্মপরায়ণ এক ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে রামকৃষ্ণ এসেছিলেন। এসে সরাসরি পড়লেন একেবারে বিখ্যাত রাজপ্রাসাদের উপাসনা গৃহে। পূজার দায়িত্ব পড়লো তাঁর উপর। যেন তিনি মধ্যযুগীয় গির্জার প্রবল-প্রতাপ সম্রাট। এই রকমই ছিল তৎকালীন লোকেদের মনোভাব। আশেপাশের গ্রামের লোকেরা কী আশা করতেন? না, তাঁর সাধুতা নয়, সরলতা নয়, ধর্মজীবনের সূক্ষ্মতম রহস্যও নয়। তাঁরা চাইতেন আধ্যাত্মিক কূটনীতি, রাজকীয় চলনবলন, ঠাঁটঠমক। তাঁর সমসাময়িক একজনার মতে: "তাঁরা ঠাকুরের কাছে আশা করতেন তিনি গরিবদের খাওয়াবেন আর ধনীদের করবেন তোষামোদ। কিন্তু হায়, তাঁদের পুরোহিতের গভীর রহস্যময় স্বভাব আর যে-দেবীকে তিনি পূজা করতেন তাঁর প্রতীকতা—এসব জিনিস তাঁদের নজরে পড়লো না। এটা নিশ্চিত যে, যে-কালীমূর্তি কাল ও অনন্তের প্রতীক, যিনি মৃত্যু ও অমৃতের অভিজ্ঞান—যুবক রামকৃষ্ণের মনে তা গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। ফলত, পুরোহিত পুঙ্গবদের মধ্যে তিনি একজন কেউকেটা হবেন এমন কোনো বাসনা বা ধন্ধ বিন্দুমাত্র তাঁর মনে আসেনি।

"প্রতিদিন যে-মূর্তিকে তিনি পূজা করতেন সেই কঠিন মূর্তিই যেন রামকৃষ্ণের অন্তঃস্থল থেকে ক্রমশ নিষ্কাশিত করলেন আসল ও খাঁটি মানুষটিকে। এই খাঁটি মানুষটি নিছক কোনো ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন না, ছিলেন অধ্যাত্মজগতের রহস্যময় গূঢ়-স্বভাবী। পুরোহিত কৃত্যের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অধিক সময়

তিনি ব্যয় করতেন ধ্যানভজনে। বাইরে নয়, অন্দরে। অর্থাৎ অন্তরে। মন্দিরের অন্দরে থাকেন কালী প্রতিমা, তেমনি থাকেন মানুষের অন্তরে। মানুষের আধ্যাত্মিক উপলবধির প্রতীক এই মূর্তি।"

মহাকালের প্রতীক যেমন কালী*—কালের কলন করেন তিনি—তেমনি তিনি কালের অতীত, অবিনশ্বর। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মা, আবার তার সংহার-কর্ত্রীও। সমস্ত বিশ্ব চরাচরের তাঁতেই জন্ম তাঁতেই লয়। নৃত্যভঙ্গিমায় কালীমূর্তি কালো মার্বেলে খোদাই করে তৈরি, কারণ কাল আমাদের দৃষ্টির অগোচর। কালের কোনো রং নেই। আবার কাল আমাদের অগোচর হলেও কালের অজস্র মুহূর্ত অবিরাম আমাদের অভিজ্ঞতায় ধাক্কা দিচ্ছে—তেমনি যিনি স্থির ও চঞ্চল তাঁর নৃত্যভঙ্গিমায় আছে বিরামহীন চলার ছন্দ। চোখ মেলে তাকালে দেখা যায় চারদিকের দিকদেশ; নৃত্যের মধ্যে থাকে সময়ের অভিজ্ঞান। এই হেতু আমাদের সময়-চেতনার প্রতীক হিসেবে কালীমূর্তির ভঙ্গিটিও নৃত্যপর। তাঁর কণ্ঠে মুণ্ডমালা—মরণশীল মানুষের যুগযুগব্যাপী অস্থির জীবনবৃত্তান্ত, যা কালের হাতে সমর্পিত। এই নরমুণ্ডের অলংকার ছাড়াও তিনি চতুর্ভুজা: ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের প্রতীক। এক হাতে নরমুণ্ড, আরেক হাতে খড়্গ: নিয়তিচালিত মানবেতিহাসের সর্বশেষ রূপায়ণ যে মানুষ সে-মানুষকেও সরিয়ে দেয় মৃত্যু। অন্য দুই হস্ত জাগ্রত করে আশা ও স্মৃতি, ভূত ও ভবিষ্যৎ। এই হলেন কালী। কিন্তু এ-ই সব নয়। তাঁর পদতলে শ্বেতশুভ্র শিব—তিনি অবিনশ্বর, তিনি সর্বত্যাগী, অপরাভূত। এই শিবের সমীপবর্তী হয়ে সহসা কালীর তাণ্ডব নৃত্য স্তব্ধ হয়, কারণ শিব অপরাজেয়। কালী সর্বত্র জয়ী, কিন্তু সর্বত্যাগী শিবকে তিনি অতিক্রম করতে পারেন না। কালীকে হিন্দুরা বেশ বোঝেন। এমনকি শিশুরাও এইভাবে প্রার্থনা করে:

"মায়ার আবরণে ঢাকা তোমার প্রসন্ন মুখ আমাকে দেখাও। হে অবিনাশী, তোমার অমৃতময় দয়া ও ভালোবাসা আমার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করুক।"

কালী প্রতিমার এই পরিচ্ছন্ন প্রতীকতা, যেখানে সর্বত্যাগ ছাড়া আর কিছুই নেই, শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করলো। তিনি পূজোপকরণ, নৈবেদ্য ও কৃত্যের মধ্যে নিছক জাঁকজমক দেখতে পেলেন। একদিকে বিরাজমান বিশ্বেশ্বরীর তাৎপর্য, অন্যদিকে মন্দিরের প্রধান পুরুষরূপে থাকা—শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই দুয়ের সমন্বয় হলো কী করে? যদিও বয়সে আঠারো উনিশের বালক, ওই বয়সেই তিনি উপলবধি করলেন ইচ্ছাময়ীর বাণী। তদনুযায়ী পবিত্র কর্মানুষ্ঠানের নব রূপায়ণে তিনি লক্ষ্য স্থির করলেন। প্রথমে ত্যাগ করলেন

* শাস্ত্রে কালীর নানা তত্ত্ব আছে। সাধক ও জ্ঞানীরাও নানা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ধনগোপালের ব্যাখ্যার বহুলাংশ আমাদের অবাক করে।

সিল্কের পোশাক-আশাক, ত্যাগ করলেন সোনার কাজ করা রুপোলি চাদর। রাজপরিবারের ডজন খানেক পরিচারক লক্ষ্য করলো তিনি সোনার থালায় খেলেন না। সবশেষে চমৎকার সাজানো-গোছানো যে-ঘরে তিনি থাকতেন সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন। চলে গেলেন চাকরদের ঘরের পাশে ছোট্ট একটি ঘরে, জীবনের শেষদিন অবধি রইলেন সেখানে। এর পর তিনি জাঁক-জমক থেকে মুক্ত করে মন্দিরের সেবাকর্মকে সহজ সরল করবার দিকে মন দিলেন। পূজানুষ্ঠানের সময় পরতে হয় মুক্তোর মালা, সিল্কের ধুতি-জামা, উজ্জ্বল হীরকখচিত নীল-পাড় চাদর। সব তিনি ত্যাগ করলেন। সোনার ধুনুচি নিয়ে তিনি ইষ্টদেবীর সুমুখে আরতি করেন। না, তাও তিনি করবেন না। সোনার জলের মলাট দেয়া যে ধর্মগ্রন্থ থেকে তিনি লোকেদের পাঠ করে শোনাতেন তাও পরিত্যক্ত হলো। পূজানুষ্ঠানের কতরকম কৃত্য, কত রকম খুঁটিনাটি—সব, সব তিনি নির্মমভাবে ছিন্ন করলেন। অধিক মাত্রায় নিবিষ্ট হলেন তাৎপর্যময় পূজার গভীরে। ধর্মালোচনায় যাঁরা জমায়েত হতেন তাঁদের সঙ্গেও এই প্রসঙ্গ, এই আলোচনা।

যাঁরা বিশেষ একরকম প্রত্যাশা নিয়ে মন্দিরে আসতেন তাঁদের আশাভঙ্গ হতে লাগলো, প্রচলিত রীতিনীতি-সংস্কারের ধারও ঘেঁষেন না রামকৃষ্ণ। নালিশ জমা হলো। তাঁরা রাণী রাসমণিকে গিয়ে আবেদন জানালেন তিনি যেন এই নবীন পুরোহিতকে সোজাসুজি বরখাস্ত করেন। রাণী বললেন: "না না, তা কেন? তিনি তাঁর আপন নিয়মে ৺মায়ের পূজা করেন এটা কি তাঁর দোষ? তিনি পুরোহিত, পূজার ব্যাপারে কোনটা সংগত কোনটা নয়, সে তিনিই বুঝবেন। বরং আমাদের চেয়ে ভালো বুঝবেন। তিনি পরিশ্রমী, নীতিনিষ্ঠ, শুদ্ধবাক। এ রকম মানুষকে নিন্দা করার কোনো মানে হয় না।"

একদল গেল তো আরেক দল নালিশ নিয়ে এলো। এঁরা আশপাশের গ্রামের প্রতিবেশী, অনেকেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁরা বললেন: রাণীমা, আপনি ধর্মের রক্ষক, সত্যের দর্পণ। দয়া করে আপনার পুরোহিত গদাই চাটুজ্যেকে তাড়িয়ে দিন, তাঁর মধ্যে পাগলের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।"

নালিশ শুনে 'সত্যের দর্পণ' বললেন: "না, তিনি তো পাগল নন। তিনি দিব্যোন্মাদ! সাধুসন্তরা এরকম হয়েই থাকে।"

এই সময়টায় প্রায় বছর খানেক শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে একা একা থাকলেন। তাঁর কাজকর্ম চালচলন অদ্ভুত, যেমন-খুশি। মন্দিরে মায়ের কাছে ভজন ও প্রার্থনার একটা নির্ধারিত সময় আছে। কিন্তু সময় নেই অসময় নেই যখন-তখন তিনি গভীর প্রার্থনায় কাটিয়ে দিতেন। এটা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। রাত্রে বা মধ্যাহ্নে বিশ্রামের সময় ৺দেবীকে শয়ন দিয়ে মন্দিরের ভিতর-দরজা বন্ধ রাখার কথা। ঠিক সেই সময় গর্ভমন্দিরে নবীন পুরোহিতের উচ্চকণ্ঠ শোনা যেতে লাগলো। তিনি চেঁচিয়ে কাঁদছেন আর মাকে ডাকছেন:

"মা, আমায় জ্ঞান-চৈতন্য দে। তোর স্নেহ সুধামাখা মুখখানা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখিসনে, মা। মাগো, আমায় দেখা দে।

অবশেষে তাঁর প্রার্থনা ও তাঁর ক্রন্দন এমন উচ্চকণ্ঠ হলো যে পাড়ার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা বিরক্তবোধ করলেন। কিন্তু রাণীকে বলা তো বৃথা। তাঁরা নিজেদের মধ্যে রাগে গজগজ করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন: 'এ তো স্রেফ অত্যাচার। ঘুমোবার একটা সময় আছে, প্রার্থনারও সময় নির্দিষ্ট। দেবীর বিশ্রামের সময় তাঁকে শয়ন না-দিয়ে তাঁর সঙ্গে অনর্থক বকবক করা—এসব দুষ্কর্ম কোনো সম্মানিত পুরোহিত করেন না। কিন্তু এসব কী! সমস্ত কাজকর্মে ওঁর পাগলামি যে বেড়েই যাচ্ছে। আমরা এখন কী করি?'

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগ্নে হৃদয় তাঁর নিত্যসঙ্গী। তার কাছে ঠাকুরের ক্ষ্যাপামির অনেক গল্প আছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হলে কী হবে, রামকৃষ্ণ শুনেছেন হিন্দু-শাস্ত্রের অনুশাসন: সর্ব মানুষের মধ্যে ঈশ্বরজ্ঞান করতে হবে, সর্ব জীবে ঈশ্বর। দক্ষিণেশ্বরে খেতে আসে দলে দলে ভিখিরি ও কাঙাল, তাদের পাতে পড়ে থাকে উচ্ছিষ্ট—রামকৃষ্ণ সেই উচ্ছিষ্টই খেতে শুরু করলেন। দারুণ ব্যাপার! জাত বেজাতের তারতম্যের বিচার হিন্দুরা বরাবর মেনে এসেছেন, রামকৃষ্ণ নিজেও এই পরিবেশে মানুষ হয়েছেন, আর এখন রামকৃষ্ণের কাণ্ডকারখানা এসব জাত বেজাতের পাঁচিলকে একেবারে নস্যাৎ করে দিলে! তবু ওখানকার গোঁড়া হিন্দু যাঁরা তাঁরা এইসব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার প্রতি চোখ বুঁজে রইলেন। আরেক দিনের কথা। তিনি মা কালীকে মিষ্টান্ন নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে যাচ্ছেন এমন সময় মিউ-মিউ ডাক ছেড়ে মন্দিরে ঢুকলো এক ক্ষুধার্ত বেড়াল। ডাক শুনে তক্ষুনি তিনি ঘুরে তাকালেন, সমস্ত নৈবেদ্য খাইয়ে দিলেন বেড়ালকে। বললেন "আহা মা, তুই তো সর্ব ঘটে বিরাজমান, আজ তুই বেড়ালরূপে এসেছিস, তোকেই দিলাম নৈবেদ্য। নে, খা, আর চেঁচাসনি।"

এইসব ঘটনার কিছুদিন পর লোকেরা তাঁকে সম্মান- না-করলেও নীরবে তাঁকে মেনে নিতে যে বাধ্য হলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁরা রামকৃষ্ণের সামান্য জীবনযাপন প্রণালীর প্রতি নিষ্ঠার প্রমাণ পেলেন: শাস্ত্রে জীবনযাত্রার যেমন-যেমন নির্দেশ আছে হুবহু তা-ই তিনি অভ্যাস করে ফেলেছেন।

কিন্তু বাইরে থেকে তাঁকে যে যেমনই দেখুক ভিতরে ভিতরে তিনি অন্য মানুষ। গোপনে গোপনে তাঁর ঐকান্তিক প্রযত্ন ও সাধনা যে কোন স্তরে পৌঁছেছিল, অর্থলালসা থেকে উত্তরণের কাহিনীটি তারই ইঙ্গিত। টাকা-পয়সার মায়াবিভ্রমের মধ্যে সত্যদৃষ্টি কী? তিনি কালীমায়ের কাছে সত্যদৃষ্টি চাইলেন। কেবল প্রার্থনাতেই তাঁর আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ রইলো না। শাস্ত্রে যে আছে 'টাকা' মাটি, মাটি 'টাকা' এইটে তিনি নিরন্তর

মনকে ভজাতে লাগলেন। কখনো কখনো এটা নিজের আচরণে ফলিয়ে তুলবার জন্য তিনি করলেন কী, সোনা-রুপোর মূল্যবান যেসব উপহার ধনী দর্শনার্থীরা তাঁকে দিতেন. তিনি সে-সব ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এইভাবে ঐকান্তিক প্রার্থনা ও অভ্যাসযোগ একটানা চললো প্রায় বছর খানেক। তবু অর্থসমস্যার সুরাহা হলো না। প্রত্যেক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর প্রার্থনা ও অনুধ্যান চললো। এবিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন: "টাকা-পয়সার মীমাংসার ব্যাপারে আমি খুব ভুগেছি। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে টাকাপয়সা ধুলোর সমান। ধর্মকে ধর্ম বলেই মেনে নিয়েছিলুম, তাই মাসের পর মাস ভোরবেলা এক হাতে টাকা অন্য হাতে কিছু মাটি নিয়ে ভাবতুম: টাকা মাটি, মাটি টাকা। কিন্তু তবু উপলবধিতে কিছুই হলো না। শাস্ত্রবাক্যের সত্য আমায় ধরা দিলে না। তারপর কতদিন গেল। একদিন ভোরবেলা গঙ্গার পাড়ে বসে আছি। মাকে বললুম, আমার চোখ খুলে দে, মা। আমায় আলো দেখা। হঠাৎ, ও মা! সমস্ত জগৎ সোনার আলোয় ভরে গেল। ক্রমশ সেই জ্যোতিঃ গভীর হলো। সোনার চেয়ে সুন্দর দেখালো গঙ্গামাটি। চৈতন্যলোকে এই দর্শনের সঙ্গে চারদিকে শুনতে পেলুম গম্ভীর কণ্ঠস্বর: 'হে ব্রহ্মময়ী মা, তোমার কাছে মাটিও যা টাকাও তা-ই।' এতদিন ব্যাকুল হয়ে যা চাইছিলুম তা-ই পাওয়া গেল। আমি টাকা আর মাটি দু-ই গঙ্গায় ছুঁড়ে দিলুম।"

সেইদিন থেকে টাকা-পয়সার ব্যাপারে তিনি নির্ভয় হলেন। এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ভারসাম্যে থাকলো। 'অর্থোপার্জন ভারি জঘন্য' এমন বাজে কথা যেমন তিনি বলেন নি, তেমনি কখনো বলেন নি 'অর্থই ক্ষমতা'। কাঞ্চন-সমস্যার মতো জীবনে আছে আরো অনেক গভীর সমস্যা। পরবর্তীকাল তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছেন: প্রত্যেক জিনিসেরই এ-পিঠ ও-পিঠ আছে। বিপরীত দিকটা ছাড়িয়ে যেতে হবে। তিনি বলতেন, টাকাকে অবহেলা করা কিংবা তার কোনো হিসেব না-রাখা কৃপণের টাকা জমানোর মতোই ভুল। টাকায় কী হয়? না, টাকায় নানা সামগ্রী কেনা যায়। কিন্তু স্বর্গের সিঁড়ি তো টাকায় বানানো নয়।

এদেশে এ-কাহিনীটা বেশ চালু। একবার তাঁর এক শিষ্য বাজার করতে গেছে। দোকানির সঙ্গে দর কষাকষি করা তার কাছে মনে হলো ভারি বস্তুতান্ত্রিক ব্যাপার, সুতরাং মর্যাদাহানিকর। অতএব দরাদরির মধ্যে না গিয়ে কেনাকাটা সেরে সে দক্ষিণেশ্বর ফিরলো। তারপর ব্যাগ খুলে দেখাতেই ঠাকুর জানতে চাইলেন অত টাকায় এত কম জিনিস হলো কী করে। সরলমতি শিষ্য বললে: 'দরদস্তুর করিনি তো তাই।' তারপর আবার কারণ দর্শিয়ে বললে: "কেনই বা দরদস্তুর করবো, বলুন। দরাদরি ব্যাপারটা ভারি তুচ্ছ ব্যাপার।" শুনে তো ঠাকুরের খারাপ লাগলো। তিনি বললেন: "কী বলছিস, তুচ্ছ

ব্যাপার? কী করে খরচ করতে হয়, দরদস্তরের কায়দাটা কী এসব এড়িয়ে গেলে ভেবেছিস ভগবান তোকে সাধু বানিয়ে দেবেন? ধিক! আরে তোর কিছুতে ঘেন্না থাকবে না তবেই না সাধু। জীবনের সওদা করতে গেলে তার কায়দাকানুনও আয়ত্ত করতে হয়। সাধুতা আর মূর্খতায় গোলমাল করিস নি। সাধনা যত করবি অপরের প্রতি ততই সহানুভূতি আসবে। খুব সতর্ক থাকবি, সংসারী লোকদের চেয়েও বেশি। তখন বুঝবি ব্রহ্ম বা ভগবান যেমন অনন্ত আনন্দস্বরূপ, তেমনি অনন্ত চৈতন্য।"

এরকম কাহিনী আছে ঝুড়ি-ঝুড়ি। সে-সব কাহিনীর আলোচনায় আনন্দ আছে। তবু আমরা প্রলোভন সংবরণ করবো, পাঠকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো কালীমন্দিরে যেখানে আঠারো-উনিশ বছরের রামকৃষ্ণ ধর্মজীবনের কঠোর কৃচ্ছ্রতা পালন করছেন। আমরা তো আগেই দেখেছি ধর্মজীবনের প্রতি নবীন সাধকের কী প্রচণ্ড গতি। এই উদ্দামতা তাঁকে উন্মাদ না-করুক পাগলাটে করেছিল ঠিকই।

অবশেষে সংসারী লোকেদের কাছে তিনি প্রমাণ করে ছাড়লেন তিনি এমন উন্মাদ যে পুরোহিত পদের যোগ্যই নন। মন্দিরের দৈনন্দিন কর্মে দারুণ অবহেলা দেখা দিল। কখনো কখনো এমন হলো যে দিনের পর দিন এক নাগাড়ে তিনি পঞ্চবটীর নির্জন জঙ্গলেই পড়ে রইলেন। তাঁর সহকারিরূপে তাঁর ভাগ্নে হৃদয় না-থাকলে কালী-মন্দিরের প্রাত্যহিক কৃত্যই বন্ধ হয়ে যেত। বারংবার এরকম ঘটতে লাগলো। রাণীর পরিবারস্থ লোকজন ছাড়া দক্ষিণেশ্বরের আর পাঁচজনের মনে কোনো সন্দেহই রইল না যে তাঁদের পুরোহিত বাস্তবিক পক্ষে ঘোরতর উন্মাদ হয়ে গেছে। মস্ত একটা দলের দরবার বসলো। রাণীমার কাছে দাবি, তিনি যেন এই উন্মাদকে তাড়িয়ে দেন। আবার তিনি অগ্রাহ্য করলেন এই দাবি। বললেন: "আমার কোনো সন্দেহ নেই যে একমাত্র ইনিই আমাদের ভবিষ্যতের গুরু। সাধন জগতের এই সিংহশিশুটি যতদিন পর্যন্ত আমাদের মন্দিরকে তাঁর নির্জন বাসভূমিরূপে গ্রহণ না করেন ততদিন ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।"

রাণী রাসমণির এই কথায় সবাই হতাশ হলো। সকলে এই কথাটা বুঝে নিলো যে রামকৃষ্ণের ক্ষ্যাপামিকে সহ্য করে নেবার উপদেশ ছাড়া রাণীর কাছ থেকে প্রতিকারের কোনো আশা নেই। রামকৃষ্ণের অবস্থা দেখে প্রতিহিংসা-পরায়ণ হবে কী, গ্রামের লোকেরা বরং গভীর দুঃখ পেলো। এত দুঃখ যে, কেউ কেউ শ'খানেক মাইল পাড়ি দিয়ে তাঁর মাকে গিয়ে এই দুঃখের খবর দিলে। "ভগবান তোমার ছেলের মাথা খারাপ করে দিয়েছেন" বললে তারা। কিন্তু তাঁর মা বোকা ছিলেন না। এই দুঃসংবাদে প্রথমটায় একটু হতচকিত হলেও শেষ পর্যন্ত শান্তই থাকলেন। কিন্তু স্বচক্ষে একবার ছেলেকে দেখলে হয়। তাই

তিনি দক্ষিণেশ্বরে এলেন। রামকৃষ্ণের দিকে বারেক তাকিয়েই তিনি বুঝলেন সব বাজে কথা, তাঁর ছেলে অপ্রকৃতিস্থ নন। যা বুঝলেন তাতে তাঁর এই ভয় হলো যে তাঁর ছেলে সংসার ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী হবেন, সন্ন্যাসাশ্রমই তাঁর শেষ আশ্রয়। পাছে সন্ন্যাসী হন রামকৃষ্ণ, সেটা আটকাবার জন্য তিনি তাঁর বিয়ের প্রস্তাব পাড়লেন। "হ্যাঁ হ্যাঁ, বিয়ে দিয়ে দাও", বিচক্ষণ লোকেরা পরামর্শ দিলেন, "বিয়ে দিলে এসব পাগলামি সব সেরে যাবে।" কারো দিব্যোন্মাদের লক্ষণ দেখা দিলে তাকে একটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে চটপট বিয়ে দিয়ে দেয়া—মান্ধাতার আমল থেকে ভারতবর্ষের এটাই মামুলি প্রথা। এই চাতুরী গৌতম-বুদ্ধের বেলাও হয়েছিল। যদিও এতে বাঞ্ছিত লক্ষ্যপূরণ হয় না, কিন্তু তাতে কী, জল্লাদের কাছে ফাঁসের দড়ির মতো প্রত্যেক বাপ-মায়ের কাছে এইরকম চাতুরী অবশ্য গ্রহণীয়।

সে যাই হোক, কিছুদিন পর রামকৃষ্ণ তাঁর মাকে ডেকে বললেন যে বিয়ে করতে তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যে-মেয়েকে বিয়ে করবেন তাঁকে তিনি দেখেছেন, ৺মা কালী ধ্যানের সময় তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন। রামকৃষ্ণের নির্দেশ মতো তাঁরা খুজতে বেরোলেন। প্রায় শ'চারেক মাইল দূরে কনে থাকেন তাঁর বাপ-মায়ের কাছে। সেখানে গিয়ে তাঁরা পেলেন সেই ব্রাহ্মণকন্যাকে। রামকৃষ্ণের কথা অনুযায়ী সব ঠিকঠাক মিলে গেল। তাঁরা তো অবাক। এই কনের নাম সারদা। যথাকালে সারদার সঙ্গে রামকৃষ্ণের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর সহধর্মিণীকে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে এলেন রামকৃষ্ণ। তারপর তিনি যা করলেন তা কেবল পরম দিব্যোন্মাদ সন্তের পক্ষেই সম্ভব। "ঐ যে উঁচু বাড়িটা দেখছো"—তিনি বললেন সারদাকে—"ওখানে কত বড় জায়গা। সব পাবে ওখানে, যা তোমার দরকার, সব। যাও, ওখানে গিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো যেন আমার সিদ্ধিলাভ হয়। কেন করবে? কারণ, কোনো পুরুষের সাধু হতে হলে মা ও সহধর্মিণী এই দুই নারীর প্রয়োজন। আমার গর্ভধারিণী তো আমাকে এই অব্দি নিয়ে এসেছেন। এখন তোমার কাজ হবে আমার আরেক মা হওয়া। না, না, স্ত্রী নয়, মা। যে ভবনদী পার করে দেবে, পৌছে দেবে ঈশ্বরের রাজ্যে।" যেমন বলা, ছোট্ট বালিকা বধূটি তাই করলেন। তিনি গিয়ে ওই উঁচু নহবতখানার বাড়িতেই থাকলেন। এই উঁচু বাড়ির পশ্চিমের জানালা দিয়ে দেখা যায় গঙ্গা, পূব দিকে মন্দির আর বাগান। উত্তর-দক্ষিণে মস্ত মস্ত বৃক্ষ। এই নির্জনতায় নির্বাসন হলো তাঁর। জনা কয়েক সখি-সহচরী ছাড়া কারো মুখ দেখতে পেলেন না তিনি। মন্দিরে কয়েক ঘণ্টা পুজো-আচ্চার সময় ছাড়া স্বামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় না। বছরের পর বছর এই রকম।

বছরগুলো বড্ডো কঠোর তাঁর কাছে। রামকৃষ্ণের কাছেও কম কঠোর নয়।

দিবস রজনী শুধু কাতর প্রার্থনা ও ধ্যানের কৃচ্ছ্রতা। কিংবদন্তি এই যে, এই সময়টায় তিনি দিন-রাত্রির কোনো মুহূর্তে এক ফোঁটা ঘুমোন নি।

পরম রহস্যের সান্নিধ্যে রামকৃষ্ণের সাধনা তীব্রতর হলো। প্রকৃত হিন্দু স্ত্রীর মতো সারদা স্বামীর ত্যাগ ও সাধনার পথে সহায়তা করতে গর্ব ও আনন্দ অনুভব করলেন। তবু স্বামী-সন্নিধান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সারদার জীবন ভরে উঠল না। একাকীত্বের মুহূর্তগুলো বড় যন্ত্রণাদায়ক মনে হতে লাগল। এ-রকমই একটা সময়ে তিনি রামকৃষ্ণের কাছে এসে বললেন, "হ্যাঁ গো, আমার ছেলেপুলে হবে নি?" রামকৃষ্ণ তাঁকে আশ্বাস দিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার অনেক ছেলেপুলে হবে। পৃথিবীর দিক-দিগন্ত থেকে তারা আসবে। আমি এখুনি দেখতে পাচ্ছি তারা আসছে। কারো কারো ভাষা এমন যে তুমি তা জানো না!" রামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরে এমন দৃঢ়তা ও প্রত্যয় ছিল যে শ্রীমা প্রণত হলেন। নিয়ত প্রার্থনা ও ভক্তির জীবনে তিনি ফিরে এলেন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ইংরেজ ও মার্কিন ভক্তরা যখন তাঁকে প্রণাম জানাতে এলেন, শ্রীমা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন: "এই তো, তাঁর বাণী সত্য হলো। আমার কত ছেলেপুলে, কারো কারো ভাষাও আমি জানি নে!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ত ও তাঁর পত্নী

অবশেষে সিদ্ধিলাভ। প্রথম সিদ্ধি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী জ্যোতির্ময়ের প্রথম আবির্ভাব। ঠাকুর রামকৃষ্ণের বয়েস তখন তিরিশ ছুঁই-ছুঁই। ব্যাপারটা ঘটল একদিন খুব ভোরে। মন্দিরের সকাল বেলাকার কাজকর্ম শেষ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ কালীমায়ের সামনে বসে কথা বলছেন: "ও মা, মা, আজ আমায় দেখা দে, মা। আজ যদি আমায় দেখা না-দিস তো কাল আমার জীবন বিসর্জন দেবো। আজ কতদিন হলো, বারো বচ্ছর তো হলো, কত ডাকলুম, কত ভজালুম তোকে। শাস্ত্রে যেমন-যেমন বলেছে সব, সবই তো করলুম। সাধকদের তুই যেমন শিখিয়েছিস্ শাস্তর-পুরাণের সেই সব শিক্ষা অনুযায়ী জীবনটা গড়ে তুলেছি। তবু মা, তুই দেখা দিলি না! তোর ভুবনমোহন আনন কি আর দেখতে পাবো না? যদি আজ তোকে না দেখাস তাহলে আর এ-জীবনে কি দরকার, কালই এ-জীবন বিসর্জন দেবো।"

কান্নাকাটির পর তিনি থামলেন। মায়ের দিকে তন্ময় হয়ে রইলেন। "যো মাং অনন্যো ভক্তিনা সহ উপাসতে। ত্বমহং সুলভঃ পার্থ।" গীতায় বলেছেন

শ্রীকৃষ্ণ। তন্ময়তার মধ্যে একান্তভাবে এই বাণী তোলপাড় করতে লাগল রামকৃষ্ণের মনে। তারপর ক্লান্ত হলো মন। থামলেন তিনি। ব্যাকুল কান্নায়, প্রার্থনায় দীর্ণ হয়ে বলে উঠলেন : "মা, মা, আমার বুক ভেঙে দে মা, চুরমার করে দে, তবু আমার সব সংশয় দূর কর। তোর অবিনাশী প্রসন্ন মুখ আমায় দেখা।"

অমনি, কী আশ্চর্য, পাথরের কালীমূর্তির হাত নড়ে উঠল। মায়ের অধরোষ্ঠ আগুনের পাঁপড়ির মতো প্রোজ্জ্বলন্ত হলো। ঠোঁট থেকে মুখে, সমগ্র মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হলো তীব্র আলোয়। মায়ের উদ্দাম কেশদামে সীমাহীন জ্যোতির্মণ্ডল। যেন আকাশ থেকে সূর্য নেমে এসেছে মায়ের পশ্চাতে। সেই তীব্র উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় শিখা উপর থেকে নামতে লাগল নিচে, নিচে, আরো নিচে যেখানে পাদপদ্মে শুয়ে আছেন শিব। কিন্তু জ্যোতির্ময় আলোর নাচন সেখানেই থামল না, পাখির বিশাল ডানার মতো সমস্ত মন্দিরে ছড়াল। সমস্ত মন্দির মুহূর্তে উদ্ভাসিত হলো। ঘরের মেঝেতে ঘণ্টা মোমবাতি ফুল—এইসব টুকিটাকি সমস্ত জিনিস আনন্দময় আলোর ছন্দে ভাস্বর হলো। রামকৃষ্ণ যেদিকে তাকান—আলো, আলো, আলো। অবিরল আলোর প্রপাতে চতুর্দিক দশ দিগন্ত উদ্ভাসিত।

"পেয়েছি, পেয়েছি, তোর দর্শন পেয়েছি।" আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন রামকৃষ্ণ। ছুটে বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। যেদিকেই যান আলো ছাড়া কিছু নেই। শুধু আলো আর আলো। তরঙ্গে তরঙ্গে গঙ্গা এসে লুটিয়ে পড়ছে চরণে, সোনার রঙের রঙ্গভরা তরঙ্গ। গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি; গঙ্গাতীর না আগুন-রঙা-পাথর। দূরে দূরে ওই তো গাছের সারি, মাঝগঙ্গায় কত নৌকো, কত মাঝিমাল্লা, আকাশে উড়ছে কত রকমারি পাখি—সমস্ত দৃশ্য এমন কি আকাশটাকেও মনে হচ্ছে আশ্চর্য, দিব্য জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। "দেখেছি, তোর দর্শন পেয়েছি।" রামকৃষ্ণের কণ্ঠে আনন্দের উল্লাস। প্রাচীন ঋষিদের কণ্ঠেও একদা এমনই উল্লাস শোনা গিয়েছিল :

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ,
আ যো যে দিব্য ধামানি তস্থু
বেদাহমেতম্ পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ,
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥"

(আমি পরমপুরুষ পূর্ণ ব্রহ্মকে অবগত আছি। তিনি সর্বজীবগত সর্বসাক্ষী স্বরূপ ও স্বয়ং প্রকাশিত; এই প্রকারে তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইলেই অজ্ঞান দূরীভূত হয় এবং অজ্ঞান ও অজ্ঞানজনিত অসার সংসারমায়া পরিত্যক্ত হইলেই

জীব মৃত্যুকে লঙ্ঘন পূর্বক পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত উত্তমপদ লাভের আর-কোনো উপায় নাই।)

তৎকালে রামকৃষ্ণের এই প্রচণ্ড উল্লাস যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁদের কারো কারো মতে তাঁর এ-রকম অবস্থা ছিল প্রায় দু-সপ্তাহ। কারো কারো মতে তারও বেশি। কিন্তু একটা ব্যাপারে সকলেই একমত: যতদিন ঐ অবস্থা তাঁর ছিল ততদিন পানাহার একেবারে বন্ধ। দাঁতে কুটোটি কাটেন নি, এক ফোঁটা জলও খান নি। অহর্নিশি শুধু ঈশ্বর-কথা, শুধু হরিনাম। যার দিকে তাকাতেন তাকেই বলতেন, "আরে, তোমার মধ্যে যে সাক্ষাৎ আমার মা-কেই দেখছি। তুমি তাঁকে দেখতে পাও না? এই যে তোমার চোখ, তোমার কণ্ঠস্বর, মুখ, বুক—সর্বত্র আমার মা জগদম্বাকে দেখছি। এ যে আনন্দের অতল সিন্ধু!"

তিনি যখন কথা বলতেন, কখনো কখনো তাঁর মুখে উজ্জ্বল আলোয় ভরে যেত। ক্রমশ এত তীব্র হতো সে-আলো যে মুখের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যাবার উপক্রম। লোকেরা সভয়ে চোখ ঢাকত।

এর পরের কথা সকলেই জানেন। অচিরে খবর ছড়িয়ে পড়ল দিগ্বিদিকে। সিদ্ধিলাভের পক্ষকালের মধ্যে সাধুদর্শনে হাজার হাজার লোকের সমাগম হলো দক্ষিণেশ্বরে। এই সময়টায় রাণী রাসমণি আর নেই, বছর কয়েক পূর্বে তাঁর দেহান্তর ঘটেছে। তাঁর দুই জামাতা এখন ঠাকুর রামকৃষ্ণের পার্শ্বচর। শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধিলাভে তাঁরা কৃতার্থবোধ করলেন, তাঁকে সর্বপ্রকারে সেবা করতে তাঁরা প্রস্তুত। কালীমন্দিরে যাঁরাই আসতেন তাঁদের সকলের প্রতি আতিথেয়তায় তাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করলেন। দর্শনার্থীর সংখ্যা যত বিপুলই হোক না, পেট ভরে খাওয়া ও প্রাসাদে আশ্রয় সকলের ভাগ্যেই ঘটত! "আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক।" দর্শনার্থীদের জন্য এই সাদর আপ্যায়ন: "না, না, আমাদের ধন্যবাদ দেবেন না। সাধুবাবার সেবায় যদি কিছু হয় এই কামনা।"

দিন যায়, মাস যায়, দর্শনার্থীর ভিড় বাড়ে। মা-কালীর নামে সবাইকে আশীর্বাদ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ, উপদেশ দেন। এখন আর তিনি লোক দেখলে পালিয়ে যান না, বরং সাদর আহ্বান জানান। তাঁর ক্ষ্যাপামি বলে যেসব ব্যাপার-স্যাপার ছিল তার লেশমাত্র রইল না। সমস্ত কাজ তিনি ঘড়ির কাঁটায় যথানিয়মে করেন, কালীঘরে অসময়ে ধ্যানভজনে যান না। পুজো-আচ্চার কাজ চলে যথাসময়ে। এমনকি কোনো কোনো আনুষ্ঠানিক পুজোর নিয়মকানুন জটিল ও দীর্ঘতর হলেও তাঁর আর আগের মতো ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। এখন দিব্যি তিনি থাকেন দর্শনার্থী উৎসুক ভিড়ের মধ্যে, নির্জনতার সন্ধানে যখন-তখন পালিয়ে যান না পঞ্চবটীর জঙ্গলে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ এই যে, এই সময়টায় এমন একটা শক্তি তাঁর ভিতর থেকে বিচ্ছুরিত হতো যে তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময়ে একটু থেমে তাঁকে প্রণাম না-করে যাবার সাধ্য ছিল না কারো। রাস্তায় কিংবা মন্দিরে যেখানেই হোক, শ্রীরামকৃষ্ণকে চোখে পড়লে মুহূর্তের জন্য একবার দাঁড়াতেই হবে সবাইকে। "তাঁর ভেতরে এত তীব্র আকর্ষণী শক্তি, অথচ মুখমণ্ডলে নম্রতা ও বিনয় ছাড়া আর কিছুই নেই।" এই বিচ্ছুরিত শক্তি কখনো অস্তমিত হয়নি।

অল্পদিন মধ্যে দেখা গেল তাঁর তীব্র আকর্ষণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন লোক ছুটে আসছে। দলে দলে দর্শনার্থীর ভিড়। "তার কারণ," তাদের যুক্তি হলো এই, "কোনো সিদ্ধপুরুষের দর্শনমাত্র জীবনের সব পাপ ধুয়ে মুছে যায়।"

অবশ্য অল্প কিছুকাল পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ঘটেছে তার প্রকৃতি কী, এ-বিষয়ে দর্শনার্থীরা কিছুই জানে না। কী তার সীমা কোথায় তার শেষ, তিনি নিজেই কি জানতেন? আনন্দস্বরূপে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ। কোনটা কি, কতদূর তার বিস্তার কিছুই গ্রাহ্য করতেন না।

একদিন ভোরবেলা তাঁকে দর্শনের জন্য এসেছেন অভাবনীয় এক পুরুষ। দেখেশুনে মনে হয় তিনি পশ্চিমা অঞ্চলের লোক—এবং মহাসাধক। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণের তো ফুরসৎ নেই, তিনি তখন মন্দিরের কাজে ব্যস্ত। সুতরাং মহাপুরুষকে সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা করতেই হলো। তরুণ তাপস শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের জন্য সন্ধ্যের দিকে দর্শনার্থীর ভিড়, সেই ভিড়ের মধ্যে রইলেন ঐ মহাপুরুষ।

রাত দশটা নাগাদ ভিড় পাতলা হলো, যে যার একে-একে বিদায় নিল। গঙ্গার পাড়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ একা। একা থাকলেই ধ্যানের আয়োজন, ধ্যানের আবেশ। এমন সময় ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন সেই মহাপুরুষ। ইনিই তোতাপুরী।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "এ কী তুমি যাওনি ওদের সঙ্গে? তা রাত্তিরটা যদি থাকতে চাও, প্রাসাদে তার ব্যবস্থা ওরা করে দেবে।"

"আতিথেয়তা ভিক্ষা করতে আসিনি আমি।" ছমকে উঠলেন তোতাপুরী: "আমি এসেছি তোমার সঙ্গে কথা কইতে। দোস্ত, নির্বাণের উচ্চমার্গে তোমার চেতনা মাত্র প্রথম থাকে পৌঁছেচে। আরো দুটো থাক্ বাকি আছে।"

একটুও বিস্মিত হলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। বললেন, "সেই থাক্ দুটো কি?"

তোতাপুরী বললেন, "রাম আর হনুমানের কাহিনী তো তুমি জানো। অবতার রামচন্দ্র হনুমানকে যখন জিগ্যেস করলেন, 'হে প্রিয় হনুমান, আমাকে তোমার কী মনে হয়?' হনুমান তখন কী বলেছিলেন?"

"হনুমান বলেছিলেন" উত্তর দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, "প্রভু, আমি যখন তোমায় অনুভব করি, মনে হয়, আমি তোমার সন্তান ও সেবক। যখন তোমার ধ্যানে বিভোর হই, মনে হয়, আমি তোমার অংশ। যখন চৈতন্যের গভীরে নেমে তোমাকে উপলব্ধি করি তখন মনে হয়, তুমিও যা আমিও তা-ই।"*

"মায়ের দিব্য অনুভূতি তোমার হয়েছে। এখন বাকি গভীর ধ্যানে চৈতন্যের পরপারে তাঁকে উপলব্ধি করা। তুমি কি ঈশ্বরের অদ্বৈততত্ত্ব চাও না?"

"কী হবে আমার অদ্বৈততত্ত্বে?"—জিগ্যেস করলেন রামকৃষ্ণ।

"অদ্বৈততত্ত্বে তত্ত্বমসি দূর হবে, ঘুচে যাবে আমি-তুমির সংস্কার।" বললেন তোতাপুরী—"অহং থেকে মুক্তি পাবে।"

দুষ্টুমির হাসি হাসলেন রামকৃষ্ণ। "কেন, যখন ঘুমোই কিংবা মূর্চ্ছা যাই তখন তো আমিটা থাকে না, তখন তো অহং-এর মুক্তি"...

রসকষ শূন্য তোতাপুরী কথা শুনে চমকে উঠলেন, "কিন্তু ওটা সমাধি নয়, অদ্বৈত নয়। নিদ্রায় বা মূর্চ্ছার মধ্যেও আমিটা থাকে, সুপ্ত। আমি-বোধটা আসে যে মস্তিষ্ক নামক যন্ত্রের মারফৎ সেটা থাকে ঘুমিয়ে এই যা।" ক্ষণিক বিরতির পর তোতাপুরী বললেন: "এই অবস্থায় কামনা-বাসনাও থাকে অপ্রত্যক্ষভাবে, অল্পক্ষণ আগে পেট-পুরে-খাওয়া লোকের কাছে যেমন খাবার-দাবার। প্রত্যক্ষ তাগিদ নেই, অথচ আছে। ঘুমের সময়, মূর্চ্ছার সময় লোকের নাড়িস্পন্দন ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া চলতে থাকে, রক্ত চলাচলও বন্ধ হয়না। এগুলো অহং এর সংকেত। সমাধিতে এসব কিছু থাকে না।" তোতাপুরী আবার থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন, "ঘুমের সময়ে আমি-টার যেসব লক্ষণ থাকে, সমাধির সময়ে তা সম্পূর্ণ আলাদা। ঘুমের বা মূর্চ্ছার আগে যে-কামনা-বাসনা-উচ্চাশা থাকে, ঘুম ভাঙলে মূর্চ্ছা ভাঙলে সেগুলোই আবার জেগে ওঠে। কোনো পার্থক্য নেই।"

বাধা দিলেন ঠাকুর, "অদ্বৈত চৈতন্য পেয়েই বা কী হবে?"

তোতাপুরী বললেন: "কেউ সে-অবস্থায় গেলে আমিটা থাকে না: আমি-র

* হনুমান রামচন্দ্রকে যা বলেছিলেন সেই শ্লোকটি এইরকম:

"দেহবুদ্ধ্যা দাসস্তেহং
জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ,
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহং
ইতি মে নিশ্চিতামতিঃ॥"

দেহবোধে আমি তোমার দাস। জীববোধে—অর্থাৎ জীবাত্মাকে যখন বোধ করি, আমি তোমার অংশ। আত্মবুদ্ধিতে অর্থাৎ পরমাত্মাকে যখন জানতে পারি, তুমি-আমি এক। এই আমার নিশ্চিত বুদ্ধি।

সঙ্গে জড়িয়ে থাকে যেসব বাজে ইচ্ছে, বাসনা-কামনা, দুর্বল আশা-আকাংক্ষা—সব তিরোহিত হয়।...অদ্বৈত থেকে ফিরে এলে অমৃতের সঙ্গে সেতুবন্ধন হয়ে যায়। বিবেক বৈরাগ্য ও আনন্দে ভরপুর থাকে সে। সমাধি অবস্থায় হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া চলে না, নাড়িস্পন্দন বন্ধ হয়, তবু সে মরে না। বেঁচে থাকে। জীবন হয় ক্ষুরের মতো তীক্ষ্ণ, সকল আধ্যাত্মিক বিষয়ে চেতনা ধারালো হয়ে ওঠে। কারণ, বস্তু-মানস বুদ্ধি ও চেতনার সমগ্র জগৎ তখন সে-মানুষের মধ্যে উজ্জীবিত হয়। তার মধ্যেই নীড় বাঁধে সত্য-স্বরূপের অভিজ্ঞতা, সত্যচেতনা। সে তখন 'তৎ' হয়ে যায়, তৎ হয়ে সকল প্রাণের সকল প্রাণীর আধার হয়ে ওঠে। সমাধির পর নিজের সম্পর্কে কোনো আলাদা বোধ থাকে না; সে তখন ঈশ্বরের অংশ মাত্র নয়, সাক্ষাৎ-ঈশ্বর হয়ে যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মেরুদণ্ড, অমৃতত্বের সুস্পষ্ট আভাস।"

তোতাপুরীর শেষের কথাগুলির মধ্যে এমন একটা প্রত্যয়ের দৃঢ়তা ছিল যে রামকৃষ্ণ স্পন্দিত হলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বড্ডো সাবধানী। জিগ্যেস করলেন, "কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনি কী চান?"

"কী চাই?" তোতাপুরী বললেন, "আমি তোমাকে উচ্চতর মার্গের ধ্যান-ধারণা শেখাতে চাই। তোমার আধার ভালো, ঈশ্বরসাধনায় তুমি অনেক এগিয়ে আছ। আমি তোমাকে অদ্বৈত বেদান্তের দীক্ষা দেব, অখণ্ড চৈতন্যের দীক্ষা।"

রামকৃষ্ণ তবু গাঁইগুই করলেন—

"কিন্তু আমি তো মায়ের বিনা অনুমতিতে কিছু করতে পারি না।"

কিছুক্ষণ তোতাপুরী চুপ। তারপর রহস্যভরা কণ্ঠে বললেন, "তাহলে যাও অনুমতিটা নিয়ে এসো।"

নীরবে চলে গেলেন রামকৃষ্ণ।

গঙ্গার পাড়ে ধ্যানস্থ হলেন তোতাপুরী।

ইতিমধ্যে গর্ভমন্দিরে গিয়ে মা জগদম্বার সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটল। তারপর মায়ের আদেশ শোনা গেল, "হ্যাঁ, বাছা, ও যা শেখাতে চায় শেখো গে, যাও।"

রামকৃষ্ণ ফিরে এসে তোতাপুরীকে জানালেন, হ্যাঁ, মায়ের অনুমতি পাওয়া গেছে। মায়ের অনুমতি? মা? মন্দিরের মূর্তিকে বলে মা? এইসব কুসংস্কারে অদ্বৈতবাদী তোতাপুরী মনে-মনে একটু হাসলেন, যদিও তরুণ রামকৃষ্ণের নিষ্পাপ সারল্যে তিনি মুগ্ধ। ঈশ্বরের ব্যক্ত-সত্তা, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা, প্রার্থনা, অনুধ্যান—এসব মানেন না তোতাপুরী। তিনি মহান অদ্বৈত-বাদী, অখণ্ড চৈতন্যে বিশ্বাসী। কিন্তু এ-বিষয়ে রামকৃষ্ণকে তিনি কিছুই বললেন না। বলে কী হবে, পরে তো দীক্ষা হবে, তাঁর প্রশিক্ষণে থাকতে থাকতে তাঁর

শিষ্য একদিন সত্যের সন্ধান পাবেই। তখন আপনা-আপনি ঝেঁটিয়ে দেবে এসব কুসংস্কার।

এরপর একদিন তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে জানালেন, যথাকালে যথাবিহিত দীক্ষার গোপন অনুষ্ঠান হবে। তারপর বেদান্ত শিক্ষা, কঠোর নিয়ম-শৃংখলার অনুসরণ। ব্রাহ্মণের উপবীত থেকে শুরু করে ঐহিক জীবনের যাবতীয় উপাধি বা চিহ্ন ত্যাগ করতে হবে রামকৃষ্ণকে। নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে। রাজী হলেন রামকৃষ্ণ।

তোতাপুরী তারপর পঞ্চবটীর গভীর জঙ্গলে চলে গেলেন। সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন। রামকৃষ্ণ প্রত্যহ সেখানে যান, প্রাথমিক কর্তব্য কর্মের উপদেশ নিয়ে আসেন।

একদিন এসব শেষ হলো। তোতাপুরী দীক্ষার দিন স্থির করলেন।

আবার রামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে গিয়ে মা ভবতারিণীর শরণ নিলেন। আবার মায়ের আদেশ পাওয়া গেল: 'অদ্বৈত সাধনায় তোতাপুরীর নির্দেশ মেনে চলো।'

অবশেষে এক শুভদিনে মন্দিরের পুরোহিতের পদে ইস্তফা দিলেন রামকৃষ্ণ, প্রবেশ করলেন পঞ্চবটীর গহিনে।

সেখানে তোতাপুরী একটা বেদী বানিয়েছিলেন। বেদীর উপর চন্দন কাঠের হোমাগ্নি জ্বলে উঠল।

নিজের শ্রাদ্ধ নিজেকে করবার আদেশ পেলেন রামকৃষ্ণ। অদ্বৈত সাধনার পূর্বে চিন্তা ও কর্মে ঐহিক জীবনের যে-সমস্ত সীমিত চেতনা আছে সব দাহ করতে হয়। সুতরাং গভীর জঙ্গলে প্রোজ্জ্বল বেদীর সম্মুখে কৃতসংকল্প গুরু-শিষ্য মুখোমুখি দণ্ডায়মান। গুরুর আদেশে শিষ্য অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছেন: "আমি আমার পিতা-মাতা কলত্র সবাইকে ত্যাগ করলাম। ওঁ অগ্নায় স্বাহা। এতদিন যা-কিছু জেনেছি যা-কিছু শিখেছি, সব ত্যাগ করলাম। ওঁ অগ্নায় স্বাহা। আমার চিন্তা ভাবনা অনুভূতি, সব ত্যাগ করলাম। ওঁ অগ্নায় স্বাহা। অপাপবিদ্ধ পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হে অগ্নি, সমস্ত প্রাণের সংকেত হে বৃক্ষরাজি, ঈশ্বরের অখণ্ড মৌনতা ও ধ্যানের সাক্ষী হে আকাশ, আমার গুরুর সঙ্গে তোমরাও সাক্ষী রইলে, আমি আমার সমস্ত পার্থিবতা ও আমার অহংকে এই পবিত্র অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জন দিলাম। দেশ-কাল অতিক্রম করে আমার জীবাত্মা বিস্তার লাভ করুক, মিলিয়ে যাক মহাকাশের দিগন্তে। ঈশ্বর ছাড়া কোথাও তার বন্ধন না-ঘটুক—যে-ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, ধ্যাননিমগ্ন। হে কৃশানু, আমাকে দাহ করো, আমার সমগ্র ঐহিক সত্তাকে ভস্মসাৎ করো। ওঁ অগ্নায় স্বাহা, অগ্নায় স্বাহা।"...

তোতাপুরী তাঁর হাত ধরে সাতবার অগ্নিপ্রদক্ষিণ করলেন। এখন শ্রী-

রামকৃষ্ণ তাঁর ঐহিক জীবনের জাত-মনের সমস্ত চিহ্ন ও উপাধি অগ্নিতে আহুতি দিয়ে অগ্নির সম্মুখে বহুক্ষণ ধ্যাননিমগ্ন হলেন। সমস্ত বিসর্জন দেয়ার পর এখনো কিছু বাকি আছে, বাকি আছে তাঁর নাম—গদাধর চট্টোপাধ্যায়—তাঁর বাপ-মার দেয়া নাম। গুরুর আদেশে তা-ও বিসর্জন দিলেন তিনি।

আবার রামকৃষ্ণের হাত ধরলেন তোতাপুরী। ধীরে ধীরে নিয়ে গেলেন এক ছোট্টো কুটিরে। সেখানে তাঁরা উপবিষ্ট হলেন। তারপর নিরন্তর অনুধ্যান চললো এইভাবে: "আমিই ঈশ্বর, অনন্ত আনন্দস্বরূপং, 'অনন্ত জ্ঞানং। আমার কোনো নাম নেই, উপাধি নেই, আকার নেই, বিকার নেই, শিবোহং শিবোহং শিবোহং।"

এইভাবে আস্তে আস্তে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন তাঁরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল। অস্ত গেল সূর্য। রাত্রি এলো। তবু তাঁদের ধ্যান চলতে লাগল একটানা, অবিরাম। আকাশে চাঁদ উঠল, পায়ে পায়ে উঠে এলো মধ্য গগনে। শেষ হলো রাত্রি, সূর্যোদয় দেখা গেল। তবু তাঁদের ধ্যান ভাঙলো না।

পরদিন যখন আবার সূর্যাস্তের পর চাঁদ উঠল আকাশে, রামকৃষ্ণ হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন: "না, না, এর বাইরে যেতে পারছি না।"

"কেন পারছ না?" তোতাপুরী হুংকার দিলেন।

"বারংবার আমার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন মা।" রামকৃষ্ণ চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন: "মা, মা, আমি তোমার পুজো করি, আমি তোমার সেবক, মা। চাইনে, তোমায় ছেড়ে চাইনে কোনো অখণ্ড সত্তা।"

"কেন এই দুর্বলতা? চিরকাল কি ছেলেমানুষ থাকবে? সাবালক হবে না? নাও, শুরু করো।"

আবার তাঁরা অদ্বৈতের মন্ত্রিত মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। ডুবে গেলেন গভীর ধ্যানে। তাঁর এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টার বিষয় পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের বলেছেন: "অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যে মনকে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হলাম। পার্থিব বিষয় থেকে মনকে গুটিয়ে নিতে আমার কোনো অসুবিধে ছিল না। কিন্তু সাকার-রূপিণী আনন্দময়ী মা, আমার কাছে তো তিনি সত্যের চেয়েও সত্য, তাঁকে আমি ভুলি কী করে। তাঁকে ছাড়িয়ে আমি উঠতে পারলুম না। তিনি তো সকল আকার, সকল নামের আধার। যতবার ব্রহ্মের দিকে মনঃস্থির করি, ততবার তিনি আসেন আমার সমুখে। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে গুরুকে বলি 'অসম্ভব। এই মন নিয়ে এই চেতনা নিয়ে নির্গুণ ব্রহ্মে পৌছনো আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'অসম্ভব?' হুংকার দিলেন গুরু। 'পারছিস না? কিন্তু তোকে পারতেই হবে।' এই না বলে তিনি আঁধার ঘরের ইদিক-উদিক তাকাতে লাগলেন। শেষে ঘরের কোণে একটি কাঁচের টুকরো পেয়ে সেটি দিয়ে আমার দুই ভুরুর

মধ্যিখানে সজোরে খোঁচা মেরে বললেন, 'নে এইখানে মনকে রাখ।' প্রচণ্ড দৃঢ়তা নিয়ে আবার শুরু করলুম। আজ্ঞাচক্রে তীব্র যন্ত্রণা, ক্রমে ক্রমে সেই শরীর-যন্ত্রণার অন্তঃস্থলে আগুনের শিখার মতো ঝলসে উঠলেন মা, মা আনন্দময়ী। এবার আমি জ্ঞান-খড়্গের আশ্রয় নিলুম। খড়্গ যেমন শরীরকে টুকরো টুকরো করে, সাকারময়ী মা-কে তেমনি দু-টুকরো করে কেটে ফেললুম। আর বাধা রইল না। তক্ষুনি হুস করে কোথায় উড়ে গেলুম। নাম নেই, রূপ নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই, কোথায়, কোথায় গেলুম! কোথায় আবার এইতো, একেই বলে ব্রহ্মস্বরূপে লীন হয়ে যাওয়া! এই চরম অবস্থায় আগে মন আর ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। শরীর পড়ে রইল মৃতবৎ।…তাকিয়ে দেখি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়ে গড়িয়ে কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে, এমন কি মহাশূন্য গলে গলে ঝরে পড়ছে। সমস্ত, সমস্ত কিছু গুটিয়ে গিয়ে ছোট্টো হতে হতে কতক-গুলো ভাবে রূপান্তরিত হলো। চৈতন্যের গভীর মৌনতার উপর ছায়া হয়ে ভাসতে লাগল। কেবল একটা একটানা অস্ফুট স্বর ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল: অহং, অহং, আমি, আমি। আমার জীবাত্মা পরমাত্মায় সত্যস্বরূপে মিশে গেল, আমি-তুমির দ্বৈতভাব আর রইল না। সকল বেড়া ভেঙে ভেঙে অসীম হলো আমার খণ্ডিত আত্মা, অনন্ত আনন্দে ভরপুর হলো জীবন। তখন কোনো বাক্য নেই, ভাবনা নেই। সকল চিন্তা সকল ভাবনা সকল অভিজ্ঞতার পরপারে। মুক্তি বললেও এ-অবস্থাটাকে সীমিত করা হয়। কোনো নাম নেই, সীমা নেই।"

বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বে সিদ্ধিলাভের পর তোতাপুরী রামকৃষ্ণের নামকরণ করলেন—রামকৃষ্ণ পরমহংস। সাধনরাজ্যে এই হলো সর্বোচ্চ খেতাব। তদনুযায়ী সমস্ত ভারতবাসী তাঁকে আজ এই নামেই ডাকে। সে যাই হোক, রামকৃষ্ণের অদ্বৈতলাভের কয়েক সপ্তাহ পর তোতাপুরী চলে গেলেন। যখন এসেছিলেন কেউ তাঁকে দেখেনি, কেউ তাঁকে চেনেনি। যখন চলে গেলেন তখনো তা-ই। তাঁর কর্তব্য সম্পূর্ণ করে তিনি চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি ঠাকুরের কৃতজ্ঞতা ছিল বরাবর, নানান কথাবার্তায় প্রায়ই তিনি সে-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। তোতাপুরীকে তিনি 'ন্যাংটা' বলে উল্লেখ করতেন।

ঠিক এই সময়টায় লোকেরা ঠাকুর রামকৃষ্ণের চেহারায় একটা বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করল। প্রথমত মুখের ভাবে মনে হতো যেন তিনি নির্লিপ্ততার মুখোশ এঁটেছেন, কোনো উচ্ছলতা নেই সেখানে। কেবল চোখ দুটি আলাদা। গভীর, শান্ত, ঝিকমিক চোখে ভালোবাসার তীব্রতা। এই উচ্ছল তারুণ্যে ভরা চোখের তুলনায় তাঁর বাদবাকি মুখাবয়ব ছিল ভিন্নতর, একটু যেন বয়স্ক। লোকেরা বলাবলি করত, "তাকিয়ে দেখো, তাঁর মুখ দেখলে

কিচ্ছুটি বোঝা যাবে না। তাঁর গভীর জীবনের প্রকাশ আছে তাঁর চোখ দুটিতে। চোখ দেখলেই বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর আত্মার কেন্দ্রে বসে আছেন।" কেবল তাঁর নির্লিপ্ত মুখাবয়ব নয়, সমস্ত শরীর—ক্ষিপ্র মজবুত বলিষ্ঠ শরীর—এই শরীরটাও কেমন আলগা ধরনের—যেন একটা চাদরের মতো লেগে আছে। সেটাকে তিনি ধুচ্ছেন, সাফ-সুতোর করছেন, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মঠের মন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ফটোগ্রাফ দেখলে ঠিক এই কথাটা মনে হবে।

এখন থেকে তাঁর চেহারায় বিলক্ষণ দুটি বৈশিষ্ট্য প্রকট : একটা বাহ্যভাব, একটা অন্তর্ভাব। স্বামী সারদানন্দের মতে : "পার্থিব বিষয়ে তাঁর দেহ বোধ থাকত না। বেশির ভাগ সময়ে তাঁর অঙ্গে জামাকাপড় আছে কি নেই, সে-বিষয়ে তিনি একেবারেই বেখেয়াল থাকতেন। সেইজন্যে জামাকাপড় গা থেকে পড়ে না-যায় শিষ্যেরা নজর রাখত। যদিও নিয়মিত স্নান করতেন, শরীরটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন, তবু বাইরের লোকের কাছে মনে হতো তিনি এ-বিষয়ে একেবারে নিশ্চেতন।" দেহবোধ না-থাকায় দেহভারও ছিল না। স্রোতের জলে ভাসমান এক টুকরো কাঠের মতো শরীরে বাস করতেন তিনি। অন্যভাবে বলা যায়, কাঠের মধ্যে যেমন সূক্ষ্মভাবে লুকিয়ে থাকে অগ্নি, তেমনি তাঁর জীবন তাঁর শরীরে। তবু ঈশ্বরীয় আলোচনার সময়ে তাঁর শরীরের অসংখ্য অণু-পরমাণু রাঙা হয়ে উঠত। "ফুলের সৌগন্ধ্যের মতো বিকীর্ণ হতো পবিত্রতা।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণকে জানতেন এমন একজনের বক্তব্য : "তাঁকে প্রত্যক্ষ করেনি, কথামৃত শোনেনি, এমন কারো পক্ষে তাঁর ফটোগ্রাফ দেখে অগ্নিশিখার মতো তাঁর রূপ ধারণা করাই শক্ত। আত্মা থেকে আত্মায়, মন থেকে মনে, সমগ্র ভারতব্যাপী আজ যে আধ্যাত্মিক দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে ফোটোগ্রাফ দেখে তার কতটুকু বুঝবে! ফোটোতে কী আছে, শুধু তাঁর ভস্মাবয়ব। এমনকি যদি প্রত্যক্ষ করতে যে তিনি সহজভাবে বসে আছেন, সেই অবস্থাটা কেমন? না, একেবারে ছবির মতো নির্বিকার। আবার এমনও হতো, ধরো কেউ তাঁর কাছে ঈশ্বরের কথা বললেন, অমনি যেন তিনি শরীর থেকে পিছলে যেতেন। অবাক হচ্ছো? কিন্তু কথাটা কেমন করে বলি! কোনো রক্ত-মাংসের শরীর নয় গো, কেবল একটা আলোর শরীর কল্পনা করো, ভগবৎ-প্রেম ও উল্লাসের মিহি চাদর জড়ানো একটা আলোর শরীর। দ্যুতিময়, দীপ্যমান, ভাস্বর। তবেই সত্যি সত্যি তাঁকে দেখা হলো। বাস্তবিক কখনো কখনো তিনি এমন তীব্র জ্যোতির্ময় রূপে বিরাজ করতেন যে আমাদের চোখ না-ঢেকে উপায় থাকত না। যারা চৈতন্যের উদ্ভাস কাকে বলে জানে না তাদের কাছে এসব একটু অদ্ভুত ঠেকবে বৈকি! কিন্তু কেবল ঈশ্বরের নাম সংকীর্তন

মাত্র যে আধ্যাত্মিক উল্লাসের উদ্দীপন হতে পারে সেটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ঠাকুরের উদ্দীপন হতো অতি সহজে, অতি সামান্য ব্যাপারে। গঙ্গার জোয়ার-ভাঁটার দিকে তাকিয়ে, কিংবা কারো মুখে দৃষ্টিপাত করা মাত্র, কিংবা বিশেষ একটি শব্দের উচ্চারণে—প্রতিদিনের জীবনের এমন অনেক সামান্য ব্যাপারে তাঁর উদ্দীপন হয়ে যেত। যে-কোনো মুহূর্তে, অত্যন্ত সহজে।"

এই সময়টায় স্ত্রীর প্রতি তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন দেখা গেল। স্ত্রীকে অনুরোধ করতেন নির্জন নহবতখানা থেকে বেরিয়ে এসে যেন তিনি তাঁর কাছাকাছি থাকেন। এই সময় থেকেই শ্রীমতী সারদা ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যদের দেখাশুনো করতে আরম্ভ করলেন। কাজটা সহজ ছিল না। একদিকে ঘরকন্নার সবদিকে দৃষ্টি রাখা, অন্যদিকে নানাজনকে নানা নির্দেশ দান। একেবারে আপনজনের মতো যত্ন নিতেন ঠাকুরের ভক্তশিষ্যাদের। তাছাড়া আছে হরেক-রকম রান্না ও খাবারের বন্দোবস্ত। ঠাকুর ও তাঁর 'ছেলেরা'—প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী বিহিত খাদ্য ও পানীয়। কাজের দায়িত্ব যে কী তার একটা উদাহরণ দেয়া যাক। একদিন বিকেলের দিকে রামকৃষ্ণশিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রতিদিনের মতো যোগারূঢ় হতে পারলেন না। ব্যাপারটা গুরুমহারাজাকে খুব ভাবিয়ে তুলল। তিনি ভাবতে লাগলেন এর কারণ কী। কিছুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করে তিনি বলে উঠলেন, 'বুঝেছি, খাদ্যগুণেই সব মাটি হলো।" তিনি শ্রীমতী সারদার দরদালানের সিঁড়ির কাছে ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, "হ্যাঁ গা, ব্রহ্মানন্দের খাবারে কী দিয়েছ? ছেলের আমার মন অচল হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ কিছু খেয়েছে সে। তার খাবারে কী কী দিয়েছিলে?" উপর থেকে জানালা দিয়ে শ্রীমা বললেন, "তার শরীর ভালো থাকবে বলে কিছু বেশি মাখন দিয়েছিলুম। ঘাট হয়েছে, আর দেবো না।" তাঁর এই কথা শুনে ঠাকুর উচ্চহাস্য করে উঠলেন। যাই হোক, তাঁর শিষ্যের মন নিম্নভূমিতে নেমে আসার কারণ অধিক স্নেহপদার্থ সেবন, অন্য কোনো ঐহিক কারণ নয়—এটা জেনে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যদের সেবাযত্ন, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে শিক্ষা পেতেন ধ্যানের মাধ্যমে। জনশ্রুতি এই যে, ঠাকুর তাঁকে প্রথম অদ্বৈত যোগের শিক্ষা দিতে উদ্যোগী হয়ে আবিষ্কার করেন যে, আপন উপলব্ধিতে তিনি সাধনপথে পূর্বাহ্নেই বহুদূর এগিয়ে ছিলেন। স্বামীর নির্দেশ ও অভিভাবকত্বে অচিরে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তারপরে ঠাকুর তাঁর অভিজ্ঞতার সবকিছু তাঁকে শিখিয়েছিলেন। সাধনপথের কোনো কিছুতেই শ্রীমা ব্যর্থ হন নি। ধীর স্থির, শান্ত ও আত্মপ্রচারে পরাঙ্মুখ হওয়া সত্ত্বেও দিনে দিনে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল হিন্দু মেয়েদের

মধ্যে। কেউ কেউ তাঁর কাছে আসত নানাবিধ সমস্যা নিয়ে, কেউ বা বিশ্বস্তভাবে জানাত আত্মোপলব্ধির গোপন বাসনার কথা। তিনি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন, এই বিশ্বাসে অনেকেই আসত তাঁর কাছে বর চাইতে। যাই হোক, ঘটনাক্রমে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠল প্রগাঢ় ধর্মানুরক্ত, সংস্কারমুক্ত ও সাহসী মেয়েদের ছোট একটি দল। এরাই ভিতর থেকে শুরু করেছিলেন ভারতীয় সমাজের সংস্কারসাধন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তাঁর ভক্তশিষ্যদের (এমনকি পুরুষ শিষ্যদেরও) উপদেশ নির্দেশের দায়িত্ব পড়েছিল শ্রীমতী সারদার ওপর। তাঁদের সকলের কাছেই তিনি মা, তাঁদের পিতা শ্রীরামকৃষ্ণ। এ-বিষয়ে সাধারণ লোকের ব্যাখ্যান ভারি চমৎকার: "পাখির ছানা-ভর্তি নীড় ছেড়ে রামকৃষ্ণ চলে গেলে তার দায়িত্ব পড়ল তাঁর বিধবা পত্নীর ওপর। ছানাগুলো যতদিনে না ডানা মেলতে শিখল তিনি পাখি-মায়ের মতো তাদের সেবাযত্নে সতর্ক পাহারায় রক্ষা করতেন।"

সারদামায়ের জীবন আশ্চর্য ও অনন্য। শত সহস্র কথায়ও তার বিবরণ লেখা সম্ভব নয়। যদিও তিনি দেহত্যাগ করেন ১৯২০ সনে, তবু মাত্র সেদিন তাঁর জীবনের নানা খুঁটিনাটি উপকরণ সংগ্রহ করা গেল। এগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দলিল হিসেবে তাঁর জীবনচরিতও রামকৃষ্ণ-জীবনীর মতোই আকর্ষণীয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নানাধর্ম

আধ্যাত্মিক সাধনায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এক অসাধারণ ও অনন্য পুরুষ। ফুলের আকর্ষণে মৌমাছির মতো বহু ধার্মিক লোক উপদেশ নির্দেশের জন্য তাঁর কাছে আসতেন। সমাজ সংস্কারক বিদ্যালয়ের ছাত্র, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ খ্রীস্টান মুসলমান, রাজা উপাধিধারী ব্যক্তি, যন্ত্রবিদ—জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে সকলেই দলে দলে আসতেন দক্ষিণেশ্বরে। কেউ কেউ আসতেন কৌতূহলবশত। কিন্তু অনেকে আসতেন নবীন সাধকের নূতন ধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর প্রত্যেকের মনে হতো তিনি এমন কিছু নতুন কথা বলছেন না। এত সহজ ও সরল তাঁর বক্তব্য যে তাকে তুচ্ছ বলে বোধ হয়। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই অনুভব করত যা তিনি সহজ-সরলভাবে বলেন তার তুলনায় তাঁর ভাঁড়ারে আরো অনেক মূল্যবান বস্তু আছে, ভাঁড়ারের

চাবি তিনি সহজে খোলেন না। "এই সংযমই তাঁর সত্তা।" অভ্যাগতদের একজনার বক্তব্য, "আর এই সত্তাই আমাদের মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছিল। তাঁর উপলব্ধির বিষয়গুলো ছিল প্রবল ও প্রচণ্ড অথচ সংযত ও সংহত। অরণ্যে বাঘ যখন ঘুরে বেড়ায় তখন তার উপস্থিতিতে গাছের পাতাটিও নড়ে না, চারদিক নিঃশব্দ, নিথর। তাঁর রাশভারি উপস্থিতিতে আমাদেরও ও-রকম মনে হতো। তারপর বাড়ি ফেরার পর আমাদের মনের ওপর তাঁর অলৌকিক প্রভাব স্পষ্ট অনুভব করতাম। ফলত থোড়-বড়ি খাড়া আর খাড়া-বড়ি থোড় বলে কিছুই আর মনে হতো না।"

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি, দক্ষিণেশ্বরে আগন্তুকদের মধ্যে খ্রীস্টান মুসলমানও ছিলেন। "পৌত্তলিক রামকৃষ্ণ" কেমন ধারার মানুষ তা দেখবার কৌতূহল নিয়েই তাঁরা আসতেন এবং নিছক একজন ধার্মিক মানুষ ছাড়া কিছুই আর দেখতে পেতেন না। কিন্তু জনৈক খ্রীস্টান ভদ্রলোক রামকৃষ্ণকে একজন মহান ধর্মপ্রবক্তা রূপে উপলব্ধি করেছিলেন। না, তার চেয়েও বেশি। ঠাকুরকে তিনি বললেন: "আমার ধর্মের উপদেশগুলো ব্যাখ্যা করে আমায় বলুন তো।" "কী তোমার ধর্ম?" ঠাকুর জানতে চাইলেন।

"খ্রীস্টান ধর্ম, প্রভু।"

ঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ, যত মত তত পথ। কিন্তু বাবা, তোমার খ্রীস্টধর্ম তো আমি যাচিয়ে দেখিনি। রোসো, দেখতে হচ্ছে।"

সেদিন থেকে পাক্কা দু-বছর ঠাকুর খ্রীস্টধর্ম নিয়ে পড়ে রইলেন। ইংরেজি জানতেন না বলে বাংলা তর্জমায় অসংখ্যবার নিউ টেস্টামেণ্ট তাঁকে পড়ে শোনানো হলো। আস্তে আস্তে তাঁর মনের ওপর এমন প্রভাব পড়ল যে খ্রীস্টধর্ম নিয়ে তিনি ধ্যান শুরু করলেন। পঞ্চবটীর নির্জন জঙ্গলে তিনি বসবাস করতে লাগলেন খ্রীস্টান সন্ন্যাসীর মতো। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটল। একদিন পঞ্চবটী থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "দেখেছি, খ্রীস্টধর্মের রাস্তা ধরে দেখেছি ঈশ্বরকে। কোনো সন্দেহ নেই খ্রীস্টকে অবলম্বন করলে ঈশ্বরদর্শন হবে।"

আরেকবার এক মুসলমান দর্শনার্থী তাঁকে বললেন: "আমি জানি আপনি একজন ধার্মিক মুসলমান।" কথাটা ধাক্কা দিল। মুসলমান ধর্ম নিয়ে কিছুদিন যাচাই করবার সংকল্প করলেন তিনি। অচিরে মুসলমান হলেন। আবার পঞ্চবটীর নির্জনতা, ধ্যান। কোরান থেকে মৌলবি সাহেব যে-শিক্ষা দিয়েছেন তার ওপর নিরন্তর ধ্যান। আবার কাটল মাসের পর মাস। তারপর পঞ্চবটীর নির্জনবাস ছেড়ে একদিন বেরিয়ে এসে বললেন: "মুসলমান ধর্মের রাস্তাও ঈশ্বরের কাছে গেছে। নানা ধর্মের খোলসটাই শুধু পৃথক, ভেতরে সব এক। এবং একাকার। তোমার কোন পথ তাতে কিছু আসে যায় না। সমস্ত পথই সচ্চিদানন্দের পথ। পথের শেষ।"

"কত রকমের নদ-নদী কত বিভিন্ন পথ কেটে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যাচ্ছে কোথায়? না, সমুদ্রে। সেই নীল সমুদ্রে গিয়ে তারা আত্মহারা। ধর্মের বেলাও তা-ই। কত বিচিত্র ধর্ম, নানা মত নানা পথ ধরে মিশে যাচ্ছে ঈশ্বরে। ধর্ম তো ঈশ্বরলাভেরই উপায়। তবে তা নিয়ে এত কামড়াকামড়ি ঝগড়াঝাঁটি কেন? ওতে কোনো লাভ নেই।"

গ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লোকেরা জানতে পারল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একজন সাধু যাঁর মধ্যে সব ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে। এ-নিয়ে খুঁটিনাটি নানান বৃত্তান্ত শুনেছেন জনৈক ইংরেজ মিশনারি। ব্যাপারটি কতটা খাঁটি যাচাই করবার জন্য তিনি এলেন ঠাকুরের কাছে। একজন দোভাষীকেও সঙ্গে আনলেন। ইয়োরোপের রৌদ্রদগ্ধ লালচে টসটসে চেহারার এই সাহেবটি যেমন ঠাকুরের কাছে এসে বসেছেন, অমনি ঠাকুর বলে উঠলেন: "আমি প্রভু যিশুখ্রীস্টকে অবতার বলে প্রণাম করি।" এই আকস্মিক উক্তিতে মিশনারি ভদ্রলোক একটু হকচকিয়ে গেলেন। একটুক্ষণ পর জিগ্যেস করলেন: "তাঁর সম্পর্কে কী জানেন আপনি?"

"কেন, আমি তো তাঁকে ধ্যানে দেখেছি গো! তোমাদের মাথার ওপর ছাতার মতো ছড়িয়ে আছে তাঁর বরাভয়। সংসারের কামনা-বাসনায় তাপ ও পাপের বর্ষণ থেকে খ্রীস্টান সমাজকে নিয়ত রক্ষা করছে সেই ছাতা—বরাভয়ের ছাতা।"

"মানবের রক্ষাকল্পে এ-রকম বরাভয়ের ছাতা কি অন্য ধর্মেও আছে?"

"আছে বৈকি! যিশুখ্রীস্টের পূর্বেও অনেক ধর্মগুরু ছিলেন, লোকেরা তাঁদের মান্য করতেন। মানুষের ভক্তিবিশ্বাস রক্ষার জন্য এখনো কত অবতার আসছেন, যাচ্ছেন। তোমাদের প্রভু যিশুর মতো তাঁরাও সত্য।"

মিশনারি ভদ্রলোক বললেন: "এটা আপনার ভুল। ঈশ্বরের পুত্র একজনই।"

কিছুকাল পর প্রভুদয়াল মিশ্র নামে একজন ভারতীয় খ্রীস্টান ঠাকুরের কাছে এলেন। প্রভুদয়াল শুধু খ্রীস্টান নন, সাধু। প্রায় সন্ত বললেও চলে। খুব নাম।

তিনি ঠাকুরের কাছে এসে বলে উঠলেন: সর্ব জীবে একমাত্র ঈশ্বরই বিরাজমান।"

খানিক চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন ঠাকুর: "দ্যাখো, ঈশ্বর একজন, তাঁর হাজারটা নাম।"

"কিন্তু আমার বিশ্বাস যিশুখ্রীস্ট ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নন।"

ঠাকুর জিগ্যেস করলেন, "তোমার কি দর্শন হয়েছে?"

খ্রীস্টান সাধুটি বললেন, "আগে আমার জ্যোতিঃ দর্শন হতো। তারপর

একদিন যিশুকে দর্শন করলাম। তাঁর সৌন্দর্য ও সুষমা কোনো ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যিনি অগোচর তিনি যখন জ্যোতির্ময়রূপে প্রকাশিত হন, চরাচরে এমন কোনো বস্তু বা ব্যক্তি নেই যে তাঁর সৌন্দর্যের তুলনা হয়।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করে বসে রইলেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই। মিশ্র শান্ত ও স্তব্ধ। অনেকক্ষণ কাটল, যেন কয়েক ঘণ্টা। মিশ্রের বিচিত্র অনুভূতি হলো। শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশী সত্তার তীব্র শক্তি তিনি অনুভব করলেন। বিদায় নেবার আগে বললেন, "আমার ত্রাণকর্তা প্রভুর মধ্যে যে-শক্তিকে উপলব্ধি করেছিলুম এখন দেখলুম আপনার মধ্যেও সেই একই শক্তি। বলতে পারেন পার্থক্য কিছু আছে কিনা?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "একই অগ্নিশিখা। মানুষের চোখে তার নানা রং।"

মিশ্র আবেগে বলে উঠলেন, "আমি আমার সর্বস্ব আপনাকে সমর্পণ করতে চাই। আমি আপনাকেই অনুসরণ করব।"

ঠাকুর তাঁকে নিরস্ত করলেন। "না, না, তুমি তোমার পথ নিয়েই থাকো। যে-আলো এখন দেখছ তা স্তিমিত হয়ে তীব্রতর আলো আসবে একদিন। দেরি নেই। এগিয়ে যাও। যতক্ষণ শেষ না-দেখছ, থেমো না।"

পাঠকদের মনে রাখতে হবে, বিশেষ কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাযুজ্য করা যায় না। তিনি বিশেষ কোনো ধর্মের প্রবক্তা ছিলেন না। প্রত্যেক ধর্মে নিহিত যে-সত্য সেই সত্যের সংলগ্ন ছিল তাঁর জীবনযাপন প্রণালী। আরো একটি কথা: জন্মসূত্রে প্রত্যেক মানুষ যে ধর্মপ্রণালী পেয়ে থাকে তার মধ্য থেকেই সে তার পূর্ণ আধ্যাত্মিক চেতনার পথে এগিয়ে যায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ভিন্ন ধাঁচের মানুষ; জন্মসূত্রে হিন্দুধর্ম পেলেও তিনি আত্ম-চৈতন্যে এমন এক সাধন প্রণালী উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সকল ধর্মের বেড়া ভেঙে দিয়েছে। তাঁর জীবনযাপন চাল চলনের মধ্যেই এমন এক দৃষ্টান্ত ছিল যা দেখে একজন মুসলমান আরো ভালো ও সৎ মুসলমান হবার প্রেরণা পেতেন। খ্রীস্টান কি বৌদ্ধ—সকলের ক্ষেত্রেও তা-ই। কিন্তু এটা কিসের ফলশ্রুতি? না, অন্য ধর্মের শাস্তরটা যেমন-তেমন করে রপ্ত করে নিলেই এটা হয় না। এটা আসলে বহু বৎসরের সাধনার ফল। আপন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা প্রত্যেক ধর্মে যাচাই করে করে যে-সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেছেন এ হলো তা-ই। শুধু যে তিনি প্রধান প্রধান ধর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রপ্ত করেছিলেন তা-ই নয়, হিন্দুধর্মের অন্তর্গত ধর্মসম্প্রদায়ের নানা মত ও পথ তাঁর করায়ত্ত ছিল। কোন মত কিভাবে সত্যের সন্ধান পেয়েছে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি তার হদিশ পেয়েছিলেন। একবার তিনি মাস কয়েক কাটালেন বৈষ্ণব হয়ে। আরেকবার দীক্ষিত হলেন রামপন্থায়। মধ্যযুগের সুমহান রামপন্থী সন্ত হলেন তুলসীদাস। তিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। এই

রামায়ণ থেকে এক-একবারে হাজার হাজার লাইন গান গেয়ে শোনানো হয়। হিন্দু মায়েরা সন্তানদের গান গেয়ে শোনান, কারণ কবিরা শোনান তাঁদের শ্রোতাদের আর অতীন্দ্রিয়বাদী সাধকেরা তাঁদের শিষ্যদের।

বৈষ্ণবধর্ম ও রামপন্থায় ঈশ্বর-উপলব্ধির পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ বললেন : "দুটো পথ ধরেই গেলুম, শেষে দেখি একই রাজার কাছে পৌছে গেছি।" তথাপি তিনি এই ধারণাই পোষণ করতেন যে, ঈশ্বরকে যে রাম বলে জানে তাকে রামের পন্থায় যেতে হবে, যে বিষ্ণু বলে মানে তাকে বৈষ্ণব পন্থায়। যেহোভা, খ্রীস্ট বা নির্বাণ—প্রত্যেকের বেলায় তা-ই।

"যদি একই ঈশ্বরের বহু নাম, তবে কেন একটা মাত্র নামে তাঁকে ডাকা হবে না? নাম বহু থাকলেও ঈশ্বর তো একই?" জিগ্যেস করলেন জনৈক রামকৃষ্ণ-শিষ্য। "নানা সম্প্রদায়ে নাম নিয়ে এত গোলমাল কেন?"

রামকৃষ্ণদেব একটা গল্প বললেন : "ছাখো ঈশ্বরের অবতার তো রামচন্দ্র। একদিন তিনি একটু মুশকিলে পড়লেন, প্রভুকে বিপন্মুক্ত করতে এগিয়ে এলো ভক্ত ও সেবক হনুমান। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয় ও বিষ্ণুসেবক গরুড়ের সাহায্য বিনা তা সম্ভব হলো না। ব্যাপারটা চুকে যাবার পর রামের কাছে গরুড়ের প্রার্থনা : গরুড় তাঁকে যে-রূপে জানে সেই রূপে তিনি আবির্ভূত হোন। অমনি রাম বিষ্ণুরূপে দেখা দিলেন। বিষ্ণুকে পুজো করে গরুড় বিদ্যুৎগতিতে উড়ে চলে গেল মহাকালের মহামৌনের দিগন্তে। তারপর ঝপ করে বিষ্ণু আবার রাম হলেন। হনুমানকে জিগ্যেস করলেন বিষ্ণুরূপে সে তাঁকে পুজো করতে পারে কিনা। ভক্তি গদগদ কণ্ঠে সাশ্রুনয়নে হনুমান বললে—'শ্রীনাথে জানকী নাথে—আমি জানি, রামও যা বিষ্ণুও তা, একই আমার সেই প্রভু। তবু আমার কাছে রামের মূর্তিই সর্বস্ব। শ্রীরামের পাদপদ্মই আমার আশ্রয়, আমার মোক্ষ। হে প্রভু, হে প্রিয়, তোমার রামরূপ যেন আমার দু-নয়নে চিরকাল বিরাজমান থাকে।"

এই কথা বলে শিষ্যকে বললেন রামকৃষ্ণ : "ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মায়, ভিন্ন ভিন্ন মনে ভগবানের এক-এক নাম ও রূপ। সম্পূর্ণ নিজস্ব।"

জনশ্রুতি এই, পৃথিবীর সাত-সাতটি মহৎ ধর্মের বিষয়ে যারা তাঁর মতামতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্য করত, রামকৃষ্ণ তাদের বললেন : "শাস্ত্রে ঠিক ঠিক বলেছে। মানুষের মধ্যেই ভগবান আসেন অবতার হয়ে। তাঁর কোনো দেশ-কাল নেই। পৃথিবীতে যখন অধর্মের দুঃশাসন চলতে থাকে, ধর্ম মৃত্যুর মতো জড় হয়ে যায়, তখনই তিনি মানবের মধ্যে মানুষরূপে জন্মান। প্রতিষ্ঠা করেন সত্য, প্রেম ও প্রজ্ঞার ত্রিশূল। বুদ্ধ, কৃষ্ণ, যিশু, মহম্মদ—এঁরা সবাই সেই ভগবানেরই অবতার।"

"ভবিষ্যতেও কি আমরা ভগবানকে অবতার রূপে পাবো।"

"নিশ্চয়ই।" বললেন রামকৃষ্ণ: "ভবিষ্যতের কপাট বন্ধ করবে কে! কার এমন শক্তি আছে যে ভগবানের আসার পথ রুদ্ধ করে? কতই না বিস্ময়কর জিনিস আছে ভবিষ্যতের গর্ভে! পিশাচ রাক্ষস অসুরের দল যদি জন্মাতে পারে, ভগবান কেন জন্মাবেন না? ভগবানের আবির্ভাব ঘটবে, বারংবার ঘটবে, স্ত্রী কি পুরুষ যে-কোনো রূপে। মানুষ যখনই তাঁকে চাইবে তিনি আসবেন।"

ধর্মের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে রামকৃষ্ণের একটা নিজস্ব ধরন ছিল। সেই নিজস্ব ধরনে, তিনি বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের কোনো কোনো জায়গায় কি রকম ব্যাখ্যা করতেন জনশ্রুতিতে তা-ও জানা যায়। ঈশ্বরাভিমুখে যারা আপন অন্তরে দীন ও নম্র এবং অনুতাপে দগ্ধ, বাইবেলে তাদের প্রভূত প্রশংসা করে আশীর্বাদপূত যে-সকল বাণী লেখা আছে, দর্শনার্থীদের মধ্যে অনেকেই তার তীব্র প্রতিবাদ করত। তারা বলত: "ঐসব বাণীতে স্বর্গীয় মহিমা কি আছে জানিনে বাপু। কিন্তু বুদ্ধির বিচারে তো অমন দীনহীন অনুতাপওলাদের সংখ্যা ভুরি ভুরি।"

রামকৃষ্ণ বললেন: "যদি শুদ্ধবুদ্ধি ও অনুভূতির দৃষ্টিতে ত্যাখো তাহলে বুঝবে, এটা সত্য। যে ভগবানের জন্য তোমরা দিনরাত্তির কাঁদছ তাঁর কথাটা ভেবে দেখেছ কি। ভাবো তো সেই বেড়াল-মায়ের কথা। একটি দুষ্টু ছেলে ঝুড়ি থেকে ছানাগুলোকে নিয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। বেড়াল-মায়ের সে কী অবস্থা! সে কেবল এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে মিউ-মিউ করে কাঁদছে। মায়ের কান্না শুনে বাচ্চাটা ডেকে উঠল। তারপর ছুটিতে এক জায়গায় দেখা হলো। ভগবানের জন্য যে কাঁদে তারও ঐ দশা। ভগবান তাঁর সন্তানকে হারিয়ে বিচ্ছেদ বেদনায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন, ছেলেও খুঁজছে আর কাঁদছে। তারপর এমনি করে দু-জনে দু-জনকে খুঁজে পায়। এইভাবেই অসংখ্য মানুষ ঈশ্বরকে পেয়েছে।

"ভগবানের মুখ চেয়ে অন্তরে যে দীন ও নম্র হয়ে আছে তারও ঐরকম। সে ঈশ্বরকে বলে, 'হে প্রভু, তুমি তো অনন্ত। আমি সামান্য। আমি সোনা-দানা ধনদৌলত নাম-যশ কিছু চাইনে। তোমার প্রসন্ন মুখ দেখাও, তা-ই আমার অনন্ত সম্পদ।' যদি মনেপ্রাণে সে ঐ রকম চাইতে থাকে তাহলে অচিরে সে ভগবানকে লাভ করে। আর ভগবান লাভ হলে সকল তুচ্ছতা ও সামান্যতা ঈশ্বর মহিমায় অসামান্যরূপে দেখা দেয়। সে মানুষের সর্বসত্তা পূর্ণ হয়। ভগবান কেমন? না, একটা খালি পেয়ালার মতো। জল দিয়ে খালি পেয়ালাটা ভর্তি করা যায়, ভগবানকে তেমনি ভক্তি ও ভালোবাসায়। তিনি কিছুই নন, বলতে গেলে তিনি শূন্য, আবার তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব-কিছুই। সব-কিছুর আধার। তিনি পূর্ণ। তারপর আবার যখন কোনো সংজ্ঞায় কোনো উপাধিতে তাঁকে বাঁধতে চাও, তিনি পিছলে যান। তোমার সংজ্ঞা বা উপাধির

খাঁচায় তিনি থাকতে নারাজ। প্রাণ খুলে গান গায় যে-পাখিটা সে খাঁচায় থাকবে কি, সে খাঁচা ভেঙে উড়ে বেড়ায় আকাশে। পৃথিবীর কোথাও তার নীড় নেই। সে অনিকেত। আনন্দিত। মুক্ত।

"আরে না, থেমোনা। ঈশ্বরের অবতার অন্তরের দীনতা ও নম্রতা বিষয়ে কি বললেন তাই নিয়ে মাথা খাটিয়ে মেলাই কচকচি করতে পারো, করো। কিন্তু ঐখানেই থেমে যেও না। ধ্যানীর মন নিয়ে ছাখো, ধ্যানের মধ্যে উপলব্ধি করো সত্যি সত্যি তিনি কি বলে গেছেন। আসল অর্থ জানলে আর সব ঝরে যাবে। অবতারেরা কখনো এক অর্থে কথা বলেন না, তাঁদের ভাষায় দুটো অর্থ সর্বদাই থাকে। একটা সরব, আরেকটা মৌন। একটা দর্শনের বস্তু, আরেকটি উপলব্ধির অপেক্ষা।"

নিউ টেস্টামেণ্ট, কোরান এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে রামকৃষ্ণদেবের মন্তব্য ও মতামত সংরক্ষিত হয়নি—এটা খুবই পরিতাপের বিষয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রামকৃষ্ণ ও গোঁড়া হিন্দুরা

রামকৃষ্ণের বয়েস যখন প্রায় ছত্রিশ তিনি স্থির করলেন, যাঁরা তাঁর কাছে এসে তাঁর কথা শুনতে চান তাঁদের কাছে তিনি তাঁর সাধনোপলব্ধির বিষয় বলবেন। সাধনোপলব্ধির তুঙ্গে তিনি উঠেছেন, তাঁর স্ত্রী ছাড়াও আছেন আরো উদগ্র জ্ঞানপিপাসু—তাঁদের মনকে শিক্ষা দিয়ে গড়েপিটে তুলবার আকাংক্ষা হলো তাঁর।

কিন্তু সংসারে তীব্র জ্ঞানার্থীর সংখ্যা বড় অল্প। প্রথম প্রথম যাঁরা তাঁর কাছে আসতেন তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সমাজ-সংস্কারক, গোঁড়া ব্রাহ্মণ আর কেউ বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে কট্টরপন্থী। রামকৃষ্ণ তাঁদের ব্যবহারিক কর্মের সহায়ক হোন এটাই ছিল তাদের বাসনা। এমন নয় যে, তাঁদের ধর্মবিশ্বাস কম ছিল, কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানের মর্মের চাইতে ধর্মগ্রন্থের আক্ষরিক অর্থের প্রতি তাঁরা অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। তীব্র ও পরুষ ভাষায় এঁদের কশাঘাত করতেন রামকৃষ্ণ। আর সমাজ-সংস্কারকের দল, যাঁরা মানবতাবাদের ঘোলাটে দর্শনশাস্ত্র আউড়ে মানুষের স্বাভাবিক ঈশ্বর আকাংক্ষাকে নস্যাৎ করবার চেষ্টা করতেন, তাঁদেরও তিনি ছেড়ে কথা কইতেন না। গোঁড়া ধর্মান্ধরা রামকৃষ্ণের কাছে কি চান? না, তিনি যেন তাঁদের গোঁড়ামির জয়ধ্বজ

তুলে ধরেন। আর যাঁরা নিজেদের সংস্কারমুক্ত মনে করেন তাঁরা তাঁদের সংস্কারমুক্তির সকল কর্মে তাঁকে বাঁধতে চান। জীবন ও জগতের পরম সত্য যিনি লাভ করেছেন, এই সব আধা সত্যের ব্যাপারিদের বিষয়ে তিনি যে উৎসাহী ছিলেন না, সেটা আর আশ্চর্য কী। তিনি বারংবার বলেছেন: "ধর্ম হলো ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাওয়ার পথ। পথটা তো আর ঘর নয়, তুমি পথের পাশেও থাকো না। পথের পাশে থাকে দোকানিরা। কেনাবেচা করে। নিজের মাল কত ভালো আর পড়শির মাল যে কত খারাপ, এই নিয়ে কত হাঁকডাক কত চেঁচামেচি। পথের এইসব গোলমালে দাঁড়িয়ে না-থেকে এগিয়ে যাও পথের শেষ প্রান্তে। গিয়ে ছাখো তাঁকে, যিনি অশেষ। তাঁর কাছে গেলে সব ঝগড়া সব গোলমাল মিটে যায়।"

তাঁর বিচারপদ্ধতির কঠোরতায় লোকেরা তাঁর কাছে ঘেঁষত না এ-রকম কারো কারো মনে হতে পারে। বরং ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো: রামকৃষ্ণের দর্শনার্থীদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে লাগল।

প্রথমে দেখা যাক, ধর্ম বিষয়ে যাঁদের আন্তরিকতা তর্কাতীত, গোঁড়ামির বিন্দুমাত্র ছায়া পড়েনি এমন সব ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের রামকৃষ্ণ কি বলতেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী এ-রকম একজন ছিলেন ঈশান মুখার্জী। অতিশয় ধনী এবং সৎ ব্রাহ্মণ। কর্মযোগে তাঁর বিশ্বাস অকৃত্রিম। কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের মুক্তিকে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। মানুষের সেবা করেছেন সমস্ত জীবন। একটা হাসপাতাল নির্মাণ করতে হবে, কিংবা একটা অনাথ আশ্রম—এসব পরিকল্পনায় সমাজের কর্মকর্তারা ঈশানকে পেতেন সর্বদা। সর্বদাই তিনি আন্তরিকভাবে প্রস্তুত। তাঁর বদান্যতাও অক্লান্ত। নিষ্ঠাবান গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি; তাঁর জীবনযাপন নিজের জন্য তত নয় যতটা পরার্থে। সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে ঈশ্বরের নির্বাচিত মানুষ হিসেবে গণ্য করত।

কিন্তু ঈশান নিজে এ-বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না। সুতরাং সত্যি সত্যি মুক্তির উপায় কি জানবার বাসনায় একদিন বিকেলে তিনি দক্ষিণেশ্বরের সাধুর পরামর্শ নিতে এলেন। এসে দেখেন গঙ্গার ঘাটে রামকৃষ্ণ কিছু লোকের সঙ্গে কথা কইছেন। পশ্চাতে গঙ্গা, গঙ্গার ওপর গৈরিক ও নীলাভ রঙের পাল তুলে ভাসছে অসংখ্য নৌকো। অস্তসূর্যরঞ্জিত আকাশ।

ঈশান প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলেন। সহসা ভিড়ের মধ্যে স্তব্ধতা নামল। স্তব্ধতা ভেঙে রামকৃষ্ণ শুধোলেন: "কী ঠাকুর, তুমি আবার এখানে কী মনে করে?"

ঈশান বললেন, "মুক্তির সন্ধানে, প্রভু। শাস্ত্র যা যা বলেছে সবই তো করেছি। ধর্মানুষ্ঠানও করে থাকি। কিন্তু যা জানতে চাই তা তো কেতাবে পাইনে। সে কেবল আছে তুর্ধর্ষ সিদ্ধপুরুষের কাছে।"

কিন্তু কিংবদন্তি অনুযায়ী, রামকৃষ্ণ এতে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। আরতির সময় হয়ে এলো বলে তিনি উঠলেন। কালীমন্দিরে চলে গেলেন। অন্যরা বিদায় নিল। কিন্তু ঈশান রইলেন। ঐখানেই প্রার্থনা করতে লাগলেন। সূর্য পাটে নামল। সন্ধ্যা হলো। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে ধীরে ধীরে ডুবে গেল সব—গঙ্গা, গঙ্গার উপরের নৌকো এবং গঙ্গার অপর তীর। এক ঝাঁক পাখির মতো সহসা এক ঝাঁক রুপোলি নক্ষত্র অন্ধকার আকাশে ঝিকমিক করে উঠল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর চাঁদ উঁকি দিল। রামকৃষ্ণ ফিরে এলেন কালীমন্দির থেকে। ঈশান বসে আছেন। ঈশানকে বললেন রামকৃষ্ণ : "বিধিমতো পূজা-আচ্চা ধর্মানুষ্ঠানে চিত্তে যদি কোনো আনন্দই না-জাগল তবে তার কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই। ফল আসবার সময় হলে গাছ থেকে ফুল ঝরে যায়। আত্মার ভেতরে যখন মুক্তির সাড়া জাগে তখন প্রার্থনা আর ধর্মানুষ্ঠান শেকলের মতো চূর্ণ হয়ে যায়। জেলখানার কয়েদি ছাড়া পেলে যেমন হয়, আত্মার মুক্তি ঠিক তেমনি।"

"কিন্তু কর্মে, সৎ কর্মে কি কোনো মুক্তি নেই?" ঈশান প্রশ্ন ছুঁড়লেন।

"সকল পথেই মুক্তি আছে।" বললেন রামকৃষ্ণ : "কর্ম বলো, জ্ঞান বলো, প্রেম-ভক্তি বলো, মুক্তি সব পথেই আছে।"

উদ্ধৃতি দিলেন ঈশান : "শাস্ত্র বলে, আমাতে (ঈশ্বরকে) যার প্রেম-ভক্তি অটল সে আমায় জানতে পায়। একনিষ্ঠ জ্ঞানের পথে যে আমাকে খোঁজে সে জানতে পায়। আমিই সকল জ্ঞানের প্রস্ফুটনের মূলাধার, আমিই সকল জ্ঞানের শেষ সারাৎসার। আবার কোনো ফলাকাংক্ষা না-করে নিষ্কামভাবে যে কর্ম করে সে-ই জানতে পারে, আমিই সকল কর্মের পরিপূরক।' "

জবাবে রামকৃষ্ণ বললেন : "হ্যাঁ ঈশান, শাস্ত্র যা বলে ঠিকই বলে। কিন্তু জগতে কটা লোক আছে যে ফলাকাংক্ষা না-করে নিষ্কাম কর্ম করতে পারে? আর পাণ্ডিত্য, সে তো এক ফোঁটা দীপের আলো। অন্তহীন ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের পিপাসা তো তাতে নেই। পাণ্ডিত্য কখনো আত্মার মুক্তি দিতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভক্তির ব্যাপারটিও তেমনি, ঈশ্বরানুরাগের ব্যাকুলতা যার কণ্ঠে নেই সে-পাখি কী করে ঐকান্তিক মুক্তির গান গাইবে? জ্ঞান ভক্তি কর্ম—যে-পথেই যাও, কামনার লেশ থাকলে ঈশ্বরকে পাবে না।"

ঈশানের স্বগতোক্তিটা বেশ একটু জোরেই হলো। "তাহলে দেখা যাচ্ছে যে-পথই কেউ নিক না কেন, সব পথেই আত্মাভিমানের কাঁটা ও নুড়ি-পাথর ছড়ানো।"

"কথাটা এই যে, জ্ঞান কর্ম ভক্তি যে-পথেই যাওনা, শেষ পর্যন্ত সেই পথ একান্ত নিষ্ঠায় দৃঢ়ভাবে ধরে থাকতে হবে—শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ না অশেষকে পাওয়া

যায় ।" দৃঢ়স্বরে বললেন রামকৃষ্ণ ।

"তবে আমি, আমি কি করব ?" ঈশানের কণ্ঠে আর্তি জেগে উঠল ।

শান্ত কণ্ঠে রামকৃষ্ণ বললেন, "প্রদীপের স্থির শিখা দেখেছ ? দেখেছ সামান্য হাওয়া লাগলে কেমন অস্থির হয় ? ঈশ্বরানুসন্ধানের কাজটিও ঠিক তেমনি সূক্ষ্ম । যতই স্বার্থহীন হোক তোমার কর্ম—বাইরে থেকে তা একেবারে নিখুঁত মনে হতে পারে—কিন্তু ভেতরে সামান্যতম স্বার্থ ও কামনার গন্ধ থাকলেই সব মাটি, ঈশ্বরানুভূতির আর আশা নেই । বাতাস এসে ধাঁ করে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিল ।"

"কিন্তু অমন চরম পর্যায়ে সম্পূর্ণ কামনামুক্ত হওয়া যায় কি করে ?"

"পুরুতদের তোষামোদে কান দিয়ো না ।" বললেন রামকৃষ্ণ । "মুহূর্তের তরেও মনে ঠাঁই দিও না যে তোমার কর্ম ও কৃত্য অপরের মঙ্গলের জন্য । একেবারে গোড়া থেকে শুরু করো । শুদ্ধ চিন্তা দ্বারা কর্মকে নিষ্কাম করো । তার চেয়েও বড় কথা, স্বপ্নকেও কামনামুক্ত করতে হবে । মানুষ যখন ঘুমে অচেতন থাকে তখনো কামনা-বাসনার কাজ চলে গোপনে । আমি নিজে দেখেছি পরীক্ষা করে । সাধনের প্রথম দিকে জাগ্রত অবস্থার মুহূর্তগুলোকে অহংমুক্ত করেও দেখি ঘুমের মধ্যে বাসনার সম্পূর্ণ নির্বাসন হয়নি । তার প্রকাশ হতে থাকল স্বপ্নে । বছরের পর বছর লড়াই করলুম, শেষে একদিন আমি নাগপাশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলুম । চিন্তা-ভাবনায় এমনকি স্বপ্নেও যদি তোমার আমিটাকে বর্জন করতে না-পারো তাহলে এক পা-ও তুমি এগোতে পারবে না । তাঁকে জানতে, তাঁকে প্রেমভক্তি নিবেদন করতে যে-পথ ধরে অধিকাংশ লোক চলে তা নিন্দনীয় । তাদের মনোভাব কী ? যে-ভিখিরিটা দোরে-দোরে ভিক্ষা করে ফেরে, এক মুঠো পেলেই যে খুশি, তারা মনে ভাবে ঈশ্বরের প্রতি তাদের পিপাসা ঐ সামান্য ভিখিরির চেয়েও অধিক । না, না, তা নয় । জঙ্গলে হাতির পালের মতো স্বপ্নে জাগরণে চিন্তায় ভাবনায় ঐহিক কামনা-বাসনাগুলো গিসগিস করছে, আর সামান্য নৈবেদ্য দিয়ে ঈশ্বরকে বোকা ভোলাবে ভেবেছ ? ভেবেছ তোমার অহং-এর এক কণা দিয়ে তাঁকে খুশি করবে ? না, তা হয় না । তাঁর অন্ত নেই গো, অন্ত নেই । তিনি অনন্তস্বরূপ । সামান্যতে তাঁর হয় না, হাতে না-রেখে তুমি তোমার সর্বস্ব দাও, তবে তিনি গ্রহণ করবেন ।"

"তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই"—বিশদভাবে ঝালিয়ে নিলেন ঈশান—"কেবল জাগরণে নিষ্কাম হলেই চলবে না, ঘুমন্ত অবস্থায়ও তা-ই থাকতে হবে । এমন নির্ভেজাল নিষ্কলুষ অবস্থা কি করে লাভ করা যায় ?"

রামকৃষ্ণ বললেন, "ধ্যান করো, প্রার্থনা করো । শুদ্ধ ও নির্লিপ্ত মন আর স্বপ্নের সীমার মধ্যে কাজের ভার নাও । যে-কাজে আত্মাভিমানের লেশমাত্র সম্ভাবনা সে-কাজ কোরো না । অনাথ-আশ্রম, দানছত্র, হাসপাতাল স্থাপন—

এসব কাজের মধ্যে যেও না — বৃহৎ বৃহৎ কর্ম যা তোমার আত্মাভিমানকে সুড়সুড়ি দেয় তা বাদ দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের মতো ছোট ছোট কাজ নাও। তারপর যতই তোমার আত্মাভিমান ক্ষয় হবে আর শুদ্ধতা বাড়বে, তোমার ভেতরের শক্তিই তখন পথ কেটে এগোবে। অন্যেরাও উপকৃত হবে। ছাখো না, হিমালয়ের কঠিন পাথর চূর্ণ করে গঙ্গা বেরিয়ে এসেছে, হাজার হাজার মাইল কত অজস্র লোক তার প্রবাহে তৃপ্ত হচ্ছে।"

"আর-কিছু করার নেই আমার ? বইটই পড়া ? ঈশ্বরে প্রেমভক্তির অভ্যাস করা ?" এক নিশ্বাসে জিগ্যেস করলেন ঈশান। এক নিশ্বাসে তাড়াহুড়ো করে এতগুলো প্রশ্নে আমোদ বোধ করলেন রামকৃষ্ণ।

"ঈশ্বরকে চাও বলে নির্দোষ আনন্দ ছাড়বে কেন ? বেশ তো, পড়াশুনো করো, সাধ্যমতো সবাইকে ভালোবাসো। কিন্তু দেখো, সব কাজে যেন তোমার অহংকে ছাড়িয়ে যেতে পারো। তারপর একদিন যখন ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হবে, তখন দেখতে পাবে তিনি সমস্ত গ্রন্থ-কেতাবের ঊর্ধ্বে। তিনিই হলেন সমগ্র প্রেম। অনন্ত প্রজ্ঞা। কর্মের ভেতর যে-ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা গেল তিনি যদি জ্ঞানে বা প্রেমে না-থাকেন তবে সে-ঈশ্বর সত্য নয়, মেকি। সত্য-স্বরূপ ঈশ্বর কোনো-কিছুকে বাদ দিয়ে নয়, তিনি সর্বব্যাপী। কেবল একটা জিনিস তাঁর কাছে বর্জিত, সে হলো কর্মের ফলাকাংক্ষা — স্বর্গে কি মর্তে যেখানেই হোক। ইহলোক-পরলোকের সমস্ত ফলাকাংক্ষা ত্যাগ করো, ত্যাগ করো স্বর্গের আনন্দ-কামনা।"

বিস্মিত ও কম্পিত কণ্ঠে ঈশান জিগ্যেস করলেন, "কেন, প্রভু, কেন ?"

রামকৃষ্ণ বললেন, "তুমি তো বইটই কিছু পড়েছ। এ-বিষয়ে শাস্ত্র কি বলেছে সে তো তোমার জানার কথা।"

খানিকক্ষণ চিন্তা করে ঈশান বললেন, "হ্যাঁ, গীতার এক জায়গায় আছে বটে, ইহলোক-পরলোকে সুফল আকাংক্ষা করে সৎ কর্ম সম্পাদনও দূষনীয়। 'যামি মাং পুষ্পিতাং বচম্…' তার মানে হচ্ছে এই যে, 'মন-ভরা আকাংক্ষা নিয়ে যাঁরা স্বর্গকে তাদের পরম গতি মনে করেন তাদের মুক্তি নেই।' প্রভু, আমি সে-শাস্ত্র বাক্য পড়েছি। কিন্তু এর সত্যকার মানে বুঝতে পারিনি। সত্যি এর কি মানে ?"

"এই পৃথিবীতে যদি তুমি হাসপাতাল বানাবার কামনা ত্যাগ করতে পারো, তবে কেন স্বর্গে গিয়ে প্রাসাদে থাকবার বাসনা হবে ?" বললেন রামকৃষ্ণ, "এখানে যখন কামনা-বাসনার কুষ্ঠব্যাধি সব-কিছুকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, স্বর্গে তো তা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠবে।"

"কিছুই বুঝলাম না, প্রভু।"

বুঝিয়ে বললেন রামকৃষ্ণ, "ঐহিক ফলাকাংক্ষা নিয়ে সৎকর্ম সম্পাদন যেমন

সাধনপথে অন্তরাত্মাকে ক্লিষ্ট করে, তেমনি পরলোকে পুরস্কৃত হবার বাসনা নিয়ে সৎ কর্মও অশেষ ক্ষতিকারক। এই মর্তলোক বা স্বর্গলোক যা-ই বলো না কেন, নিরহংকারের রাস্তা ও-সবের বাইরে। ঈশ্বর কি কেবল এক জায়গায় আছেন? না। স্বর্গে-মর্তে কোথাও তিনি বাঁধা পড়েন নি। যদি ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করতে চাও, তবে স্বর্গের স্বার্থপর সুখের আশাও ত্যাগ করো।"

"তাহলে এই পৃথিবীতে লোকহিতকর কাজগুলোর ফল কি দাঁড়ায়? তার স্থায়িত্ব কি নেই?" অবাক হয়ে জিগ্যেস করেন ঈশান। "ঐসব সৎ কর্মে যদি আমরা স্বর্গের কাছাকাছিও না-যেতে পারি তবে ও-সব কর্মের ফল কী? আমরা কি কারো হিত করতে পারি?'

"ঈশ্বরের মতো সরল ও নিরভিমান যাঁরা কেবল তাঁদের পরহিত কর্মই স্থায়ী হয়। ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর সৃষ্টিকর্মেরও শেষ নেই। অহংবোধ ত্যাগ করে ঈশ্বরের সাযুজ্য যাঁরা লাভ করেছেন কেবল তাঁদের কর্মেরই কোনো ক্ষয় নেই।

"পরমপুরুষ থেকে চ্যুত হয়ে নিচে নেমে গেছে, মোহগ্রস্ত হয়েছে, তেমন মানুষের দ্বারা কোনো চিরস্থায়ী কর্ম সম্ভব না। তোমার ভিতরের অহংটা পুড়ে পুড়ে ভস্ম হয়ে যদি সেখানে ঈশ্বরের পূর্ণ অধিষ্ঠান ঘটে তবেই তোমার সকল কর্ম অমর হবে। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ যা-ই চাও না কেন, গোড়াতে ভিতটা মজবুত করতে হবে তীব্র ঈশ্বর-কামনায়। সেই ভিত ছাড়া জ্ঞানের ঘর ঘরই নয়, একটা নিরন্তর ফাঁকির গোলকধাঁধা। আর কর্মের সৌধ, সে হলো আত্মরতির ফাঁপানো তাঁবু মাত্র। সুতরাং আজ রাত্রে ঘরে যাও, ঘরে গিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি একমাত্র অধীশ্বর তাঁর কাছে নিবেদন করো তোমাকে। আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে অক্ষয় কর্মের প্রাসাদ গড়া শুরু হবে। ঐ যে তোমার নশ্বর হাত দু-খানা, ঐ হাত দিয়ে গড়ে তুলবে মৃত্যুহীন দুর্গ।"

রামকৃষ্ণের শেষের কথাগুলি ঈশানকে গভীরভাবে নাড়া দিল। ঈশান ধীরে ধীরে নত হয়ে পায়ের ধুলো নিলেন। তারপর ফিটফাট জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে অতি নিঃশব্দে পায়ে পায়ে চলে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রামকৃষ্ণ এবং আধুনিক সমাজসংস্কারক

পাঠকেরা হয়তো ভারতের অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসী ব্রাহ্মধর্মের কথা শুনে থাকবেন। আক্ষরিক অর্থে এটা হলো একেশ্বরবাদিতা। আর এই ধর্মের প্রচারকেরা

তাঁদের সমাজকে বলেন ব্রাহ্মসমাজ। রামকৃষ্ণের জন্মের কিছু পূর্বেই এই ধর্ম নিয়ে আন্দোলন শুরু হয় এবং তাঁর জীবদ্দশায় এর পূর্ণ জোয়ার দেখা দেয়। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের মহান নেতা, দক্ষিণেশ্বরের সন্তের তিনি ছিলেন অকৃত্রিম সুহৃদ। কেশব সেনের সঙ্গে বাক্যালাপ ও ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে তাঁর মতামত জানলে পাঠকেরা রামকৃষ্ণের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি দিক দেখতে পাবেন।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাস ও তার প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় থেকে প্রথমে শুরু করা যাক। ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের আদিযুগে হিন্দুদের মধ্যে এক বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি রামমোহন রায়। ছ-ফিট লম্বা, বাঘের মতো শক্ত ধাঁচের মানুষ। মনের শক্তিও সেই রকম। বাস্তবিক পক্ষে পাঞ্জাবের সাধু দয়ানন্দ এবং রামকৃষ্ণ—যিনি রামমোহনের পঞ্চাশ বছর পর পৃথিবীতে আসেন—এই মহাপুরুষরা যখন ছিলেন না তখন ভারতে রামমোহন রায়ের তুল্য কেউ নেই। গত শতাব্দীর দুই দশকে চব্বিশ বছরের এক যুবক তাঁর আত্মীয়স্থানীয় এক 'সতী'কে দেখেছিলেন, দেখেছিলেন মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সেই সতীর আত্মবিসর্জনের দৃশ্য। রামমোহন যেমন তেজস্বী ব্রাহ্মণ, তেমনি প্রখ্যাত সুপণ্ডিত। ঐ শোচনীয় দৃশ্যের পর তিনি তক্ষুনি সতীদাহপ্রথা উচ্ছেদের আন্দোলন শুরু করলেন। আমি আমার *Caste and Outcast* গ্রন্থে সতী সম্পর্কে পূর্বাপর আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে তা নিয়ে আর আলোচনা করছি না। তবে রামমোহন রায়ই প্রথম এই প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র থেকে প্রমাণ করেন যে, এ-রকম প্রথার কোনো অনুমোদন শাস্ত্রে নেই। সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত রামমোহন মন্দিরে-মন্দিরে, সংস্কৃত টোল থেকে টোলে, কলেজ থেকে কলেজে ঘুরে বেড়ালেন। এই অশাস্ত্রীয় জঘন্য সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝালেন মন্দিরের পুরোহিত থেকে টোল আর কলেজের শিক্ষকদের। তাঁদের মধ্যে জাগালেন এই প্রথার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিভীষিকা। সকলে তাঁরা মেনে নিলেন যে, 'সতীদাহের এই সামাজিক প্রথা কয়েক শো বছরের বস্তাপচা, আমাদের ধর্মে এবং শাস্ত্রের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই।'

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামের চরম পর্যায়ে রামমোহনের কপালগুণে এক স্বর্ণ সুযোগ দেখা গেল। তৎকালীন ভারতে ব্রিটিশের বড়লাট যিনি ছিলেন সতীদাহ উচ্ছেদের অভিলাষ তাঁরও ছিল। তখনকার সময়ে একমাত্র ব্রিটিশ সার্বভৌম শক্তিই আইন পাশ করত, সুতরাং সঙ্গীসাথীসহ রামমোহনের পরিচালনায় ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকদল এই ব্যাপারে ব্রিটিশ শক্তির সহায়তা লাভের চেষ্টা করলেন। রামমোহনের বয়স তখনো চল্লিশ ছোঁয়নি, ভারতবর্ষ থেকে সতীদাহপ্রথার উচ্ছেদ হয়ে গেল।

কাল্পনিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, সমাজে দৃঢ়বদ্ধ অথচ হিন্দু শাস্ত্রে সতী প্রথার কোনো

ভিত্তি নেই—এটা আবিষ্কার করার পর রামমোহন হিন্দুধর্ম ও সমাজের একেবারে গভীরে প্রবেশ করবার সংকল্প করেছিলেন। পড়াশুনো ও গবেষণা কেবল ভারতবর্ষেই করেন নি, যথাযথ ও যথার্থ সংস্কৃত মূল পাঠের জন্য তিনি সুদূর তিব্বতেও গিয়েছিলেন। তখনকার দিনে তিব্বত ছিল পাণ্ডব বর্জিত জায়গার উদাহরণ। সেখানে ছয়-ছয়টি বছর প্রবাস জীবনের পর তিনি দেশে ফিরলেন। ফিরে এসে দেখলেন, পাশ্চাত্য মিশনারিরা হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করছে এই বলে যে, এ-ধর্ম নিতান্তই পৌত্তলিক এবং এর কোনো মানে হয় না। এই সমালোচনার ভিত্তিটা কী জানতে গিয়ে রামমোহন ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিখে ফেললেন। আর ঐ ভাষাতেই তিনি বাইবেল পাঠ শেষ করলেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ঐসব বিদেশি ভাষায় রচিত মুসলমান ও খ্রীস্টান শাস্ত্রের ওপর বেদ-উপনিষদের জ্ঞানের আলো ফেললেন। ফলত সকল ধর্মে উপনিষদের সেই শাশ্বত বাণীটি অগ্নিশিখার মতো প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো:

"একং সৎ—
বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তী।" অর্থাৎ কিনা ঈশ্বর এক, মানুষ তাঁকে নানান নামে ডাকে।

শেষে তিনি এই উপসংহারে পৌছলেন যে, অন্তরজীবনের অভিজ্ঞতার সেই একই কথা সকল ধর্মই বলছে:

যিশুখ্রীস্ট বলছেন—"তোমার ভিতরেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান।"

মহম্মদ বলছেন—"তোমার অন্তরাত্মাতেই তিনি বিরাজ করেন, অথচ তুমি তাঁকে দেখতে পাও না।"

উপনিষদ বলছেন—"তোমার অন্তরেই তাঁর বাস।"

এবং ল্যাটিনে নয়া প্লেটোবাদেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি: "Hominum Interiore Habital Veritas."

সকল ধর্মে একই বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার পর রামমোহন ঐসব ধর্মের আপাত বৈষম্যের অসারতা ধরে ফেললেন। তক্ষুনি তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রচার শুরু করলেন। ব্রাহ্মধর্ম একেশ্বরবাদের ধর্ম, নানা ধর্ম ও পুরোহিতবর্গের দ্বান্দ্বিক কলহ ও কচকচির ঊর্ধ্বে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়—এই ধর্ম এই যে বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ, এটা বাইরের কোনো উৎস থেকে আসেনি, এটা একান্তই ভারতবর্ষের। রামমোহনের ভারতবর্ষের মাটিতেই এর জন্মস্থান। এবং রামমোহন তার প্রতিষ্ঠাতা। এই একেশ্বরবাদ বা বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদের আন্দোলন প্রথমে তিনি শুরু করলেন ভারতবর্ষে, তারপর নিয়ে গেলেন ইয়োরোপে। ইয়োরোপে তখন খ্রীস্টানদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি ও অন্ধতার অন্ধকারময় যুগ। রামমোহনের নূতন ধর্ম সেখানে ভ্রাতৃত্ববোধ ও পরমতসহিষ্ণুতার নবপ্রভাতের সূচনা করল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, ইয়োরোপে পদার্পণের অনতিকালমধ্যে

রামমোহনের দেহান্তর হলো। এইভাবে প্রতীচ্যে ভারতবর্ষের প্রথম মিশনারি জীবনের পরিসমাপ্তি।

রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মধর্মের নেতৃত্ব ন্যস্ত হলো কেশবচন্দ্র সেনের ওপর। পূর্বেই বলা হয়েছে কেশব ছিলেন রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। কেশব ও তাঁর পূর্বসূরী রামমোহনের মধ্যে যে-পার্থক্য তার হেতু দুইটি। প্রথমত, কেশব রামমোহনের মতো আরবি বা সংস্কৃত জানতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন ইংরেজিতে সুপণ্ডিত। বাস্তবিকপক্ষে ইংরেজি ভাষায় তাঁর বাগ্মিতা ছিল গ্ল্যাডস্টোনের তুল্য। ভিকটোরীয় যুগের অভিজাত ইংরেজদের চিন্তাধারায় তিনি পুষ্ট। রামমোহন ছিলেন প্রাচ্যের ভাবাদর্শে লালিত, তাঁর বিদ্যাবত্তা যেমন সূক্ষ্ম তেমনি ক্ষুরধার। কেশবের এসব ছিল না। ব্রাহ্মণের প্রাচীন ও কঠোর রীতিনীতির ধাঁচে গড়ে উঠেছিলেন রামমোহন, পাশ্চাত্যের ভাবধারার অনুশীলন করেছিলেন তার পর। এবং পরিণত বয়েসে পাশ্চাত্য ধর্ম ও দর্শনের সংস্পর্শে যখন এলেন তখন—ততদিনে—ঐসব ধর্ম ও দর্শনের দুর্বলতাগুলো প্রতিরোধ করবার মতো মানসিক শক্তি ও ঐশ্বর্য তিনি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু শুধু দুর্বলতা নয়, প্রতিরোধ নয়, এইসব ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে যে একটি যথার্থ শক্তি ও সুষমা আছে তিনি তার প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু রামমোহনের এই পরিণত বয়েসের সময় কেশব তো নাবালক; কেশবের বয়ঃসন্ধিকালে ইংরেজি পাঠ্যক্রম ও বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের নানাস্থানে সবে শুরু হয়েছে। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় তিনি গঠিত ও পরিস্ফুট হয়েছিলেন। কথাটা অন্যভাবে বললে এই রকম দাঁড়ায় যে, আপন মাতৃস্তন্যের বদলে বিমাতৃস্তন্যে লালিত হয়েছিলেন কেশব। সুতরাং প্রথম থেকেই কেশবের মনোভাব ছিল ধর্মোন্নতি সাধনে পাশ্চাত্যের জঙ্গি মনোভাব, অপর দিকে ভক্তি গদগদ হিন্দুর। তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পাণ্ডিত্যের গভীর অন্তর্দৃষ্টি থেকে উৎসারিত হয়নি। বরং তাঁর কাছে এই ধর্ম ছিল বিদ্রোহের পতাকা। সেই পতাকা উচ্চে তুলে ধরার দায়িত্বও তাঁর। এইসব কারণে জ্বালাময়ী বক্তৃতা আর প্রচণ্ড রকমের ধর্মসংস্কারকের ভূমিকা নিতে হলো তাঁকে। ধর্ম বিষয়ে তাঁর যত অভিজ্ঞতা সবই মুখ্যত রইল ভাবপ্রবণতার পর্যায়ে। পৌত্তলিকতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চাইলেন তিনি, চাইলেন উপনিষদীয় একমেবাদ্বিতীয়মের মৌল পূজার পুনঃপ্রবর্তন। তারপর জাতিভেদ প্রথা, আপন গৃহে নারীর বন্দীদশা আর অল্প বয়সে বিবাহ—এসব নির্মূল করারও অভিলাষ ছিল তাঁর।

কেশব সেনের প্রতিকৃতি দেখে আঁচ করা যায় তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, গায়ের রং ইতালির লোকেদের মতো হালকা। মুখমণ্ডল মস্ত ও ডিম্বাকৃতি। চোখজোড়া পিঙ্গল-কালো। মুখটি কচি ও অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তিনি পোশাক পরতেন ইংরেজের স্টাইলে। আর তাঁর প্রভূত আবেগমণ্ডিত বক্তৃতা—'পরম-

পুরুষ যিশু' যার বিষয়—সেটি ছিল তাঁর বাগ্মিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যিশুখ্রীস্টের প্রসঙ্গে তাঁর এই বক্তৃতা যাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের অভিমত এই যে ভারতবর্ষে খ্রীস্টধর্ম প্রচারে সমগ্র মিশনারিকুলের সমবেত উদ্যোগ ও প্রযত্নকে অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই বক্তৃতা।

এমত অবস্থায় কেশবের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল সেটা কল্পনা করা যায়। নিশ্চয়ই তা ছিল নির্ভেজাল ঘৃণা। কেননা পৌত্তলিক বিরোধী, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সমালোচক কিংবা সমাজ সংস্কারক—রামকৃষ্ণ এর কোনোটাই ছিলেন না। ভাবতে ইচ্ছা হয় কেশব কি কখনো মজুমদারের সঙ্গে গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণের কাছে! এই সেই আরেক অদ্বৈতবাদী প্রতাপ মজুমদার, 'প্রাচ্যের যিশুখ্রীস্ট' গ্রন্থের লেখক। ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে, আমার মনে হয়, মজুমদারই প্রথম যিনি দক্ষিণেশ্বরের সাধু সম্পর্কে বলেছিলেন, "রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বে ধর্ম বিষয়ে আমার ধারণা ছিল ক্ষীণ, তখন আমার সময় কাটত নানাবিধ সংস্কারকর্মে প্রচণ্ড বিক্রমে। কিন্তু তাঁকে জানবার পর এখন আমি ধর্মজীবনের অন্তর্লীন সত্যকে বুঝতে পারি।" ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রধান সতীর্থের এই প্রশংসা বাক্যে আকৃষ্ট হয়ে কেশব একদিন রামকৃষ্ণকে দেখতে গেলেন। যাবার আগে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে সংস্কারাচ্ছন্ন, সাবেকি এক হিন্দুকেই দেখতে পাবেন। কিন্তু তারপর, কী আশ্চর্য,—"এখানে, দক্ষিণেশ্বরে, যিনি ছিলেন তিনি সত্যিকারের অমৃতের পুত্র ছাড়া আর-কেউ নন।" এমন মানুষ যাঁর দর্শন-বিজ্ঞানের কোনো শিক্ষাদীক্ষা নেই, ইয়োরোপীয় কোনো পণ্ডিত বা গ্রন্থের সংস্পর্শে যিনি আসেন নি, অথচ গুরুতর আধ্যাত্মিক বিষয়ে কী সাবলীল তাঁর আলোচনা! এমন জ্ঞান এমন প্রজ্ঞা তিনি কোথায় পেলেন? কেশব বিস্মিত কেশব বিমূঢ়। কী করে বিশ্বাস করা যায় রামমোহন রায় যে-ক্ষেত্রে দিনের পর দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে সকল ধর্মের সকল শাস্ত্র ঘেঁটে ঘেঁটে সত্যের সার নিষ্কাশন করেছিলেন, এই রামকৃষ্ণ কিনা সেই সত্য এবং জন্ম-মৃত্যুর যাবতীয় রহস্য জেনে নিচ্ছেন তাঁর উপাস্য দেবী ভবতারিণীর শ্রীমুখ থেকে! এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! আর সকল ধর্মে পরমত সহিষ্ণুতায় যে-ভাবমূর্তিকে রামমোহন জেনেছিলেন বহু যুক্তিবিচার ও কঠোর পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে আজ, এতদিন ধরে, তারই জীবন্ত বিগ্রহরূপে স্বয়ং রামকৃষ্ণ বিরাজমান! আজ কার সম্মুখে কেশব দাঁড়িয়ে আছেন? ইনি কে? ইনি কি সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেরই অপর পিঠ? অখণ্ড ভ্রাতৃত্ববোধের যে-বিদ্যা অর্জন করেছিলেন রামমোহন, রামকৃষ্ণের সমগ্র জীবন কি তারই প্রতিফলন? কেশবের ওপর রামকৃষ্ণের প্রভাব এমনই দুর্বার হয়ে উঠল।

অচিরে রামকৃষ্ণ ও কেশবের বন্ধুতা গভীর হলো। কেশবের স্বভাব বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে রামকৃষ্ণ কতটা মান্য করতেন, গুরুত্ব দিতেন, সে-কথা বিশদ বলতে

গেলে কেশবের সঙ্গে রামকৃষ্ণের বিশেষ ধরনের সংলাপের কিছু-কিছু নমুনা উল্লেখ করতে হয়। কেশবের আপন স্বভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে কেশবকে শক্তিমান করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, তাঁর নিজের ছন্দ থেকে তাঁকে একেবারে বদলে দেয়া নয়।

প্রথম সাক্ষাতেই কেশবকে বললেন রামকৃষ্ণ, "শুনতে পাই তোমার নাকি ঈশ্বর দর্শন হয়েছে। তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই সে-কথা।" এইভাবে শুরু হলো। দীর্ঘ একটানা ঈশ্বরীয় আলাপন। শেষে একটা গল্প বললেন রামকৃষ্ণ। "যে যেমন বুঝেছে ঈশ্বরকে সবাই তা-ই ভাবে। কিছু লোক একদিন একটা গিরগিটিকে দেখলে গাছ বেয়ে উঠছে। ওদের মধ্যে একজন ওটার পেছন পেছন গাছের মাথায় উঠল। তারপর নেমে এলো। সে এসে বন্ধুদের বললে, 'গিরগিটিটা সবজে রঙের।' তারপর নিজের চোখে দেখবার জন্য আরেক জন উঠল। সে নেমে এসে বললে, 'আরে না, ওটা তো লাল।' এইভাবে তিন নম্বর লোকটি দেখে এসে বললে, 'ওটা নীল রঙের।' এই নিয়ে তুমুল কাণ্ড, রক্তপাত হয় আর কি। এমন সময় পথ দিয়ে যাচ্ছিল একজন। ওদের ঝগড়া দেখে জিগোস করলে, কী ব্যাপার। ওরা ওদের ঝামেলার কথা জানালো। তাই শুনে সে-লোকটা বললে, 'আরে, ঐ গিরগিটি তো, যে-গাছটির নিচে আমি ঘুমোই ওটা থাকে ঐ গাছেই। বেশিক্ষণ ওর রঙ এক রকম থাকে না। কেবলই বদলায়। কখনো নীল, কখনো সবুজ, আবার কখনো বা একেবারে কোনো রঙই থাকে না।' ঈশ্বরও তেমনি।" উপসংহার টানলেন রামকৃষ্ণ। "তাঁর কথা কে বলবে, তিনি অনন্তস্বরূপ।"

এই গল্পের পর, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো দুম্ করে তিনি বলে উঠলেন, "ও কেশব, তোমার লেজ খসেছে।" ব্যাখ্যা করে বললেন, "ব্যাঙাচি দেখেছ তো? যতক্ষণ লেজ থাকে জলে সাঁতরে বেড়ায়। লেজ খসে গেলে ব্যাঙ হয়। লাফিয়ে ডাঙায় ওঠে। ব্যাঙাচির যেমন লেজ, মানুষের তেমনি অবিদ্যা। অবিদ্যারূপ লেজ খসে গেলে মানুষ মুক্ত হয়। সচ্চিদানন্দকে জানতে পারে। তোমাকে দেখলে আমার তা-ই মনে হয়। যদিও সংসারে আছ, তবু সচ্চিদানন্দেও থাকতে পারো।"

প্রথম সাক্ষাতের পর কেশব এই মহাপুরুষের দর্শনে হামেশাই আসতে লাগলেন। কিন্তু সখ্যতার প্রথম দিকে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ বুঝলেন "সংস্কারাচ্ছন্ন সাধু লোকটির" প্রতি ব্রাহ্মনেতার খুব একটা প্রত্যয় নেই। যখনই কেশব ধর্ম প্রসঙ্গে কিছু জিগোস-বাদ করতেন, বক্তব্যের পূর্বে রামকৃষ্ণের সাধারণ ভূমিকা এই রকম হতো: "কেশব, আমার মনে যা আসবে তা তো আমি বলবোই। তুমি তার ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে নিও।"

কালক্রমে এই মহাপুরুষের কাছে কেশব খুব অন্তরঙ্গ হলেও তিনি কিন্তু

কেশবের অনুগামীদের কতকগুলো কার্যকলাপ মেনে নিতে পারলেন না। যেটা খুব খারাপ লাগল রামকৃষ্ণের তা হলো ওদের কট্টর আনুষ্ঠানিক নিয়মের অনুকরণ। তিনি ঠাট্টা করে বললেন; "কেশবের ধর্মানুষ্ঠানে গিয়েছিলুম। ঈশ্বরের মহিমা নিয়ে প্রচুর উপদেশ-টুপদেশের পর ব্রাহ্মদলের নেতা বললেন: 'এসো, আমরা এবারে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হই।' ভাবলুম, এবার ওরা কিছুক্ষণ ধ্যানট্যান করবে। কিন্তু ও হরি, মিনিট কয়েক যেতে-না যেতেই ওরা চোখ খুললো। আমি তো অবাক! ওইটুকুন ধ্যানে কি তাঁকে পাওয়া যায়? যখন সব শেষ হলো, লোকজন চলে গেল, কেশবকে বললুম, 'তোমার ধর্মসভায় দেখলুম ওরা কেমন চোখ বুজে আছে। আমার কি মনে এলো জানো? দক্ষিণেশ্বরের গাছতলায় প্রায়ই এক দল বানর দেখি। ওরা শক্ত হয়ে বসে থাকে, চোখে-মুখে ভালো মানুষের ছাপ। ওরা তখন কিন্তু মনে-মনে ফন্দি আঁটছে কি করে ফলের বাগান তছনছ করে মূলসুদ্ধ খাবে। আরে তাই তো, যেসব বাগানে তদারকি লোকের অভাব কিছুক্ষণের মধ্যে সে-সব জায়গায় সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতলব ভাঁজে ওরা। আজ দেখলুম, তোমার লোকদেরও সেই দশা। ভগবানের প্রতি নিবিষ্ট হবে বলে চোখেমুখে কেমন ভালোমানুষ-ভালোমানুষ ভাব। কিন্তু আসলে ওরা ঐ বানরদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।"

ব্রাহ্মদের গানে একটা লাইন আছে: 'ভজন-সাধন তাঁর কর রে নিরন্তর'। তাই শুনে গায়ককে থামিয়ে দিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বললেন, "ওটা বদলে দাও। বলো—'ভজন-সাধন তাঁর কর রে দিনে দু-বার।' সত্যি যেটা করা যায় তা-ই বলাই ভালো। ব্রহ্মস্বরূপকে নিয়ে মিছে কথা বলা কেন?"

ঈশ্বরের অনন্ত মহিমার কথা সালংকারে ব্যাখ্যা করার একটা বিশেষ অভ্যাস ছিল কেশবের। সুতরাং একদিন কেশব কথিত ঈশ্বর-মহিমার লম্বা ফিরিস্তি সইতে না-পেরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, "ঈশ্বরের গুণগরিমা আর ঐশ্বর্যের এমন ফিরিস্তি দাও কেন? ছেলে কি বাপকে বলে, 'হে পিতা, তোমার এত বাড়ি-ঘর-দোর, এত এত ঘোড়া গাভি, এত এত বাগ-বাগিচা? ওসব কি বাপকে বলার জিনিস? আর বাপ ছেলেকে খাওয়াবে, পরাবে, রক্ষা করবে, ছেলেদের যা-যা দরকার তার ভাঁড়ার থেকে সব দেবে—এ তো স্বাভাবিক। আমরা তো ঈশ্বরেরই সন্তান। আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ দয়া ক্ষমা ইত্যাদি তো থাকবেই, তাতে আর আশ্চর্য কী! তাঁর মহিমা আর সাম্রাজ্যকে যদি এমন সন্ত্রস্ত ও সম্ভ্রমের চোখে ছ্যাখো তবে আর তাঁর কাছে যাবে কি করে। কি করে অন্তরঙ্গ স্বরে বলবে, 'দেখি তো তোমার প্রসন্ন মুখ। না, না, এটা ঠিক না, ঐভাবে তাঁকে দেখতে নেই। তাঁকে দূরে ঠেলতে নেই। তাঁকে আপনার জন বলে ভাবো, তবেই তিনি তোমার গোচর হবেন। আর ঈশ্বরের গুণগরিমার

প্রশস্তি এমন আটখানা করে যে বলো এতে তোমার পৌত্তলিকতা বলে বোধ হয় না ?"

"কেমন করে তা হয় ?"—সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে মুখর হলেন ব্রাহ্মনেতা। "এ দুয়ের যোগ কোথায় ? পৌত্তলিকতা তো ইঁট-কাঠ-পাথরের মূর্তি বানিয়ে পূজা করা। ঐসব জড় পদার্থে নিশ্চয়ই ঈশ্বর থাকেন না। ঈশ্বরের কোনো অবয়ব নেই। তিনি নিরাকার।"

"কিন্তু কেশব, তিনি তো দু-ই।" বললেন রামকৃষ্ণ। "তিনি যেমন নিরাকার, তেমনি সাকার। তুমি তো তাঁর কত প্রশস্তি গাও। তা যেমন খাঁটি ও স্পষ্ট, ভগবানের নানা মূর্তি ও নানা প্রতীকও তেমনি। নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ প্রশস্তি তো ভগবানের কঠিন সাকারত্ব। তুমি যাকে পৌত্তলিকতা বলো তার চেয়ে কোনো তফাৎ নেই।"

কিংবদন্তির সাক্ষী যারা তাদের কাছে শোনা যায়, কেশব তো রামকৃষ্ণের এই কথায় একেবারে ছমকে উঠলেন। "না, আপনার এ-কথা আমি মানতে পারিনে। নীরেট পৌত্তলিকতা আর সেই সঙ্গে নানান জঞ্জাল মিশিয়ে যাকে বলে হিন্দুধর্ম, আপনি যদি তার সঙ্গে আমার কথাকে এক করে ছাখেন তাহলে আমি বলবো আপনি ভুল করেছেন।" কেশব শুরু করলে আর থামতে চান না।—"বালবিধবা প্রথা, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণবৈষম্য, পর্দাপ্রথা, কাঠের টুকরো ও শিলাপাথরকে ঈশ্বররূপে পূজার্চনা আর সংকীর্ণ পুরুতগিরি—এইসব আপদ যত তাড়াতাড়ি নির্মূল হয় ততই ভালো। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, আর সেই মানুষ কিনা বৃষকাষ্ঠের সামনে নতজানু হবে ? এই কি ধর্ম ? আপনি কি এর মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক সত্য দেখতে পান ? না, না, মশায়, তা হয় না। যে-ঝড় আমি তুলেছি তা হিন্দুধর্মের ধোঁয়াচ্ছন্ন আকাশকে পরিষ্কার করবেই। আমাদের ছেলেপুলেরা খাঁটি মানুষ হবে। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর লোভ আর বজ্জাত পুরুতদের চালাকিতে নাজেহাল হয়ে তারা আর মূক ও বধির পশুর মতো জীবনযাপন করবে না।"

"কিন্তু কেশব"—মহাপুরুষের মন্তব্য শোনা গেল—"তুমি হিন্দুধর্ম বলতে যা বুঝেছ সেই ময়লা আকাশ তো নিন্দাবাদের তুফান তুলে পরিষ্কার হবে না। ওতে ব্যবহারিক জগতের রকমফের হতে পারে, কিন্তু যা বাস্তব সত্য তার পরিবর্তন করে এমন শক্তি কোথায় ? মহাশক্তির আশীর্বাদ ছাড়া, তাঁর চাপ-রাশ ছাড়া কি সত্যিকারের পরিবর্তন সম্ভব ? তুমি কি এমন বন্যা বইয়ে দিতে পারো যার স্পর্শে আমাদের প্রত্যেকের জীবন একেবারে সোনা হয়ে ফলে উঠবে ?"

"তার মানে ? কী বলতে চান আপনি ?" জিগ্যেস করলেন কেশব।

"তুমি তো পণ্ডিত মানুষ, পৃথিবীতে কোন কোন অবতার কখন কি করে

গেছেন সে-সব তো তুমি জানো। আমাদের একটু বলো না, শুনি।"

রামকৃষ্ণ মিনতি করেন।

কেশব রাজী। বললেন, "প্রথমে ধরুন প্রভু বুদ্ধের কথা, তাঁর মধ্যে আপনার ধারাটি পরিষ্কার। ক্রোধ নেই, হিংসা নেই, ধীর সমাহিত। কোনো বিপক্ষকেও নিন্দা করেন নি কখনো। বরং তাঁর কাছে যারা এসেছেন তাঁদের সবাইকে তিনি আশীর্বাদ করেছেন, শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁর মধ্যে দিগন্ত-বিস্তৃত দয়া, অন্তহীন প্রেম আর নীতিনিষ্ঠ কঠোরতা--কাকে তা স্পর্শ করল-না-করল সে-কথা আলাদা–সোজা কথা, এইসব মহৎ গুণের জন্য তিনি এক শুদ্ধসত্ত্ব মানব সন্তানরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত। বিশ্ব সংসারের পরিবর্তনে মানবরূপী ভগবানের যে-আশীর্বাদের কথা আপনি বললেন এই কি সেই? এই কি পরম মহত্তম সত্তা?"

"ঈশ্বরের অবতার যিনি তাঁর শক্তিকে আর কি কি নাম দেওয়া যায়?"

"ও বুঝেছি, বুঝেছি।" কেশব হঠাৎ বলে উঠলেন: "বুঝেছি আমি আপনার ফাঁদে পড়েছি। বুঝতে পারছি আপনিই ঠিক, আপনিই ঠিক। আমাদের প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে-ঈশ্বর আছেন তাঁকে সম্যকরূপে প্রকাশ করতে পারেন কেবল ঈশ্বর। ঈশ্বর নিজেকেই নিজে প্রকাশ করেন।"

"ও কেশব, তোমার কথায় আমার আবেশ হয়।" কেমন হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ। তাঁর চোখে এক স্বর্গীয় দীপ্তির ঝিকমিক। তিনি আর কথা কইতে পারলেন না। স্থির হয়ে গেলেন।

রামকৃষ্ণকে ঘিরে উপস্থিত শ্রোতারাও নিশ্চুপ। এই নিটোল স্তব্ধতার মধ্যে স্পর্শসহ কী এক দিব্য অনুভূতি। পরিবেশে যেন সুস্পষ্ট কোনো এক ঐশী শক্তির উপস্থিতি। এই অবস্থা থাকল অনেকক্ষণ। ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণের মুখের চেহারা বদলে গেল। তাঁর স্বাভাবিক ন্যাকা-বোকা ভাবটি চলে গিয়ে জলন্ত অঙ্গারের দীপ্তি পেল, সমস্ত চেহারা জলজল করে উঠল। আস্তে, খুব আস্তে তার কথা ফুটল। সে-সব কথা শাদামাঠা বা অসাধারণ, যা-ই হোক না, কিন্তু তা যেন দুর্জয় ও দুর্লঙ্ঘ্য বলে মনে হলো। প্রতিটি শব্দে ও বাক্যে এক অনির্বচনীয় মধুরতা।

"মানুষ ভাবে যে নিন্দা আর গালাগাল করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে। হিজরের বন্ধ্যাত্ব নিয়ে যতই গালমন্দ করো তাতে তো আর ছেলে জন্মাবে না। সৃষ্টিকর্ম বলো, কোনো বড় জিনিসের প্রাণপ্রতিষ্ঠা বলো, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। তিনিই মূলত সৃষ্টিকর্তা। সর্ব ভূতে তিনিই সারবস্তু। তোমার মধ্যে যখন তুমি এই সারবস্তুকে জানবে তখন তুমি যা বলবে তা-ই সত্য হবে। ন্যায় নীতি আর পুণ্যের কাহিনী নিয়ে তো কত কাব্য-পুরাণ আর পাঁচালি লেখা হয়েছে। তাই বলে কি ও সব কাব্য-পুরাণের পাঠকেরাও অমনি সত্যনিষ্ঠ ও

পুণ্যবান হয়ে গেছে ?

"আবার ছাখো, স্বার্থবুদ্ধির লেশমাত্র নেই এমন কোনো মানুষ যখন আমাদের ধারে কাছে থাকেন তখন তাঁর নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম কর্মের মধ্যেই পুণ্যের সজাব রূপটিকে পাওয়া যায়। এঁরা ঈশ্বরে াটির ধাপ, সাধুতার পূর্ণ প্রকাশ। মানুষের হীনতম স্বপ্নের মধ্যেও এই রকম মহাপুরুষের পুণ্য কর্মের প্রভাব গিয়ে পড়ে। তাদের বদলে দেয়। বিস্মিত বিমূঢ় মানুষ করজোড়ে শ্রদ্ধা ভক্তি জানায়, বলে ইনি ঈশ্বরের অবতার। ঈশ্বরের মতোই তাঁর ছোঁয়ায় সব সত্য ও পবিত্র হয়ে যায়। কারণ ইনি সত্যস্বরূপ। যা কিছু করেন কালের দ্বারা তা বিনষ্ট হয় না। কেশব, তুমি সেই রকম হও, তোমার কাছে এই আমার আকাংক্ষা। এটা-ওটা নিয়ে ঘেউ-ঘেউ থামাও। ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান যিনি তিনি গজেন্দ্রগমনে চলে যান আপন পথে, কোনো ঘেউ-ঘেউকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। তোমার মধ্যে আছে সেই ক্ষমতা, তুমি কি সেই মতো চলবে? নাকি গালমন্দ করে অনর্থক সময় নষ্ট করবে? লোকেরা বলবে যে কেশব কেবল বাগাড়ম্বর করে দিন কাটিয়েছে? তার চেয়ে বরং এমন হও যাতে লোকেরা বলবে, 'হ্যাঁ' ছিলেন বটে একজন, যাকে বলে সত্যের স্তম্ভ। জঙ্গলে বাঘ যেমন চলাফেরা করে তেমনি ছিল তাঁর চালচলন; ত্রুটিবিচ্যুতি শুকনো পাতার মতো থরথরিয়ে কাঁপত আর তাড়া-খাওয়া ছাগলের পালের মতো পাপ যেত পালিয়ে। তিনি ঈশ্বরমহিমায় এমন ভরপুর ছিলেন যে সামান্য লক্ষণে সকলের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ঝরে পড়ত। অমর তাঁর বাণী। আমাদের গালমন্দ করে কখনো খাটো করেন নি, বরং ঈশ্বর-অভিমুখে তুলে ধরেছেন।"

এই রকম সমালোচনা কেশবকে বিদ্ধ করল না। বরং রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভালোবাসার উদ্রেক করল। ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশব যে বাস্তবিক কত মহৎ ছিলেন এটা তারই নিদর্শন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস কত বিষয়ের আলোচনা হলো এই দু-জনার। সে আলোচনার বিষয়বস্তু কখনো যিশুখ্রীস্ট, কখনো বুদ্ধ, জোরোস্টার, মহম্মদ এবং মানব উদ্ধার করেছেন এমন আরো কত ঈশ্বরাবতার। তারপর কেশব একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রামকৃষ্ণ প্রায়ই তাঁকে দেখতে যেতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঈশ্বরীয় আলোচনা হতো। রামকৃষ্ণ একদিন বুঝলেন যে কেশবের অন্তিম দশা আসন্ন। কেশবকে জানিয়ে দিলেন সে-কথা। জলভরা চোখে বললেন, "কেশব, বসরাই গোলাপ হচ্ছে সেরা গোলাপ। ঠিক মতো লালন করতে গিয়ে বাগানের মালি খোঁড়াখুঁড়ি করে তাকে বড়ো কষ্ট দেয়। শুধু কি তাই, গোড়াসুদ্ধ আলগা করে রোদ্দুরে লাগানো শিশির খাওয়ানো, এইসব আরো কত কী। তেমনি মা তোমার গোড়া খুঁড়ে দিচ্ছেন; তোমার মধ্যে তিনি একটি আশ্চর্য ফুল ফুটিয়ে তুলবেন। এই বলে রামকৃষ্ণ কেশবের শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করলেন। অল্পদিন পর কেশবের

মৃত্যু সংবাদ যখন পৌঁছলো রামকৃষ্ণ বেদনার্ত হয়ে বলে উঠলেন, "আঃ, আমার একজন পরমাত্মীয় চলে গেল, মনে হয় যেন বুকের পাঁজরটা ভেঙে দিয়ে গেল।"

অমৃতের প্রতি রামকৃষ্ণের যে বিশ্বাস সে-বিষয়ে তাঁর বাণী দিয়ে এই পরিচ্ছেদের সমাপ্তি হওয়াই সংগত।

মণি মল্লিক তাঁর ভক্ত ও সুহৃদ। একদিন তার ছেলেটি মারা গেল। অন্ত্যেষ্টির পর রামকৃষ্ণের কাছে চলে এলো কিছু সান্ত্বনা পাবার আশায়। তখন ঘরভর্তি লোক, ঠাকুর তাদের সঙ্গে কথা কইছেন। শোকসন্তপ্ত মল্লিক ঘরে ঢুকতেই যেন মূর্তিমান শোকের একটা ধাক্কা লাগল সকলের চোখে। যাই হোক মল্লিক বসতেই রামকৃষ্ণ আবার কথা শুরু করলেন। ভক্ত শ্রোতাদের মধ্যে আবার স্বাচ্ছন্দ্য এলো। তারপর থামলেন তিনি। থামতেই চারিদিকে শান্তিময় নীরবতা। ভোরবেলাকার স্নিগ্ধ হাওয়ায় কীটপতঙ্গের গুঞ্জনের মতো সেই শান্ত নীরবতার মধ্যে শোনা গেল একটি অস্ফুট মর্মরধ্বনি। এ-মর্মর ক্ষীণ কণ্ঠ মল্লিকের। রামকৃষ্ণকে সে তার মর্মবেদনা জানাচ্ছে। কী বলছে মল্লিক তা শোনবার জন্যে ভিড়ের মধ্যে ঔৎসুক্য দেখে রামকৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর গান গেয়ে গেয়ে নাচতে লাগলেন।

'জীব সাজ সমরে।
ঐ দেখ্‌ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
আরোহণ করি মহাপুণ্যরথে ভজন সাধন দুটো অশ্ব জুড়ে তাতে
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান ভক্তি-ব্রহ্মবাণ সংযোগ কর রে।
আর এক যুক্তি আছে শুনে সুসঙ্গতি,
সব শত্রুনাশের চাইনে রথরথী—
রণভূমি যদি করেন দাশরথী ভাগীরথীর তীরে।'

এইভাবে চলতে লাগল তাঁর গান, নাচ আর কথা। এর মধ্যে হয়তো কোনো অলৌকিক ক্রিয়া আছে, ভাবল সকলে। সাধনা ও সিদ্ধির পথে মানুষের তো চিরন্তন লড়াই। এ হয়তো তারই কোনো অভিব্যক্তি। তারপর এক সময় রামকৃষ্ণের ভাবোন্মাদ থামল। মল্লিকের পাশে বসে পড়লেন তিনি। বললেন, "তোমার মধ্যে এখন একটা শোকের আগুন জ্বলছে। কিন্তু এ তো মায়িক দুঃখ, একটা শরীরের জন্য আরেকটা শরীরে দুঃখ। সত্যের খড়্গাঘাতে যে-বেদনা এ তো তা নয়। যতক্ষণ শরীরটা থাকে ততক্ষণই এই দুঃখ. মায়িক দুঃখ শরীর সর্বস্ব। সাময়িক। যা নিত্য ও সত্য, আত্মায় তাঁর বাস, তাঁর দুঃখ নেই।

"আমার ভাগ্নে অক্ষয় যখন মারা যায়, আমি কাছে ছিলুম। ভালো করে দেখছিলুম। হঠাৎ দেখি খাপ থেকে তলোয়ারের মতো দেহ থেকে জীবাত্মাটি সরে গেল। দেহটা পড়ে রইল, কিন্তু তলোয়ার যেমন-কে তেমন। এই দেখে

আমার আনন্দ হলো। আমি হাসতে লাগলুম। নাচতে লাগলুম। পরদিন অক্ষয়ের অন্ত্যেষ্টির পর, আমি এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম, মনে হলো আমার বুকের মধ্যে যেন গামছা নিঙড়োচ্ছে। বল্লুম, 'মা' আমি সংসারের কেউ না, আমারই এই দশা, তবে সংসারী সাধুদের দুঃখ না-জানি আরো কত মর্মান্তিক।' আঃ, এইভাবে, তুমি যে-জ্বালায় জ্বলছ তার কণামাত্র আস্বাদ করেছি, মল্লিক। কিন্তু ভগবানের প্রতি আসক্তি থাকলে এই মায়িক দুঃখের অতলে তলিয়ে যাবে না। ঐ দ্যাখো, গঙ্গার ওপর ছোট ছোট নৌকোগুলো ছোট খাটো ঢেউ লেগেই নাজেহাল, আর বজরাগুলো ঢেউ কাটিয়ে যাচ্ছে কেমন তরতর করে। তোমার নিজের ভেতরের বজরাটাকে ঈশ্বর ভাবনায় যতই ভরপুর করবে, পাহাড় প্রমাণ দুঃখও তোমার গায়ে লাগবে না। নশ্বর শরীরের জন্যেই শরীরের দুঃখ। আত্মার জন্যে তো নয়। আত্মা তো অবিনশ্বর, চৈতন্যে উদ্দীপ্ত।"

এসব কথা কেবল কথার কথা নয়, কথামৃত। এই শক্তিধর বাণীই শ্রীরামকৃষ্ণ। এই বাণীশক্তি মল্লিককে এমন নাড়িয়ে দিলেন যে যাবার সময় মল্লিক বলে গেল, "আমি জানতুম আপনার কাছে আসা কত প্রয়োজন। কারণ আমার এই শোক আর কেউ নেভাতে পারত না।"

"মৃত্যুকে ভয় করে কারা ? না, যারা সংসারের মায়ায় আবদ্ধ। আর মিথ্যা মায়ায় যারা অন্ধ নয় তাদের কাছে মৃত্যুও নেই। অনেক সময় ধ্যানে যখন চোখ দুটো স্থির হয়ে যায়, এপার ওপার দুই জীবনের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে দেখি তফাতটা কোথায়। না, কোথাও তফাৎ নেই, কোনো মৃত্যু নেই কোথাও। বাসনাকামনায় যে-সংসার সেই সংসারের মায়াপাশ খসে গেলে দেখবে সেই এক শাশ্বত মহাজীবন। মৃত্যুর বিচ্ছেদ আর মনেই আসবে না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যরা

প্রত্যহ কত শত লোকের আনাগোনা। তাদের সঙ্গে রামকৃষ্ণের নিত্য সংযোগ ও আলাপচারিতা খুবই চিত্তাকর্ষক। তবু তাঁর বাণীর অনন্য তাৎপর্য বোঝা যাবে না, যদিনা তাঁর শিষ্যবাছাই ও তাদের ট্রেনিঙের ব্যাপারটি খুঁটিয়ে দেখা যায়।

রামকৃষ্ণের পূর্বে মহাত্মা ও মহাপুরুষদের স্ব-স্ব মত ও পথের অনেক গোষ্ঠী ছিল। কিন্তু এই গোষ্ঠীগঠনে রামকৃষ্ণের কোনো রুচি ছিল না। এই ব্যাপারে বহুবার তিনি বলেছেন—

"এমন দিন ছিল যখন মহাপুরুষদের বাণীর প্রেরণায় লোকেদের ঈশ্বর-দর্শন হতো। সেই দিন নেই আর। এখন নতুন ভিৎ গড়বার সময়। এখন আমাদের জীবনের গতিকে ষোল আনা অন্তর্মুখী করতে হবে, অন্তর্জীবনের তীব্র সাধনায় খাঁটি সত্তাটি জাগবে। এই ঐশী সত্তাই সত্যের আলো ছড়ায়। পাহাড়-পর্বত সব স্থির হয়ে আছে, আর তার ভেতর থেকে উঠছে, ছুটছে কত শত স্রোতস্বিনী। যুগ যুগ ধরে পাহাড় গড়েছেন তিনি। আর সেই পাহাড়ের স্রোতোধারায় স্নান করছে, পান করছে, জীবনধারণ করছে কত যুগ ধরে কত শত লোক।

"যদি আমাদের সত্তায় ঐশী শক্তির এক প্রকাণ্ড পাহাড় গড়ে তুলতে পারি তাহলে সর্ব কালের সর্ব যুগের মানুষের জন্যে প্রেম ও অমৃতের জ্যোতির্ময় স্রোতোধারা বইয়ে দেয়া যায়। তার জন্যে যত দিন লাগে লাগুক না।"

এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এখন আমরা দেখব কিভাবে রামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা এখনো জীবিত তাঁদের জীবন-ইতিহাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সৌজন্যে বাধে। যাঁরা ইতিমধ্যে স্বর্গত কেবল তাঁদের জীবনালেখ্য নিয়েই আলোচনা করব। তাঁদের মধ্যে দু'জন—ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ, এঁদের সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি তা নিতান্তই সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ। কারণ অল্পদিন পূর্বে এঁরা দেহত্যাগ করেছেন এবং এঁদের বিষয়ে সব তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয় বিবেকানন্দ, প্রেমানন্দ ও লাটু মহারাজের জীবনীর ওপর। অবশ্য এই তিন জনের বিষয়েও খুব বেশি-কিছু জানা যায় না। কারণ এঁরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তথ্য যা পাওয়া যায় তা কেবল এঁদের পূর্বাশ্রমের অর্থাৎ সংসারজীবনের। বিবেকানন্দ প্রণীত 'রামকৃষ্ণের জীবন' পাঠ করেছেন এমন ব্যক্তি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, গুরু-শিষ্যের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের নিগূঢ় কাহিনীগুলি বিষয়ে বিবেকানন্দ কিছুই উল্লেখ করেন নি। রামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যদের সম্পর্কেও সেই একই কথা; তাঁদের রচিত স্মৃতিচারণের কোথাও নিজেদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার নামমাত্র কোনো রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যায় না। এইজন্যে তাঁদের জীবন সম্পর্কে কিছু লিখতে যাওয়া ভারি মুশকিলের ব্যাপার, কৃত্য হিসেবে নীরসও বলা চলে।

সে যাই হোক, এই সাধুদের জীবনের টুকরো-টাকরা যে-তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোকে সম্বল করে না হয় আলোচনা করা যাক। একটা কথা পাঠকদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে: সমস্ত জগৎ-সংসারের প্রতি রামকৃষ্ণের অশেষ দয়া ও করুণা যেমন ছিল, তেমনি কঠোর ছিলেন তিনি শিষ্যবাছাইয়ের বেলা।

যাদের বাছাই করা হয়েছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ে-পড়া তরুণ সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণ তাদের। প্রায় সকলেই একটা-না-একটা বিদেশি ভাষা জানে, আর সংস্কৃত-জ্ঞানও প্রায় সকলেরই। একবার

রামকৃষ্ণকে জিগ্যেস করা হয়েছিল : কেন তিনি দেখেশুনে অল্প বয়সের এই মেধাবী রত্নদের নির্বাচন করেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন : "কি জানো, এরা এখনো কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়নি। এরা সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত। চরিত্রবান। আর তাছাড়া আমিই যে চেলা বাছাই করি তাই বা ভাবছ কেনে ? মা ভবতারিণীই তো তাদের আমার কাছে নিয়ে আসেন। মা-ই তাদের টানেন। মা যাদের আনেন আমি কেবল তাদের পথ দেখাই। এই যে ছোকরাদের কোন দিকে রুচি, কিসে তাদের অরুচি, কী তাদের গোপন অভ্যাস এ-নিয়ে আঁতিপাতি করে বেড়াই, আসলে এসব মা করান বলেই হয়। রাত্রে যখন এরা ঘুমিয়ে পড়ে, আমি মাকে ডাকি। অমনি চারদিকের মায়ার পুরু পর্দাটা খসে যায়। সর্বজ্ঞা মা জগজ্জননী এদের প্রত্যেকের ভেতরের সারবস্তুটি দেখিয়ে দেন। কেবল তাই নয়, প্রত্যেক দিন কে কতটা এগোল, কতটা উন্নতি করল, তা-ও। কাঁচের বাইরে থেকে যেমন কাঁচের ভেতরের বস্তুটিকে স্পষ্ট দেখা যায় অথচ ধরা-ছোঁয়া যায় না, তেমনি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখলে স্ত্রী-পুরুষ সকলের মধ্যে সেই একই আত্মস্বরূপকে দেখা যায়, অথচ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এইভাবে দীক্ষা দেবার আগে চেলাদের আমি ভালোভাবে বুঝে নিই।"

একটা ঘটনার কথা বলি। তাঁর উত্তরসূরী শিষ্যদের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি যে কতদূর ওয়াকিবহাল ও সচেতন থাকতেন, ঘটনাটি তারই প্রমাণ। ঘটনাটির সাক্ষী সারদানন্দ ও আরো কয়েকজন ভক্তশিষ্য। একদিন গভীর নিশীথে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঘুমিয়ে আছেন, পঞ্চবটীর জঙ্গলে ধ্যান করবার জন্যে চুপিচুপি চলে এলেন বিবেকানন্দ, কালী তপস্বী, সারদানন্দ ও আরো দু'জন। ধ্যান শুরু হবার আগে বিবেকানন্দ কালী তপস্বীকে বললেন, "ঠাকুর আমাকে ধ্যানের একটা নতুন পদ্ধতি শিখিয়েছেন। ঐভাবে যখন ধ্যান করব তুই তোর হাতখানা আমার কাঁধে ছুঁয়ে রাখবি।"

এর পর হলো কী, ধ্যান শুরু হবার প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই কালী তপস্বীর হাতখানা থরথর করে কাঁপতে লাগল। দমকা হাওয়ায় একগাছা দড়ি যেমন কাঁপে, সেই রকম। তারপর ধ্যান শেষ হবার পর বিবেকানন্দকে সবাই বললো: "ভাখো, ধ্যানের সময় তোমার গায়ে যারই হাত লেগেছে অমনি ইলেকট্রিক ব্যাটারির মতো তার তীব্র অনুভূতি হয়েছে।"

ধ্যানশেষে ফিরে এলেন তাঁরা। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্ধকার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি ডাকছেন। ওঁরা প্রদীপ জেলে তাঁর কাছে গেলেন। বিবেকানন্দকে বললেন রামকৃষ্ণ : "গাছে না-উঠতেই এক কাঁদি। আরে বাপু, গর্ভের সন্তানের মতো অন্তরের ঐশী শক্তির বিকাশ হয় ধীরে-ধীরে। সময় হলে তার প্রকাশ হয় আপনিই। আর তুই কিনা তাকে

এখুনি নামাতে চাইছিস। আরে মূর্খ, তোর সব ব্যাপার যে আমি জানি, আমার হাতে যে চাবিকাঠি, কবে জানবি সে-কথা? আমাকে জিগেস না-করে কিছু করবি নি।"

কিন্তু রামকৃষ্ণের শিষ্য-নির্বাচন ও তাদের সাধন বিষয়ে শিক্ষার প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। কেবল যে তিনি তাদের ভালোমতো পরীক্ষা করে গ্রহণ করতেন তাই নয়, তাদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের উপর নজর রাখতেন। যারা গৃহী এবং যারা আগ্রহী ও বন্ধনহীন, সাধনশিক্ষাদানের ব্যাপারে সবাইকে তিনি নিতেন, কিন্তু অন্যের সেবার জন্যে যে সকলেরই কৃতা আছে এইটে পড়িয়ে নিতেন সবাইকে। "কারণ" তিনি বলতেন—"তোরা সাধু হবি বলে সংসারের আর-পাঁচজন অভাব-অনটনে ভুগবে, সে তো হতে পারে না।" এবং বাপ-মা-স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণের ভার যার উপর তাকে—বাপ-মার বিনা অনুমতিতে-দীক্ষা দিতেন না। এখনো মঠে এই নিয়ম চালু আছে। পরিবারের লোকেরা যাকে স্বেচ্ছায় সংসার-ত্যাগ করতে দেয়নি এমন ব্যক্তিকে তাঁরা সন্ন্যাসজীবনে গ্রহণ করেন না; কারণ তাদের মতে সংসারের দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়িয়ে যায় যে-ব্যক্তি সে তো ভীরু, ঈশ্বর-অনুসন্ধানের আরো কঠিন ও ভয়ংকর দায়দায়িত্ব সে পালন করবে কী করে।

প্রসঙ্গটি আরো বিশদরূপে জানা যায় রামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের ব্যাপারে। গুরু মহারাজের সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার তখন কতই বা তাঁর বয়স, কুড়ি-বাইশ বছরের ছোকরা। অত অল্প বয়সেই দেখা গেল জীবনের যে-কোনো প্রধান ক্ষেত্রে উন্নতি করার মতো ক্ষমতা ও অসাধারণত্ব আছে তাঁর। ঠিক এই সময়ে একদিন তাঁর কলেজের কৌতূহলী সহপাঠীরা দক্ষিণেশ্বরের সাধুকে দর্শন করতে তাদের সঙ্গী হবার জন্যে তাকে চাপ দিল। "আমি কীরকম দেখতে এসেছিল সে।" অনেকদিন পর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন—"এখানকার (মানে, রামকৃষ্ণের) বিষয়ে অনেক অদ্ভুত কথা সে শুনে থাকবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত ঈশ্বর বিষয়ে খামকা বকবক করা একটা মর্কটকে না-দেখে আমার মধ্যে আমার আসল সত্তাটিকে সে দেখে ফেলেছিল। তারপর সে আবার এলো একা। কিছুদিন পর সে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে খুঁটিতে বাঁধা ভেড়ার মতো এখানে এসে রইল। পরে তাঁর লোকজনেরা এসে উপস্থিত। এখানে কী ধরনের লোকেদের সঙ্গে সে থাকে সেটা জানাই তাদের উদ্দেশ্য। আমাকে দেখে তারা খুশি হলো। কিন্তু ছেলেটা সন্ন্যিসী হয়ে যাক এটা তারা চায় না, কারণ তাদের ইচ্ছে ওকে বিয়ে দিয়ে সংসারে বহাল করবে। আমাকে কত প্রশ্ন করল তারা। একটু উদ্বেগ হলো। কিন্তু ছেলেটার ভেতরটা তো আমি দেখে নিয়েছিলুম, তাই যে-মেয়েকে ওরা বিয়ের জন্যে ঠিক করেছিল তাকে একটু দেখতে চাইলুম। একদিন ওরা আমার ঐ ক্ষুদে মা-কে নিয়ে এলো।

এক পলক দেখেই আমি নিশ্চিন্ত হলুম। মেয়েটি বিদ্যার থাক্, ছেলেটার ঈশ্বরলাভের পথে বাধা হবে না। কাকে সে বিয়ে করবে, কেমন ছেলে সে, বললুম তাকে। মনে হলো সে সব জানে। একটা শব্দ উঠেই যেমন মহাকাশে মিলিয়ে যায়, তেমনি করে নিমেষের মধ্যে আমার সব সংশয় দূর হলো। তারপর কিছুদিনের মধ্যে ব্রহ্মানন্দর বিয়ে হলো। এখন ওর দিকে তাকিয়ে ছাখো তো কী শুদ্ধাত্মা, কী পূত চরিত্র! ওর স্ত্রী কখনো দাবি করে না। টানে না। সাধু হবার পথে কোনো বাধা দেয়নি কখনো। তার নিজেরও ঈশ্বর-উপলব্ধি হয়েছে।"

ব্রহ্মানন্দর পর আরো পাঁচজন যুবক রামকৃষ্ণের শিষ্য হন। তার মধ্যে চারজন এখনো জীবিত। পঞ্চম ব্যক্তি বিবেকানন্দ। বিশাল সমুদ্রের জলরাশির স্বাদ কেমন তা আমরা এক ফোঁটা জিভে ফেললেই জানতে পাই। তেমনি কিভাবে রামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের তৈরি করেছিলেন সেটা বিবেকানন্দ ব্যাপারেই আঁচ করা যায়। রামকৃষ্ণের শিষ্যবর্গের অন্যতম বিবেকানন্দ, ইয়োরোপ ও আমেরিকায় নেহাৎ অপরিচিত নন।

ছেলেবেলা থেকেই বিবেকানন্দ নানান বিষয় জ্ঞানীগুণী, তুখোড় ও সাহসী। ক্ষত্রিয় বংশের ছেলে, মানুষ হয়েছিলেন এমন এক সংসারে যেখানে পূজা-আচ্চা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন কট্টর গোঁড়া। তাঁর বাপ ঠাকুর্দা শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতেন। এইসব প্রথা পথের বাইরে ধর্ম বিষয়ে কোনো চরমপন্থা তাঁর রক্তে ছিল না। কোনো বিরুদ্ধ মতও না। কিন্তু হায়, এই বিবেকানন্দর মধ্যে পনেরো-ষোল বছরে অজ্ঞেয়-বাদের প্রতি প্রবল টান এলো। তিনি প্রাচীন নাস্তিক মুনি চার্বাককে বিশ্বাস করলেন : ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই ; ঈশ্বর শুধু পুরোহিতদের কল্পনাপ্রসূত।" তারপর চার্বাক-মতবাদের পর তিনি আরো অগ্রসর হলেন, গ্রহণ করলেন কণাদের বৈশেষিক দর্শন। আরো পরে কপিলের সাংখ্যদর্শনে এসে তাঁর এই ধারণা বদ্ধ-মূল হলো যে, কঠোর সংযম ও নৈতিক জীবনযাপনের প্রয়োজন থাকলেও ঈশ্বরে বিশ্বাসের কোনো প্রয়োজন নেই।

যে-ক্ষত্রিয় বংশে তাঁর জন্ম সেই ক্ষত্রিয়রা প্রাচীনকালে ছিলেন যোদ্ধা। অজ্ঞেয়-তত্ত্বে প্রত্যয়ের পর বিবেকানন্দ ঠিক করলেন এই হাতিয়ার নিয়ে তিনি লড়াই করবেন। কিন্তু লড়াইয়ে জিততে গেলে সমভাবাপন্ন কিছু সঙ্গী সাথী চাই। তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু সমাজে সে-রকম কোনো সুযোগ পাওয়া গেল না। তিনি দমলেন না, সটান গিয়ে কেশব সেনের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। সমাজ সংস্কারের প্রতি কেশবের ছিল অদম্য উৎসাহ, সে-উৎসাহের অংশীদার হলেন বিবেকানন্দ। এইভাবে কুড়িতে পা দেবার আগেই তিনি নিরাকারবাদী ও কট্টর পিউরিটান হিসেবে সম্যক পরিচিত হয়ে গেলেন। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সকলেরই

দৃঢ় মত এই যে, এই সময়ে বিবেকানন্দ সত্য ও নীতিনিষ্ঠা ছাড়া কোনো কিছুকে আমল দিতেন না। ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত সমাজের ভাণভণিতাকে অহেতুক আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করা ছিল তাঁর বিশেষ আনন্দের বিষয়। নিরীশ্বরবাদের প্রবল বিক্রমে তথাকথিত ধর্মপুত্তলিকায় সজ্জিত মনোরম বিপণি তিনি ভেঙে চুরমার করে নিতেন।

একদিন কেশব সেনের সঙ্গে বিবেকানন্দ এলেন দক্ষিণেশ্বরে। এই সময়কার প্রত্যক্ষদর্শী পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিলেন এইভাবে—

"এই সময়টায় বিবেকানন্দ ও আমি একসঙ্গে আইন বিষয়ে পড়াশুনো করতাম। একদিন কেশব ও অন্যান্যদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জন্যে সে আমাকে আমন্ত্রণ জানাল। অবশ্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি রকম সাধু সেটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার প্রবল আগ্রহ আমারও ছিল।

"কালীমন্দিরে পৌঁছে আমরা এক অদ্ভুত লোককে দেখলুম; তাঁর চোখ দুটি বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ। অনেক দূর থেকে এ-চোখ তোমার ভেতরের সার অসার সবকিছুকে মুহূর্তের মধ্যে দেখে ফেলতে পারে। সাক্ষাৎকারের কেবল এই বিষয়টা আমার মনে পড়ে। আমরা বিদায় নেব, তৎপূর্বে প্রভু বললেন: 'কেশব, তুমি অনেক লেকচার দিতে পারো বটে, কিন্তু তোমার যশ তো বেশিদূর পৌঁছবে না। আর এই ছেলেটি'—তিনি বিবেকানন্দকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—'এ যে দেখছি দেশ ছড়িয়ে, সাগর পেরিয়ে বিখ্যাত হবে।' রামকৃষ্ণের এই কথায় উপস্থিত সকলেই শব্দ করে হেসে উঠলেন। আমরা ভাবলুম, যে-নাম ও ঐশ্বর্য কেশবের আছে তিনি বুঝি তাই নিয়ে রগড় করছেন। কিন্তু তারপর প্রায় বছর দশেক পর ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় বিবেকানন্দের বক্তৃতার বিস্তৃত বিবরণ যখন কাগজে দেখলুম, তখন সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনে ঠাকুর বিবেকানন্দকে যা বলেছিলেন প্রায়ই তা আমার মনে হতো।"

সাক্ষাৎকারের সময় রামকৃষ্ণের ঐ ভবিষ্যদ্বাণীতে বিবেকানন্দ খুশি তো হলেনই না, বরং রেগে গেলেন। কারণ, ঐ সময়টায় বিবেকানন্দর মনে হলো এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী নিতান্তই অনধিকারচর্চা ও বুজরুকি। জ্যোতিষী করকোষ্ঠি-বিচারক বা ভবিষ্যৎবক্তা—এইসব সম্প্রদায়কে তিনি ঘৃণা করতেন। সে যাই হোক, এই সন্তের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছিল্যের ভাব মনে পোষণ করা সত্ত্বেও দিনের পিঠে দিন যত এগোল, তাঁর প্রতি ক্রমশ প্রবল টান অনুভব করলেন বিবেকানন্দ। তাঁর অন্তরের কী যেন নিয়ত তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত একগুঁয়ে মনটাকে খোঁচা দেয়, তাঁকে ঠেলে দেয় দক্ষিণেশ্বরের পথে। আচ্ছা, রামকৃষ্ণ লোকটা কি রকম একবার বুঝে নিতে হবে—অবশেষে এ-রকম তীব্র বাসনার বশবর্তী হয়ে তিনি দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পথে নিজের সঙ্গে নিজের তর্ক হলো

অনেক : 'ঈশ্বর বিষয়ে যে কিছুই জানে না এমন একটা মূর্খের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি কেন ?''' আমি তো জানি ঈশ্বর বলে কিছুই নেই। তবু, তবু যাচ্ছি ?' এই রকম সারা পথ।

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দেখেন, রামকৃষ্ণ তাঁর ছোট খাটটিতে একা বসে আছেন। বিবেকানন্দ স্বস্তি বোধ করলেন। 'যাক, ভিড় নেই। সকলের সামনে ভবিষ্যদ্বাণীর বুজরুকি দিয়ে আমাকে আর অপদস্থ করতে পারবে না।' ভাবলেন তিনি।

এই কথা ভাবতে না ভাবতেই নূতন বিরক্তিকর ভাষণ শুরু হলো। রামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন: "আয়, আয়। বড খুশি হয়েছি তুই এসেছিস। আমি যে তোর জন্যে বহুকাল ধরে বসে আছি।"

চোখে-মুখে হিমশীতল ধৃষ্টতা ও তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে বিবেকানন্দ গিয়ে খাটের এক কোণে বসলেন। কিছুক্ষণ কারো মুখেই কোনো কথা নেই। যেন উভয়ে উভয়কে ভালো করে বুঝে নিতে চাইছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে কিঞ্চিৎ প্রৌঢ় মনে হলো, বয়সের তুলনায় প্রৌঢ়তর। আর তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট যুবকের মুখমণ্ডল যেন ব্রোঞ্জের তৈরি তরুণ বুদ্ধের মতো কঠিন ও ভাবলেশহীন।

পরস্পর পরস্পরকে খুঁটিয়ে দেখছেন। দৃপ্ত যৌবনের বর্ম-আঁটা বিবেকানন্দ, আর অন্যদিকে রিক্ত নিঃস্ব সর্বত্যাগী অথচ অদৃশ্য ঈশ্বরীয় শক্তিতে ভাস্বর রামকৃষ্ণ। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, রমাকৃষ্ণ ডান পা তুলে সটান বিবেকানন্দর গায়ে ঠেকিয়ে দিলেন। অমনি এক আশ্চর্য ঘটনা ...

"সেই মুহূর্তে"—বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন বিবেকানন্দ—"সেই মুহূর্তে আমার সুমুখের দেয়ালগুলি টাল খেতে খেতে ভেঙে গেল; কাঠের আসবাবগুলি কী এক অদম্য শক্তির প্রভাবে মেঝের উপর আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। তারপর আর কিছু নেই। চারদিকে শুধু বিশাল শূন্যতা। হঠাৎ দেখি প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হাঁ করে আমাকে গিলতে এসেছে। তখন ভাবলুম: হায়, হায়, অহং গেলে তো মৃত্যু! আর মৃত্যু আমার এত কাছে যে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায়। আমি ভয়ে আঁতকে উঠলুম, চেঁচিয়ে বললুম: 'তুমি এ কী করলে? বাঁচাও, বাঁচাও, আমার যে বাপ মা আছে গো।' আমার এই কথায় উন্মাদ অট্টহাস্য করে উঠলেন। তারপর আমার বুকে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন: 'থাক, আজ এই অব্দি থাক। এর বেশি দরকার নেই এখন। পরে জানা যাবে।' উন্মাদের এই কথার সঙ্গে সঙ্গে, কী আশ্চর্য, আবার সব ঠিক হয়ে গেল। দেয়াল আসবাবপত্র, ঘরের যাবতীয় জিনিস এবং আমি—সব আবার যেমন-কে-তেমন, যে-কে-সে।

"ঐ দিন ঐ ঘটনার পর আমি ভাবতে লাগলুম, হয়তো আমার ওপর কোনো সম্মোহন বিদ্যা প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতায় সম্মোহনের কোনো প্রতিক্রিয়া ও মিল না-থাকায় আমি ব্যাপারটি নিয়ে বেশ

ফাঁপরে পড়লুম। বিচার করে-করে এর কিনারা করা গেল না। তখন ভাবলুম, আমাদের অন্তরে-বাইরে নিশ্চয়ই এমন কোনো রহস্য লুকোনো আছে, বুদ্ধি যার নাগাল পায় না। রামকৃষ্ণ যে নিতান্ত উন্মাদ নন আমার অভিজ্ঞতাই আমায় তা বলে দিলে। আর যাই হোক, কোনো উন্মাদ ব্যক্তি কারো ইন্দ্রিয়-সমূহ ও বুদ্ধিকে ধূলিসাৎ করতে পারে না। ব্যাপারটির চুলচেরা বিচার করতে করতে সমস্ত দিনটা কাটল তাঁর সঙ্গে। একবার আশা হলো যদি বিষয়টা তিনি সবিশদ পরিষ্কার করে দেন। ভাবতে ভাবতে সূর্য ডুবল। আমাকে আবার বাড়ি ফিরতে হবে। তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়ালুম। কিন্তু তিনি নাছোড়, খুব শিগগির তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করব এই প্রতিশ্রুতি না-দিলে তো তিনি ছাড়বেন না।"

এরপর অবশ্য অন্তরে তীব্র আকাংক্ষা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে তাড়াহুড়ো করলেন না। ঐ দিনের ঐ অভাবনীয় অভিজ্ঞতাটি নিয়ে অনুশীলন করতে করতেই তাঁর অনেকদিন কেটে গেল। ঘটনাটি যেমন আকর্ষণীয় তেমনি ভয়-জাগানো।

কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেকানন্দ ঘটনাটির বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন, তার চেয়েও বড় কথা তিনি এর কোনো সন্তোষজনক মীমাংসা খুঁজে পেলেন না। তাঁর হতবুদ্ধি অবস্থা চরমে পৌঁছল যখন তিনি আপন অন্তরে এক নির্দেশ পেলেন : 'যাও, যাও, তাঁর কাছে যাও। কেবল তিনিই পারেন এর মীমাংসা করতে।' যতই দিন যেতে লাগল, অন্তরের আর্তি প্রবলতর হলো। এমন হলো যে কিছুতেই আর তা থামে না, থামানো যায় না। অবশেষে অন্তরের অনিবার তাগিদে তিনি, সমুদ্রগামী নদীর মতো, পুনরায় গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করলেন।

এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলছেন : "তাঁর সঙ্গে আমার এই তৃতীয় সাক্ষাৎকারটি সবচেয়ে চমকপ্রদ। আমি গিয়ে দেখলুম তিনি বাগানে পায়চারি করছেন। আমাকেও তাঁর সঙ্গে পায়চারি করতে বললেন। বাগান থেকে ঘুরতে ঘুরতে আমরা গঙ্গার ধারে গিয়ে পড়লুম। সেখান থেকে বেড়াতে বেড়াতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের অন্দরে। তিনি তাঁর ছোট খাটটিতে গিয়ে বসলেন, পূর্বের মতো আমিও তাঁর পাশে। ঠিক তক্ষুনি তিনি আমাকে স্পর্শ করলেন। আর তারপর…"

বিবেকানন্দ তাঁর এই শেষের অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে কিছু ভাঙেন নি। কী সে অভিজ্ঞতা? বাস্তবিক কি ঘটেছিল? হয়তো এমন কিছু যার তাৎপর্য ও গুরুত্ব তাঁর কাছে অপরিসীম, হয়তো এমন কিছু যা অন্তত বিবেকানন্দ প্রকাশ করতে পারেন না, পাছে প্রকাশের দ্বারা তার পবিত্রতার হানি হয়। কে জানে!' কিন্তু বহু বছর পর ব্রহ্মানন্দ, শ্রীমা এবং সারদানন্দ—এই তিনজন—এ-বিষয়ে

রামকৃষ্ণকে জিগ্যেস করেছিলেন। তিনি তখন বিশদ করে খুলে বললেন: "ওর এই অনিত্য কাঁচা-আমিটা যখন বেহুঁশ হয়ে পড়ল, ওর নিজের বিষয়ে আমি অনেক প্রশ্ন করলুম। বিশেষ করে ওর সব উপলব্ধির পূর্ণ বিবরণ। ও কেন এসেছে পৃথিবীতে? বেহুঁশ অবস্থায় ও যা বললে তাতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি নিশ্চিন্ত হলুম। আমি ধ্যানে যেসব কথা জেনেছিলুম সবই মিলে গেল। ওর অন্তর্মুখ থেকে মিলিয়ে নেয়াটা ভালোই হলো। তাছাড়া আমি বুঝে নিলুম, ও আপনাকে জানতে পারলে, ওর ঘর জানতে পারলে আর দেহ রাখবে না। নিত্যসিদ্ধ, শুদ্ধাত্মা।"

প্রায় উনিশ বছর পর বেলুড়মঠে একাদিক্রমে তিনদিন গভীর সমাধিতে থেকে বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের সতেরো বছর পর বিবেকানন্দ চলে গেলেন। যে-ঘরে বিবেকানন্দ ধ্যান করতেন আমি তা দেখেছি; সে-সময়ে যাঁরা তাঁর ওপর নজর রাখতেন আমি তাঁদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ করেছি। বহু বছর আগে বয়স্ক সন্ন্যাসীদের বিষয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যা বলেছিলেন আমাকে তাঁরা তা বললেন।

সর্বশেষ অভিজ্ঞতার পর বিবেকানন্দ গুরুর প্রতি ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হলেন এবং ধ্যানাভ্যাস ও অন্যান্য সাধনকর্মে শিক্ষালাভ করতে লাগলেন। তখনো তিনি সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। বারংবার তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছেন: "আমার সংসারের লোকগুলো যাতে খেতে-পরতে পায় মাকে একটু বলুন না। আমি তাহলে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি।" উত্তরে রামকৃষ্ণ বললেন: "আমি ওসব বলতে-টলতে পারব না। যা না, তুই গিয়ে বল্ না।"

ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যে-বিবরণ দিচ্ছেন তা থেকেই বিবেকানন্দর দ্বিধাদ্বন্দ্বের কিছু কিনারা পাওয়া যায়। "এই সময়টায় আমরা দু'জন একই আইনজীবীর আপিসে কাজ করতাম। দেখা গেল, যখন-তখন বিবেকানন্দ আপিস থেকে উধাও। মাঝে মাঝে মালিক আমাকে পাঠাতেন আপিস-পলাতককে ধরে নিয়ে আসতে। আমি চলে যেতাম ঠাকুর রামকৃষ্ণের ডেরায়, কিংবা এমন সব জায়গায় যেখানে বিবেকানন্দর গতায়াত আছে। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেতাম না তাকে। অবশেষে একদিন তাকে জিগ্যেস করে বসলুম, কি করছে, কি নিয়ে আছে সে। সে কোনো জবাব দিলে না। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের মতো ঈশ্বর-অনুসন্ধানের কার্যাবলী একদিন কোনো-না-কোনোভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। একদিন আইন-আপিসের পর বাড়ি ফিরছি শহরের অন্য পথ দিয়ে হেঁটে। শহরের এদিকটা ভয়ংকর নোংরা ও ঘিঞ্জি, আমাদের জাতের কেউ স্বেচ্ছায় এ-পথ মাড়ায় না। এখানকার লোক-গুলোর শোচনীয় দারিদ্র্যের চেহারা চোখে পড়ে। আমি এইসব দেখতে-

দেখতে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি গেরুয়া-পরা একটি লোক একটা নোংরা বস্তির দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করা যায় না! এই গরিবস্য গরিব লোকগুলো কাউকে ভিক্ষা দেয় কি করে? আর এই ভিখিরিই বা কি রকম যে এদের কাছে ভিক্ষা নিতে যায়? একটু কাছে গিয়ে দেখলুম, সন্ন্যাসীকে একমুঠো চাল ভিক্ষা দিয়েছে এক দরিদ্র ও বৃদ্ধ মহিলা, সন্ন্যাসী তাকে আশীর্বাদ করছেন। সন্ন্যাসী ফিরতেই আমি তাঁর মুখ দেখলুম। এ যে বিবেকানন্দ! মুখোমুখি হতেই সে আমাকে তার পেছন-পেছন আসতে বললে। চটপট বেরিয়ে এসে আমরা গঙ্গার ধারে গেলুম। ঘাটের উপরের পৈঠায় বসলুম। বিবেকানন্দ বললে: 'এই যে গেরুয়া পরে আছি দেখছ, তার মানেটা তো পরিষ্কার। আমি সন্ন্যাসী হতে চাই। রামকৃষ্ণ টানছেন আমাকে; যদি কাল থেকেই তাঁর সন্ন্যাস-জীবনে ঢুকতে পারি, সে তো আমার স্বর্গ। কিন্তু এখনো আমি নিশ্চিত নই। মনের এই সংশয় ও দুর্বল অবস্থা নিয়ে তাঁর কাছে আপনাকে সমর্পণ করি কী করে। সন্ন্যাসী হওয়া তো সহজ কথা নয়। তুমি তো আমার ঘরের লোকদের চেনো, ধন গৌরব ও জাতপাতের গর্বের কথাও জানো। এখন আমরা গরিব হলেও বিশ বছর আগে আমাদের অবস্থা ছিল অন্যরকম। আমাদের দিয়ে ভবিষ্যতের কত আশা। আমিও খুব গর্ববোধ করি। এই গর্বই আমার পথের কাঁটা। এক সময় আমার বাবা ছিলেন ধনী ও প্রতিপত্তিশালী। তাঁরই ছেলে আমি, আমার পক্ষে কি সন্ন্যাসীর সহজ-দীনতা সম্ভব? আমার পারিবারিক গর্ব লুটিয়ে দিয়ে আমি কি ভিক্ষুকের জীবন যাপন করতে পারি? এইসব বুঝে নেবার জন্যেই আমার এই গেরুয়াবেশ আর ঐ নোংরা বস্তিতে ভিক্ষা করা। বাইরে থেকে দেখতে গেলে এতে আমার লাভ সামান্যই, কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক থেকে অসামান্য; এতে সহজেই আমার মনের গর্ব ও অহংকার নাশ হয়। নিজেকে এখন বেশ নম্র বোধ হয়। মনে হয় সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে আমার গুরুর যোগ্য শিষ্য হতে পারব।

'আরেকটা জিনিস দেখেছি। এক নাগাড়ে কয়েকদিন ধরে আমি কিছু না-খেয়ে থাকতে পারি। এটা আমার মনে সাহস আনে। সকল গর্ব ও অহংকার থেকে আমার মন যে মুক্ত থাকে কেবল তা-ই নয়, আমার শরীরও অনাহার সহ্য করতে পারে। ভাবছি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে এবার আমাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিতে বলব। ধ্যান আমার অধিগত, যোগের সকল কৃচ্ছ্রসাধনেও আমি সমর্থ। কিন্তু তবু, নিজের সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় না-হওয়া পর্যন্ত, চরম দীক্ষার (সন্ন্যাসদীক্ষার) কথা বলতে আমার সাহস হয় না।'

আত্মসংশয় ও দুর্বলতা জয় করলেন তিনি। তবু পারিবারিক খাওয়া-পরার সমস্যায় জর্জরিত হলেন। রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর এই নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে, কিন্তু তাঁরা কেউই ভবতারিণী মা-র কাছে এই নিয়ে প্রার্থনা করেন

নি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পরিবারের খাওয়া-পরার সমস্যা নিয়ে তাঁরা ঈশ্বরের দরবারে যেতে রাজি নন। এখানেও বিবেকানন্দের গর্ব তাঁর পথের অন্তরায়: তিনি মানুষের কাছে ভিক্ষা করতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে পারেন না।

একদিন ঘরে তাঁর গর্ভধারিণীর সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর আলোচনা হলো। তাঁর মা প্রাচীন রক্ষণশীল বনেদি রমণী। নিয়ম-নিষ্ঠা ও কঠোর কৃচ্ছ্রতায় লালিত। তিনি ছেলেকে বললেন: "আমাদের ঘরে কে কবে দারিদ্র্যের জন্যে ভগবানকে ত্যাগ করেছেন? তোমার ঠাকুর্দার কথা তো জানি। যে-মুহূর্তে অন্তরে ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ করলেন, সেই মুহূর্তে তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ধন-সম্পদ সব ত্যাগ করে চলে গেলেন। তোর জন্মের বহু আগে আমি ভগবানকে প্রার্থনা করেছিলুম: আমাকে একটি ধার্মিক ছেলে দিও। এখন তোর জীবনে যখন তাঁর আবির্ভাব অনুভব করছিস, তুই তাঁকে তাড়িয়ে দিবি! তোর বাপ-ঠাকুর্দা তো সে-রকম করতেন না। আমার খাওয়া-পরার কষ্ট নিয়ে ভয়? আমার কষ্ট আমার থাক। তোর তাতে কী?'

মাকে প্রণাম করলেন বিবেকানন্দ। তারপর দক্ষিণেশ্বরের পথ ধরলেন। গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে সকল ঝঞ্ঝাট শেষ করবেন—এই সংকল্প। কিন্তু পথে যেতে যেতে আবার সেই চিন্তা, সংসারের অন্নকষ্টের ভাবনা। 'সংসারে যারা আমার ওপর নির্ভরশীল আমাকে তো তাদের খাওয়া-পরার সমস্যা মেটাতে হবে। আমার পূর্বপুরুষরা এসব নিয়ে ভাবতেন না। তাঁরা সাহসী ছিলেন। ভালোই। কিন্তু আমি তো আমার পূর্বপুরুষ নই। আমি আমিই। পরিবারের অন্নবস্ত্রের কষ্ট দূর হবে, যতক্ষণ না ঠাকুর রামকৃষ্ণ একথা বললেন, ঈশ্বরে আমার দরকার নেই।' সারা পথ ধরে এই রকম স্বগতোক্তি চলতে লাগল। ওদিকে গুরুর কাছ থেকে পূর্ণ জ্ঞান ও পরম ঈশ্বর-উপলব্ধি প্রাপ্তির উদগ্র বাসনা। এ-বাসনা ক্রমশ যেমন উদগ্র তেমনি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। সুতরাং গুরুর কাছে যখন পৌঁছলেন তখন তিনি সংকল্পে অটল অন্য এক মানুষ।

রামকৃষ্ণ বোধহয় এসব বিষয় আগেই টের পেয়েছিলেন। মধুরস্বরে বললেন: "ভাখ রে, আমরা যা পারিনে, ঈশ্বর তা পারেন। তিনি আমাদের সকলের চেয়ে শক্তিমান। কোন চিন্তা তোকে ব্যস্ত করেছে?"

বিবেকানন্দ আবেগের সঙ্গে বললেন: "প্রভু, আমি সংসার ত্যাগ করবই। কিন্তু যারা খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে, যাদের জন্যে আমার দায়দায়িত্ব, তাদের অন্নবস্ত্রের সমস্যা থাকবে না গ্যারান্টি চাই। আপনি একবার মা-কে বলুন না?"

রামকৃষ্ণ বললেন: "এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমি মাকে ব্যস্ত করব না। তবে আমি বলছি, তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।' গুরুর এই আশীর্বাদ বাক্যে বিবেকানন্দর সন্ন্যাসদীক্ষার পথে শেষ কাঁটাটি দূর হলো।

দীক্ষার পর এখন তাঁর নামকরণ হলো বিবেকানন্দ।* বাপ-মার দেওয়া তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম নরেন্দ্র। দীক্ষার পর শিষ্যদের যে-নামকরণ হয় সেগুলো ইচ্ছা-খুশি যেমন-তেমন হলে চলে না। যাঁরা গুরু তাঁরা এই নামগুলো ধ্যানের মধ্যে পান। বিবেকানন্দ মানে বিবেক-বৈরাগ্যে যার আনন্দ। এই নাম তাঁকে কেন দেয়া হলো? যৌবনে ছিল অন্যের প্রতি তাঁর দয়া। রামকৃষ্ণের কাছ থেকে যে-উপকার ও বিমলানন্দ পেয়েছিলেন তিনি, অন্যেরাও তা পাক এই মঙ্গলাকাংক্ষা তাঁর বরাবর ছিল। ঠাকুরের কাছে সব রকমের লোককে ঠেলে নিয়ে আসতেন এবং ঠাকুরকে ঠ্যালা দিতেন যেন তিনি ঈশ্বর-দর্শনের সুখকর ভাবনা এদের মধ্যে বিতরণ করেন। নীরবে এই উৎপাত সহ্য করতেন রামকৃষ্ণ। কাতরভাবে বলতেন: "কী যে বলিস? এই উটকো লোকগুলোর মধ্যে ঈশ্বর ভাবনাই নেই। তা তোর বিবেক-বুদ্ধি একটু খাটা না!" কোনো সন্দেহ নেই বিবেকানন্দ ছিলেন প্রভূত পরিমাণে বিবেকবুদ্ধিমান। কেবল প্রয়োজন ছিল তাঁর অন্তরকে ভাবপ্রবণতা থেকে মুক্ত রাখা। তাঁর অন্তরটি বরাবরই ছিল কোমল, দীক্ষার পূর্বে পাঁচ-ছ বছর যখন তাঁর সাধনশিক্ষা চলছিল সেই সময় বিবেকবুদ্ধির প্রভাবে তাঁর হৃদয়টি উজ্জ্বল হলো। বিবেক যে আনন্দের সামগ্রী, দীক্ষার পর গুরুদত্ত নামের দ্বারা তা বিবেকানন্দর কাছে উদ্ঘাটিত হলো। ভাবপ্রবণতা বা ভাবালুতার বিরুদ্ধে গুরু তাঁকে শেষবারের মতো বিধান দিলেন: "তিনটে জিনিস কখনো ভুলিসনি। ঈশ্বরে রুচি রাখবি। সর্বত্র এবং সকল সময় ঈশ্বরের সব রকমের ভক্তকে নমস্কার করবি। আর ভাবালুতার বশে সবাইকে দয়া দেখাবি না। তুই শালা কীটস্য কীট, ভগবানের সৃষ্ট জীবকে দয়া করবার তুই কে? সকল জীবকে দেখবি শিবরূপে, সেবা করবি।" এই ছিল রামকৃষ্ণের মহার্ঘ অনুশাসন।

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'।

দীক্ষার পর বিবেকানন্দকে পূর্বের চেয়ে কঠোরতর কর্ম সম্পাদন করতে হয়েছিল। উচ্চতর ধ্যান ও সাধনকর্ম তিনি রপ্ত করেছিলেন—যার নিগূঢ় প্রণালীর কথা কেবল দীক্ষিতরাই জানেন। সৌভাগ্যক্রমে রাজযোগের আলোচনায় তিনি ঐসব সাধন প্রণালীর ফলাফল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আমাদের জন্যে লিখে রেখে গেছেন। 'রাজযোগ' গ্রন্থ আমেরিকায় সুপ্রসিদ্ধ।

* দীক্ষার পরই নরেন্দ্রনাথের নাম বিবেকানন্দ হলো? ঠাকুরের অন্যান্য শিষ্যের বেলাও লেখক বলেছেন, দীক্ষার পরই তাঁদের নামকরণ এই এই হলো। আকর গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে আমরা লেখকের সঙ্গে একমত হতে পারি না। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে শিষ্যরা যান আটপুরে। সেখানে হোম-যজ্ঞের পর তাঁরা নিজেদের নামকরণ করেন। বিবেকানন্দ তুরীয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দ অভেদানন্দ এইসব নাম তখন থেকেই! বিরজা হোমের পৌরোহিত্য করেন অভেদানন্দ।

রামকৃষ্ণের সাধনশিক্ষায় অপার পারদর্শিতা লাভ করার পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যোগীদের কাছে প্রব্রজ্যারূপে বিবেকানন্দ প্রেরিত হলেন। নবদীক্ষিত বিবেকানন্দ এই ভ্রমণকালে পওহারীবাবার সাক্ষাৎ লাভ করেন। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ যোগীদের মধ্যে পওহারী অন্যতম। পওহারী মানে যিনি হাওয়া খেয়ে বাঁচেন। যোগ বিষয়ে পওহারী ছিলেন অতিশয় দক্ষ। তিনি বিবেকানন্দকে মুগ্ধ করলেন। রামকৃষ্ণের কাছে যেসব যোগ শিক্ষা পেয়েছিলেন বিবেকানন্দ পওহারী, তা করে দেখালেন। গুরুদত্ত শিক্ষা অন্য দিক থেকে যাচাই হবার ফলে তাঁর গুরুর শক্তি-ক্ষমতা যে সন্দেহাতীত তার প্রমাণ পেয়ে বিবেকানন্দ, আনন্দিত।-পওহারীবাবার সঙ্গ করলেন অনেকদিন। পরিশেষে লক্ষ্য করলেন, এত ক্ষমতাসম্পন্ন যোগী হওয়া সত্ত্বেও পওহারীর দয়াভাবের বড্ডো অভাব। সংসারের দুর্বল ও দুঃস্থ শ্রেণীর লোকেদের সাহায্য করা দূরে থাক, তিনি তাদের কাছাকাছিও থাকতে চান না। কোনো মানুষের যে তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন এটা তিনি বিশ্বাসই করেন না। তিনি বলেন :"আমার কাছে কারো কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে তারা পাহাড়ের চূড়ায় আমার এই গুহায় আসবে। আমি কেন শিক্ষা দিতে ওদের ঐ হৈ-হট্টগোলে নেমে যাব ? জীবনে সিংহের বিক্রম লাভ করতে হলে জনারণ্য ছেড়ে নির্জনে গিয়ে তাদের বাস করতেই হবে।"

এই কথায় বিবেকানন্দর চোখ ফুটল। তক্ষুনি তিনি বুঝলেন যে পওহারী পূর্ণগুরু নন। রামকৃষ্ণের পরম আধ্যাত্মিক স্তর তিনি অর্জন করেন নি। এই উপলব্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তিনি পওহারীর গুহা ত্যাগ করলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে তিনি তীর্থভ্রমণের এক বছরের পূর্ণ বিবরণ দিলেন রামকৃষ্ণকে। তারপর জিগ্যেস করলেন : "পওহারীবাবা কেন তাঁর সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার পাহাড়ের গুহায় মজুত করে রাখেন ? কেন লোকশিক্ষার জন্যে আপনার মতো তিনি তা ছড়িয়ে দেন না ?"

সরল স্বভাব শিষ্যের দিকে তাকিয়ে রামকৃষ্ণদেব হাসলেন। "কেন, আমিও তো এখানে মজুত করে রেখেছি। আমি তো কোথাও উপদেশ বিলোতে যাইনে। যাই কি ?"

"না, তা যান না বটে। তবে সকলকে ঈশ্বরীয় পথে সাহায্য করতে আপনি কত ব্যগ্র। আর তাছাড়া আপনি এখানে থাকেন, সকলেই তো এখানে এসে আপনার দর্শন পায়।'

গুরু তখন বিশদ বুঝিয়ে বললেন : "ঈশ্বর জ্ঞানকে সংসারের অবিদ্যা মায়ার কলুষ স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে পরম পবিত্রতার মধ্যে রক্ষা করতে চান পওহারী। তাঁর এই পছন্দটি ভালোই। আমার তো কোনো পছন্দ অপছন্দ নেই।'

'না, এটাই শেষ কথা নয়। এর চেয়ে গভীর কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে।"

বিবেকানন্দ চেপে ধরলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ কথা বাড়ালেন না, হেসে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন।

সে যাই হোক, ভারতবর্ষ ঘুরে-বেড়িয়ে, নানা প্রান্তের নানান দিক্‌পাল সাধক-দের সংস্পর্শে এসে বিবেকানন্দ যে অভিজ্ঞতা ও পরিপক্বতা এলো সাধকজগতের পরবর্তী স্তরোন্নতিতে তা কাজে লাগল। আরো কিছু শিক্ষা দেবার পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন : "আমার কাছে কত যোগী ও কত পণ্ডিত আসেন, তাঁদের সঙ্গে এখন থেকে তর্ক-বিচারে লেগে যা। তুই যা শিখেছিস, জেনেছিস, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করে বিচারে করে সব জিনিসটা যাচাই করে নে। যে-সোনা তোর আছে তাকে তুই জ্ঞানবিচারের আগুনে পুড়িয়ে দেখবি নি?'

এরপর দিনের পর দিন যেসব সাধু-সাধক ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে আসেন তাঁদের সঙ্গে তুমুল তর্কবিচার চললো বিবেকানন্দর। সমস্ত তর্কবিচার ছিল সংস্কৃত ভাষায়। উভয়পক্ষের মধ্যে অবশ্য-পালনীয় একটি প্রধান নিয়ম ছিল এই যে, তর্কের খাতিরে কেউ কোনো উদ্‌ধৃতি দিতে চাইলে কোনো মুদ্রিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা দেখে দিতে পারবেন না ; স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করে উদ্‌ধৃতি দিতে হবে এবং তা নির্ভুল হওয়া চাই।

সফলতার পর সফলতা বিবেকানন্দকে প্রতিষ্ঠিত করল মননশীল তার্কিক রূপে। তখন একজন রামকৃষ্ণকে এইসব আজেবাজে জিনিস বন্ধ করতে অনুরোধ করলেন। ভদ্রলোক বললেন : "অন্যের ধীশক্তিকে খাটো করে আপনার শিষ্যের লাভটা কী হচ্ছে শুনি? তরুণ ছোকরা বিবেকানন্দ তর্ক পেলে তো ছাড়ে না। ক'দিনের মধ্যেই সে নির্ঘাত দাম্ভিক হবে, রাগী সাপের মতো এখানে-ওখানে ছোবল মারবে।

উত্তরে রামকৃষ্ণ বললেন : "এটা একরকম ওর মানসিক ব্যায়াম। এই ব্যায়ামের ফলে ওর মন-বুদ্ধির ইমারত মজবুত হবে। আমি যখন থাকব না তখন ওকে দূরদেশের মহা-মহা পণ্ডিতের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষায় ওর মন তৈরি হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে এটা তো আমাকে দেখতেই হবে। দম্ভ বলছ? না. না ও শুদ্ধাত্মা. এসব ওকে ছোঁবে না। ও আর কাঁচা নেই।"

এর কিছুদিন পর তিনি বিবেকানন্দকে দ্বিতীয়বার তীর্থপর্যটনে পাঠালেন। এইবার বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত চষে বেড়ালেন। এমন কোনো শহর নেই যেখানে তিনি যাননি। যেখানে-যেখানে রেলপথ আছে সেখানে গেলেন ট্রেনে। যেখানে নেই সেখানে পদব্রজে।

দ্বিতীয়বার তীর্থপর্যটনে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই রামকৃষ্ণকে কাতর প্রার্থনা জানালেন : "এখানে-ওখানে ঘুরে না-বেড়িয়ে আমি আপনার কাছা-কাছি থাকতে চাই। কারণ কেবল আপনাকেই আমি ভালোবাসি। আপনার কাছ থেকে আমি মুক্তির স্বাদ পেয়েছি, মূল্যবান যা-কিছু জেনেছি আপনার

কাছ থেকেই জেনেছি। দয়া করে আমাকে দূরে ঠেলবেন না। আপনার কাছে থেকে আমি আরো জানতে চাই।"

কিন্তু গুরুভাবে রামকৃষ্ণ অটল। দৃঢ়স্বরে বললেন: "না, তোকে যেতেই হবে। সামান্য লোকের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের অবস্থা বুঝতে হবে। কারণ ধর্মের যে-চিররহস্য তাদের রোজকার জীবনযাপনের মধ্যে লুকিয়ে আছে সেটা না-জানলে কি চলে। আমি যখন থাকব না, তখন তো তোকে দেশ-বিদেশে লক্ষ-লক্ষ লোকের কাছে কত কথাই না বলতে হবে। তখন বুঝবি এই তীর্থ করতে বেরোবার মানেটা কী। তখন তোর কণ্ঠে বিশ্ববাসী শুনবে হাজার হাজার সাধনমার্গের উপলব্ধির কথা।"

সুতরাং আবার বেরিয়ে পড়লেন বিবেকানন্দ। মুখে শিবগুণগান, হাতে ভিক্ষাপাত্র। "যারা নীচ ও অধম, যারা ব্রাত্য অথচ সাধুস্বভাব, তাদের কাছ থেকে কিছু জানবার জন্যে, শেখবার জন্যে" এবারের পর্যটন।

এবারের দেশ পর্যটনে যদিও বিবেকানন্দর নাম অজ্ঞাত থাকল (সাধুসন্তের নাম কেই বা জানতে চায়) তথাপি বহু লোকের মনে তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীর ছাপ পড়ল। "গুরুমহারাজ রামকৃষ্ণের সযত্ন লালিত সাধনমার্গের টগবগে ঘোড়াটির উপস্থিতি মানেই অনিবার্য আকর্ষণ।"

মারাঠা পণ্ডিত, সংস্কৃতজ্ঞ ও স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক স্বর্গত তিলকের সঙ্গে একবার বিবেকানন্দর দেখা ট্রেনের কামরায়। এই প্রসঙ্গে তিলক বলছেন: "ট্রেনে আমি তাঁকে দেখলুম আমার আসনের পাশেই উপবিষ্ট। অবিকল বুদ্ধদেবের মতো দেখতে। তা দেখতে যেমনই হোক, ভিখিরি সন্ন্যাসীদের প্রতি আমার অবজ্ঞা ছিল। তাই ভাবলুম, ভাববাদ নিয়ে সংস্কৃতভাষায় এই মূর্খ ও ভণ্ডটার সঙ্গে কিছু বাতচিৎ করে খানিকটা মজা করা যাক। কারণ আমি একরকম নিশ্চিত ছিলুম যে, ঐসব দর্শন-টর্শনের কথা এ-ব্যাটা জন্মে কখনো শোনেইনি, আর সংস্কৃত বিষয়ে...যাকগে, আমি শুরু করলুম। অবাক কাণ্ড, সে আমাকে জবাব দিলে দেবভাষায়! তা হোক, এতে আমার কিছু এসে যায় না, আমি তার সঙ্গে বেদান্ত নিয়ে পড়লুম। আমাদের তর্কবিচার যতই এগোল আমি ক্রমশ বিস্মিত হলুম দুটি কারণে: কী পরিচ্ছন্ন তার ধারণা, আর বলার ভঙ্গিটি কী উচ্চাঙ্গের! অবশেষে ট্রেন যখন পুণা শহরে এসে থামল, আমি তাঁকে আমার বাড়িতে এসে দিন কতক কাটিয়ে যাবার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানালুম। যদিও হপ্তা খানেক সে আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেল, আমি কখনো তার নামটিও জিগ্যেস করিনি। আর তাছাড়া, যে মানুষ সংসারের সব কিছু ত্যাগ করে চলে এসেছে, নামটামের বালাই নিয়ে তাকে কেন বিরক্ত করা? এই ঘটনার প্রায় বছর দশেক পর খবর-কাগজে দেখলুম, কোন এক বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়ে বেদান্তের উপর বক্তৃতা করেছেন,

কাগজে তার বিবরণ বেরিয়েছে। তাঁর বক্তৃতার যেসব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলো বারংবার পড়ে-পড়ে মনে-মনে বললুম: 'এ নির্ঘাত ঐ নবীন সন্ন্যাসী, কারণ তার মনের ও ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে এই বক্তৃতামালায়।' তারপর সে যখন ভারতবর্ষে ফিরে এলো, আমি গিয়ে দেখা করলুম তার সঙ্গে। হ্যাঁ, ইনিই সেই বিবেকানন্দ।"

এই নবীন সন্ন্যাসী আমেরিকায় গিয়ে কী পরিমাণ সফল হয়েছিলেন, এখন আমরা তা সকলেই জানি। বহুকাল পূর্বে এ-সবের ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছিলেন রামকৃষ্ণ। যা-কিছু মহৎ যা-কিছু শ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দর মধ্যে প্রকাশিত, তা তিনি তাঁর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁর গুরুদেবের পদতলে বসে লাভ করেছিলেন। "আমি যা বলেছি তার মধ্যে যদি ভালো মহৎ বা মৌলিকতা কিছু থাকে তো সে সব তাঁরই জন্যে। সব তাঁর, আমার কিছু নয়। তাঁকে জানবার যে সৌভাগ্য আমার হয়েছে তার জন্যে আমায় যদি কোনো দাম বা দক্ষিণা দিতে হয়, তাহলে বলি, নরক বলে যদি কিছু থাকে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভের প্রতিটি বছরের জন্যে প্রতি তিন হাজার বছর ধরে আমি সেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে রাজি আছি।"

দ্বিতীয় বারের মতো দেশ পর্যটন শেষ করে ঘরে ফিরলেন বিবেকানন্দ। তখন গুরুমহারাজ বললেন: "ঝোপ-জঙ্গল, শুখা মরু ভেদ করে অনেক কষ্ট ভোগ করেছিস, সবই তোর দেখা হলো, এখন থাক আমার কাছে। এবার আয়, দু-জনে মিলে বাদ বাকি কাজ শেষ করে ফেলি। আমার যাবার সময় হয়ে এলো।"

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যবর্গ

(দ্বিতীয় পর্যায়)

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ। তাঁর কথা অবশ্য আগেই উল্লেখ করেছি। অল্পদিন হলো তিনি বেনারসে দেহত্যাগ করেন। দেহ-ত্যাগের পূর্বে তাঁর সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর দিন যে ঘনিয়ে এসেছে, এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলে, শ্রীরামকৃষ্ণ, বেদান্ত ও যোগ সম্বন্ধে যা যা তিনি জানতেন সব উজাড় করে লোকেদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এমনিতে মানুষটা ছিলেন চুপচাপ ও স্বল্পভাষী, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি হাতে রেখে কিছু বলেন নি। তিনি বাইরে কোথাও বড়

একটা বেরোতেন না, সেইজন্যে দর্শনাকাংক্ষীরা বেনারসের মঠে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন। যেমন মঠে তেমনি পুণ্যভূমি বেনারসের সর্বত্র সকলে স্বামিজীকে ডাকতেন কেশরী বলে। মুখাবয়বে একদিকে দয়া অন্যদিকে সিংহের বিক্রম, মেদহীন,- শান্ত মুখশ্রী। যেখানেই যেতেন সেখানেই লোকেরা তাঁকে ঈশ্বরপুত্র বলে জানতেন। একদিন এক যুবক ও আমি তাঁর সঙ্গে হাঁটছি। তিনি একটু এগিয়ে, আমরা পাঁচ-ছ গজ পিছনে। এমন সময় এক কৃষক পাশ দিয়ে যেতে-যেতে ঘাড় ফিরিয়ে স্বামিজীকে দেখতে লাগল। তার এই ঘাড় ফিরিয়ে দেখা নিয়ে আমরা বলাবলি করছি লক্ষ্য করে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর জিগ্যেস করল: "আপনাদের আগে-আগে যাচ্ছেন ইনি কে?" আমরা বললাম: "কেন?" একটু থেমে কৃষকটি বললে: "ওনার মতো অমন মাথা উঁচু করে তো কেউ যায় না। রাজাও যায় না, বণিকও না, যেতে পারে না। কেবল যিনি রাজার রাজা তিনিই যেতে পারেন। উনি তা-ই, উনি ব্রহ্মজ্ঞানী।" এই রকমই ছিল স্বামী তুরীয়ানন্দর সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্ব। আসলে সর্বাঙ্গীণরূপে যা ছিল আধ্যাত্মিক বা অন্তর্জাগতিক, বাইরে তা সামান্য লোকের কাছেও ফুটে বেরোত। একটা চাষীর কাছেও তা ধরা পড়ত।

তুরীয়ানন্দর বাল্যজীবনের কথাও শুনেছি একজন সামান্য লোকের কাছেই। শুনেছি, বাংলাদেশের এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। সে-যুগের একজন মস্ত সংস্কৃত পণ্ডিত তাঁর বাবা তাঁকে ছেলেবয়সেই যোগশাস্ত্র ও বেদান্ত দর্শনে শিক্ষা দিয়েছিলেন। উনিশ পেরোবার আগেই তুরীয়ানন্দ পাতঞ্জলির যোগ দর্শন মুখস্থ বলতে পারতেন। মীমাংসা-দর্শনের পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা তাঁর এমনই রপ্ত হয়েছিল যে বাবা কোনো কারণে বাড়ির বাইরে গেলে বাবার ক্লাস তিনি নিজেই পরিচালনা করতেন। তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর মুখে শুনেছি উপনিষদ ও শঙ্করভাষ্যের কথা; সর্গের পর সর্গ, শ্লোকের পর শ্লোক শুধু স্মৃতি থেকে তিনি আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করে শোনাতেন এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা। পরামর্শের জন্যে যেসব পণ্ডিতেরা তাঁর কাছে আসতেন, তাঁর মুখে নির্ভুল উদ্ধৃতি ও অপরূপ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনে তাঁরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হতেন। একবার একজন তাঁকে জিগ্যেস করেছিলেন: "এত জ্ঞান ও মানুষকে বুঝিয়ে দেবার এত শক্তি আপনার কী করে হলো?"

উত্তরে কেশরী বলেছিলেন: "আমার বাবা তো আমাকে প্রায় সবই শিখিয়েছিলেন, বাকিটা সার্থক হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।"

ছেলেবেলা থেকেই তুরীয়ানন্দর ধর্মভাব এত প্রবল ছিল যে উত্তরকালে সে যে একজন সাধুসন্ত হবে সেটা পরিবারের সকলে একরকম ধরেই নিয়েছিল। সুতরাং বিশ বছর বয়সে সে যখন ঘরে ফিরে সবাইকে জানিয়ে দিল যে সে গুরুর সন্ধান পেয়েছে, এতে কেউ বিস্মিত হলো না। সে আরো বললে: "আজ

বিকেলে আমার ক্লাসের বন্ধুরা আমাকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। রোজকার মতো বহু শ্রোতা ঘিরে ছিল তাঁকে। যারা আমার আগে এসেছে তাদের কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। প্রশ্নোত্তরের পালা শেষ না-হওয়া অবধি আমাকে অপেক্ষা করতে হলো। আমার পালা যখন এলো আমি তাঁকে জিগ্যেস করলুম: 'ঈশ্বরকে জানা যায়?' তিনি বললেন: 'সে তাঁর ইচ্ছা। তিনি ইচ্ছা করলেই জানা যায়?'

"তাঁর এই উত্তরে আমি ভাবতে লাগলুম, যুগে যুগে যাঁরা ঈশ্বরলাভ করেছেন সকলের মুখেই এই এক কথা, এর কারণ কী? যেমন উদ্ধৃত শঙ্করের কথাই ধরা যাক। উপলব্ধির পর তিনি বললেন: 'হে ব্রহ্ম, আমি তোমার অংশ। আবার তোমার কৃপায় তুমি-আমি অভেদ।' মহাপ্রভু চৈতন্য ও আরো অনেকে একই ভাবে বলেছেন। আর এখন শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে সেই একই সত্যের বাণী। আমি এতদিন এত যোগসাধনা করলুম। এখন দেখছি তা যথেষ্টর চেয়েও কম। এখন আমাকে ঈশ্বরের দয়া পাবার জন্যে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শিক্ষা নিতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাতের পর, পরিবারের সকলের উৎসাহে, তুরীয়ানন্দ তাঁর সঙ্গে অনেকবার দেখা করলেন। এই সময়ে একদিন বিবেকানন্দর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অচিরেই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। এর পর দু'জনে মিলে প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি অনেক পড়া হলো। যোগশাস্ত্র বা উপনিষদ যাই হোক-না কেন, কোথাও কিছু আটকালে ওঁরা চলে যেতেন রামকৃষ্ণের কাছে। কেবল তাঁর কথাতেই সব রকম সন্তোষজনক উত্তর মিলত। একদিন কেতাবের একটি দুরূহ তত্ত্বের মীমাংসা করে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ওঁরা বিস্মিত হয়ে জিগেস করলেন: "মশাই,* আপনি তো এসব বই কখনো পড়েন নি, কী করে এ-সবের মানে জানলেন?"

রাককৃষ্ণ বললেন: "আমি তো মায়ের খাস তালুকে বসত করি। সেখানে তোদের কেতাব পৌঁছয় না।"

অন্য একটি ব্যাপারে আরেকদিন তিনি বলেছিলেন: "জাল ফেললে যেমন মাছটা চট করে ধরা পড়ে, সৃষ্টিকর্তাকে জানলে তেমনি তাঁর সৃষ্টিকেও জানা যায় সহজে।"

ঠাকুরের মহৎ সঙ্গ ও কথামৃতে রোমাঞ্চিত ও আনন্দিত বিবেকানন্দ একদিন বাড়ি যেতে যেতে তুরীয়ানন্দকে বললেন: "গুরু মহারাজকে কেমন মনে হয় তোমার?" তুরীয়ানন্দর উত্তর: আমি কিছু বলতে পারিনে। তবে প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করে বলি:

* তৎকালীন সমাজের রীতি অনুযায়ী পরমহংসদেবকে সকলে 'মশাই' বলে সম্বোধন করতেন। এটা আমাদের কাছে বিস্ময়কর বোধ হয়।

"অসিত গিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥"*

ঐশী শক্তির যে-তুঙ্গভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থান, তুরীয়ানন্দর কথায় তার আভাস পাওয়া যায়। আমাদের কালে যে-সকল সাধু মহাপুরুষ অবিসংবাদিত্‌-রূপে স্বীকৃত, কোনো সন্দেহ নেই, তুরীয়ানন্দ তাঁদের অন্যতম। তিনি স্বল্প-ভাষী ছিলেন। কিন্তু যখন কোনো মতামত দিতেন সেই মতামতের ভাষা হতো নিঃসংশয় ও স্পষ্ট। অন্যেরা যেমন পূজা ও সম্ভ্রমের বোধ নিয়ে ঈশ্বরের আলোচনা করেন, রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ তাঁর মুখে ঠিক সেইভাবে শুনেছি।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর কয়েক বছরের মধ্যেই তুরীয়ানন্দ মাধুকরী নিয়ে ব্রহ্মচারী হলেন; তার কিছু পরেই হলো সন্ন্যাসদীক্ষা। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল হরি। সে-নাম ত্যাগ হয়ে গেল, নূতন নামকরণ হলো, 'তুরীয়ানন্দ'। তুরীয় শব্দটির ভাষান্তর কঠিন। একে চিদাকাশ বলা যায়, ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদ জ্ঞানের পূর্বাবস্থা। এই অবস্থা লাভের পরেই সমাধি। তুরীয়ানন্দ সম্পর্কে এখন আর কিছু বলব না, পরবর্তী অধ্যায়ে না-হয় আরো বলা যাবে। এখন বলছি লাটু মহারাজের কথা, রামকৃষ্ণের অতুলনীয় শিষ্য এই লাটু।

তুরীয়ানন্দ যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন সে-কথা আমরা পূর্বে বলেছি। কিন্তু ঈশ্বরোপলব্‌ধি হীন যে-শুষ্ক পাণ্ডিত্য তাতে তাঁর ঘৃণা ছিল অপরিসীম। বরং পাণ্ডিত্যহীন ঈশ্বরোপলব্‌ধির প্রতি তাঁর সপ্রেম আগ্রহ ছিল প্রবল। আর সেই কারণেই লাটু সম্বন্ধে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন; এক্‌ পশ্চিমা বেনের পরিচারক ছিল লাটু, একেবারে অশিক্ষিত। সেই ধনী মালিকের সঙ্গে একদা এসেছিল পূর্বকালে তীর্থভ্রমণে। কলকাতার পথে যাবার সময় সেই ধনী বেনে পুণ্যার্জনের জন্যে দান-ধ্যান করতে করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাতেও তার মন ভরল না। "আর কী বাকি থাকল?" সে নিজেকেই প্রশ্ন করে: "আর কি করলে পুণ্যার্জন সফল হয়?" যার সঙ্গেই দেখা হয়, জনে-জনে সবাইকেই জিগ্যেস করে এই কথা। শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে তার পরিচারকবর্গের একজন বললে: "দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন, আপনি তো তাঁকে ডালি দেন নি।"

সুতরাং পরদিন সেই ধনী ব্যবসায়ী তার লোকলস্কর নিয়ে দক্ষিণেশ্বরের পথে রওনা হলো। গঙ্গার উপর দিয়ে রাজকীয় নৌবহরে তারা চললো। দৃশ্যটি যেন

* শ্লোকটির তর্জমা করলে দাঁড়ায়: "গিরিরাজ যদি হন মস্যাধার, মহা সমুদ্র মসী, অসংখ্য অরণ্যের অন্তহীন পত্রে লিখতে বসেন সাক্ষাৎ সরস্বতী, তবু তাঁর বিদ্যুৎগতি লেখনী ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনে অসমর্থ।"

চোখে দেখা যায়। বণিকের পোশাকটি তীর্থোপযোগী লম্বা-হাতা শাদা টিউনিক গলা থেকে কোমর অবধি আটকানো। মাথায় সোনালি রঙের পাগড়ি। শাদা দাড়িটি পরিপাটি আঁচড়ানো, তাতে আতরের সুগন্ধ। এক জোড়া কালো চোখ বজরা থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে চারদিকের মানুষজন ও প্রাণচঞ্চল দৃশ্যাবলী। দক্ষিণের হাওয়া লেগে পাল-তোলা ঘন নীল রঙের বজরাটি গেরুয়া জলের উপর দিয়ে চলেছে তরতর করে। পিছন-পিছন আছে লোকলস্কর বোঝাই তিনটে শাদা নৌকো। পরিচারকাদর পোশাক নীল আর লালে মেশানো। এই তিনটে নৌকোর একটিতে আছে লাটু। নিরেট সোনা ও মণিমুক্তো ভরা একটি থালা তার হাতে। দক্ষিণেশ্বরের সাধুর জন্যে এই অর্ঘ্য। এই মুহূর্তে সে জানেনা সাধু মহারাজ তাঁর স্নিগ্ধ মনটি ছাড়া তার কাছে আর-কিছুই চান না। চলতে চলতে সকালের প্রখর সূর্যের স্পর্শে পান্নার মতো সবুজ ডাঙা ভেসে উঠল। স্নানার্থীরা কোমরজলে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে সকাল বেলাকার আহ্নিক সারছেন। পিরামিডের আকারে সাজানো যাবতীয় ফলের বজরা যাচ্ছে। কালো রঙের পালের ফাঁকে ফাঁকে পাহাড় করা আম আর কমলালেবু ঝিলিক দিচ্ছে।

কত শত দৃশ্যাবলীর পর অবশেষে দক্ষিণেশ্বর। অলংকৃত মজবুত গ্র্যানাইট পাথরে বাঁধানো লম্বা-চওড়া ঘাট। উপরে উঠে মন্দিরের বৃহৎ চত্বর, সম্মুখে ভবতারিণীর মন্দির। মন্দির রেখে তারা বাঁ-দিকে গেল, কারণ আজকের দিনে তাদের কাছে ভবতারিণীর মৃণ্ময়ী মূর্তির চেয়েও প্রধান কথা হলো জীবন্ত গুরু মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার। বাগানের দিকে প্রায় শ'খানেক গজ গেছে এমন সময় ওরা খোলা দরজার মধ্যিখানে শুনতে পেলো গুরু মহারাজের নিচু গলার মধুর স্বর। এ-কণ্ঠস্বর চিনতে কারো ভুল হয় না। ভেতরে কার সঙ্গে তিনি কথা কইছেন। কথা শেষ না-হওয়া অবধি তারা প্রতীক্ষা করল। কথা শেষ হয়ে যখন চুপচাপ, ধীরে ধীরে ওরা ঘরে ঢুকল। আগে আগে লক্ষপতি বণিক মশায়, তার পেছনে ঠাকুরের জন্যে সোনার থালা হাতে লাটু। ছায়া-ছায়া ঠাণ্ডা ঘরটিতে ওরা আরাম বোধ করল। কিছুক্ষণ বসবার পর ছায়াচ্ছন্ন ঘরের সবকিছু চোখ-সহা হয়ে গেল। এখন ওরা স্পষ্ট দেখতে পেলো: একজন দীর্ঘকায় বৃদ্ধ, চেহারা এমন কিছু আকর্ষণীয় নয়, লম্বা খাটের একপাশে ধবধবে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। দেহের কাপড়চোপড় এদিক-ওদিক পড়ে গেছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। পায়ের কাছে নিচে মুণ্ডিত মস্তক কয়েকজন বসে আছেন, স্থির হয়ে তাঁরা কী শুনছিলেন। মধ্যিখানে এরা এসে যে বাধা পড়ল তাতে কেউ কিছু বললেন না। বণিক প্রণাম করে যথোচিত সম্ভাষণের পর কিছু বললে। তারপর লাটু এগিয়ে গিয়ে অর্ঘ্য সাজানো সোনার থালাটি গুরুমহারাজের পায়ের কাছে রাখল। বহুমূল্য মণিমুক্তোগুলো ঝকমকিয়ে উঠল। কিন্তু রামকৃষ্ণ সেগুলো তাকিয়েও দেখলেন না। এ কী, তাঁর দৃষ্টি লাটুর উপর স্থির নিবদ্ধ। সরলতায় ভরা লাটুর

এই মুখটি দেখবেন বলে তিনি যে বহুদিন ধরে প্রতীক্ষা করে আছেন। কিন্তু লাটু তো এসব কিছুই জানে না। তাই রীতিমাফিক সাধুদর্শন শেষ হতেই মালিকের সঙ্গে লাটুও বেরিয়ে গেল। কেননা, মহারাজের নির্দেশ অনুযায়ী মণিমুক্তো ভরা সোনার থালাটি বিক্রি করে টাকাপয়সা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে।

দিন দুয়েকের মধ্যে লাটু আবার এসে হাজির। ঐ একই ঘরে রামকৃষ্ণ তখন খাটের ওপর বসে জনা ছয়েক শিষ্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। তাঁরা শুনছিলেন। লাটু ঘরে ঢুকতেই দীর্ঘকায় গুরু মহারাজ "আরে, তুই আবার কেন ফিরে এলি?" বলতে বলতে সোজা উঠে দাঁড়ালেন।

লাটুর দু-চোখ দিয়ে জল ঝরছে অবিরল। বললে: "প্রভু, অতীতে আপনাকে আমি হারিয়েছিলাম; কিন্তু এ জন্মে কৃপা করুন, আর যেন আপনাকে না হারাই।" এই বলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের শ্রীচরণে মুখ লুকোল। লাটুর দীক্ষাও হলো অতি সত্বর, যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। পঠন-পাঠনের পরিশ্রমের মধ্যে তাঁকে যেতে হয়নি। তাঁর সম্পর্কে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন: "আমাদের মধ্যে অনেককেই পাণ্ডিত্যের পাঁকে ভরা জলা ভাঙতে হয়েছে, অহমিকার জোয়ার ঠেলে কত কষ্টে ওপারে তাঁর কাছে পৌঁছতে হয়েছে। কিন্তু এই লাটু, হনুমানের মতো একলাফে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ডিঙিয়ে গিয়ে তাঁর মোক্ষপদ পেয়ে গেল। কী অন্তর্দৃষ্টি, আর কী নিশ্চিত বিশ্বাস! আমাদের সকলের চেয়ে লাটু বড় মহৎ। পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই, ঘোর কুটিল সন্দেহে বিন্দুমাত্র আক্রান্ত হয়নি, সহজ-সরল স্বতঃশুদ্ধরূপে গুরুর কাছে পৌঁছে গেল।"

রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে লাটু তাঁর জীবনের শেষ ভাগটা বেনারসের মঠে কাটিয়েছিলেন। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছাকাছি থাকতেন। যেখানে থাকতেন সেখানে দরিদ্র ও দুঃস্থদের চিকিৎসার জন্যে একটি হাসপাতাল ছিল। রোগীদের সেবাযত্ন করতেন মঠের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা।

যাকে আমরা মানুষের উপকার বা সৎকর্ম বলি লাটুর তাতে সন্দেহ ছিল। তাঁর এই বোধ ও ধারণা ছিল যে, জীবনের গভীর সত্যের উপলব্ধির ব্যতিরেকে নারী-পুরুষ যদি কোনো কল্যাণকর্মে ব্রতী হয় তবে তা নিতান্ত গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয়ে সত্যিকারের কল্যাণ সাধন করে না। একবার এক অহংকৃত যুবক বললে: "আপনার সঙ্গে আমি একমত, লোককল্যাণ-টল্যান একটা পাশ।" লাটু হেসে বললেন: "তাই নাকি? তাহলে তো দেখছি তুরীয়ানন্দ-বিবেকানন্দর মতো সাধুরা ঐ পাশে পড়েছেন। তাই যদি, তবে তো এ-রকম পাশ কাম্য।"

শিবময় না হলে শিবের কর্ম করা যায় না—লাটুর বিশ্বাস এই রকম। প্রার্থনায় অসুখবিসুখ ভালো হয় এসব তিনি মানতেন না। নিজে অসুস্থ হলে সর্বদা ডাক্তারের কাছে যেতেন, রোগের যন্ত্রণা পুষে রাখা তাঁর চলে না।

কিন্তু একবার এমন হলো যে ডাক্তারও হার মানলেন। খালি পায়ে হাঁটতে

হাঁটতে রাস্তার একটি ধারালো টিনের টুকরোয় পা কেটে গেল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মঠে ফিরলেন। গেলেন তুরীয়ানন্দর কুটীরে। "শেষে শ্যামের বাঁশি বাজল। আমি তাঁর ডাক শুনেছি। তাঁর কাছে যাবার সময় হলো। যাচ্ছি।"

পায়ের ক্ষত দেখলেন তুরীয়ানন্দ। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডেকে লাটুকে শুইয়ে দিলেন। "কিছু লাভ হবে না।" বারংবার বলতে লাগলেন লাটু। —"তিনি ডাকছেন আমাকে। যেতেই হবে। ডাক্তার কি পারবে ঠেকাতে!' ডাক্তারের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ঘায়ে পচন দেখা দিল। পক্ষকালের মধ্যে লাটু চলে গেলেন। 'আলোর সাগর পাড়ি দিয়ে চলে গেলেন প্রিয়তম নিজ নিকেতনে।'

এইভাবে রামকৃষ্ণের অজ্ঞ ও অশিক্ষিত শিষ্যের সমাপ্তি হলো। অসুখের শেষ চার দিন তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে সমাধিস্থ ছিলেন। মুহূর্তের জন্যেও সমাধি ভাঙল না। সন্ন্যাসীরা বললেন: 'শরীর ত্যাগ না-করা অবধি তিনি নির্বিকল্পে ছিলেন।'

দশম পরিচ্ছেদ

অবচনীয়ের বর্ণনা

'ঈশ্বরদর্শন' বলতে রামকৃষ্ণ কী বুঝতেন? —পাঠকের মনে এ-রকম প্রশ্ন হতে পারে। 'সমাধি'র মানে কী? কী কী স্তর পার হয়ে সমাধি লাভ করা যায়? তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধির প্রকৃতি কী যার ফলে শিষ্যেরা তাঁর কাছে আটকে রইলেন? রামকৃষ্ণ বিষয়ক কিংবদন্তি সংগ্রহ করতে গিয়ে এইসব তথ্য আমার জরুরি বলে মনে হলো। কী সে রহস্য যার ফলে এই বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান ছেলে-ছোকরারা রামকৃষ্ণে মজল? তাঁর প্রতি তাদের এত ভক্তিবিশ্বাস কেন? এই ছোকরাদের কি তিনি কোনো বিস্ময়কর জগতের সন্ধান দিয়েছিলেন? যার ফলে রূপরস শব্দস্পর্শময় এই সংসারটি তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল? কী সে জগৎ যার প্রতি তাদের আকর্ষণ সংসারের চেয়েও তীব্রতর?

বেনারসে স্বামী তুরীয়ানন্দকে এইসব প্রশ্ন আমি করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "গুরুমহারাজ আমাদের অনন্তের স্বরূপ দেখিয়েছিলেন। তারপর থেকে তাঁর সান্নিধ্যে আমরা বরাবর ছিলুম। আশা এই যে, তাঁর দয়া ও উপদেশে আমাদের আবার ঈশ্বরদর্শন হবে। শিষ্য যে সে শিষ্যই—বরাবরের শিষ্য। সম্ভাব্য সমাধির কথা ভা.বা—যে-সমাধি লাভের জন্যে মানুষ শত শত জন্ম তপস্যা করেছেন—ঠাকুরের সামান্য অঙ্গুলিস্পর্শে বা শ্রীচরণস্পর্শে তা লাভ করা যেত। সচ্চিদানন্দের আস্বাদনে নিয়ত আমাদের ব্যাকুলতা, কী করে

আমরা তাঁকে ছেড়ে থাকি! তাঁর কৃপায় চিণ্ময়ীর প্রসন্ন নয়ন যে-মুহূর্তে আমাদের একবার গোচরীভূত হতো, সংসার অসার হয়ে যেত। এমনিতে এ-জগতে আমরা কিছু দেখিনা, যা দেখি তা কিছুই না। যাকে বাস্তবিক দেখা বলে সেটা তাঁর আলোতেই দেখা, তার নাম দর্শন। এই দর্শনের পর যা-কিছু আমরা দেখি শুনি ভাবি, সবেতেই এই কথাটা বাজতে থাকে, 'তুমি তাঁর, তুমি তাঁর। তত্ত্বধ্বনি।' আর এটাই গুরুমহারাজ আমাদের দিয়েছেন। এইসব হয়ে যাবার পর আকাশের পাখির মতো আমরা তাঁকে খুঁটি করে তাঁর পরিমণ্ডলে থাকতুম। আকাশের পাখি অনন্ত আকাশে যতদূর খুশি যেতে পারে, কিন্তু তারও একটা নির্দিষ্ট গতিপথ আছে, সে সেই পরিমণ্ডলেই স্থিতি করে।"

যাঁর কোনো বর্ণনা দেওয়া যায় না, যা অনির্বচনীয়, তা-ই বিশদ করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে চেলারা ঠাকুর রামকৃষ্ণকে চাপ দিতেন, এটা সুপরিচিত ঘটনা। কিন্তু তিনিও বলতেন: "তাঁর কথা মুখে বলা যায় না। তিনি বাক্য-মনের অগোচর। সাধন করতে করতে,উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তাঁর স্বরূপকে চেনা যায়।"

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভক্ত-শিষ্যদের চাপ আর থামে না। তাঁকে বলতেই হবে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা, সমাধির কথা, পরব্রহ্মের কথা।

"ওসব আমি পারব নি।" রামকৃষ্ণ নারাজ হলেন। "কেন, তোদের যে এত দেখালুম শোনালুম, যা না, সাধন করে হাতে-কলমে বুঝে নে না গে। শুধু কথায় যদি বোঝানো যেত তবে আর তো া সাধন করবি কী?"

"কিন্তু মশাই"—শিষ্যরা সকাতরে বললে—"আপনি যা পারেন আমরা কি তা পারি? সমাধি অবস্থায় আপনি তো এক নাগাড়ে ছ-সাতদিনও থাকতে পারেন, কেবল আপনিই তা পারেন। আপনি পারেন সব-কিছু বুঝিয়ে বলতে। অখণ্ড চৈতন্য ও অনন্ত নৈঃশব্দ যেখানে বিরাজমান সেখানে কথা বলি সাধ্য কী আমাদের?' কিন্তু এই নির্ভেজাল খোশামুদে কথায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ কিছু বললেন না, শুধু হাসলেন। তখন একটি ভুখোড় সেয়ানা ছেলে তাঁর মুখ থেকে কথা বের করবার জন্যে অন্য পথ ধরলে। বললে "কিন্তু, প্রভু, আমাদের মধ্যে অনেকেরই অন্য মত, ভিন্ন পথ। সকলেরই যে একই অভিজ্ঞতা হয়েছে জানব কী করে। ধরুন, আমি যখন ধ্যান করতে গিয়ে সমস্ত সত্তাকে ক্রমশ তন্ময়তায় নিয়ে যেতে থাকি তখন আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া তো অন্যের মতো না-ও হতে পারে।"

"ও তো বাপু, যার যেমন ভাব। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।" তিনি মুখ খুললেন। "এগুনো বলা যায়। এখানে (আপনাকে দেখিয়ে) সব ভাবের সাধন হয়েছে। সবই এক সচ্চিদানন্দ। যখন ষষ্ঠ ভূমি ছাড়িয়ে সপ্তম ভূমিতে উঠেছি তখন দেখি…"

কথাটা শেষ হলো না, তক্ষুনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ, হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া স্তিমিত, নাড়ির গতি নেই বললেই হয়। শরীরে ঈষৎ তাপ আছে মাত্র, তাছাড়া মৃতের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য এতে ভয় পাবার কী আছে। তাঁর ভক্তশিষ্যরা তো দিনের মধ্যে কতবার তাঁর এই সমাধি অবস্থা দেখেছে, দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়েছে। আবার সমাধি ভঙ্গের পর তিনি মুখ খুলেছেন : "হ্যাঁ রে, আমি তো মনে করি, সব কথা বলি, কিন্তু পারি কই! বলা কি যায়! অখণ্ড ব্রহ্ম সমুদ্রের কথা মুখে বলা যায় না। তোরা নিজেরা ডুব দিয়ে ছাখ। মনঃবুদ্ধি যতই প্রখর হোক না, শাঁ করে সব গ্রাস করে নেয়। চৈতন্যসমুদ্রের কাছে মনঃবুদ্ধি আর থাকে কোথায়!"

"কিন্তু আপনি বলেছিলেন কিভাবে মানুষের মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তি চলাচল করে আপনি তা নিয়ে বলবেন।"

"হ্যাঁ"। রাজী হলেন তিনি। "ধর্মচক্ষু যা দর্শন করে তা অবশ্য মুখে বলা যায় না। কিন্তু দর্শনের আগে ধর্মচক্ষু* বা কুণ্ডলিনীর গতিটা বলা যায়। নানা পথে নানা রকম চলন, মূলে কিন্তু সারবস্তু একই। প্রার্থনা ও ধ্যানে চিত্তবৃত্তির উদ্দীপন হলে চিদাকাশে জীবাত্মার গতিকে ঋষিরা পাঁচ ভাগে দেখিয়েছেন। কোনো গতি ব্যাঙের মতো থপ-থপ। কোনো গতি সাপের মতো তির্যক। কোনোটা পিঁপড়ের সারির মতো। চতুর্থটি বিহঙ্গ গতি। পাখি যখন গাছ

* লেখক ইংরেজি হরফে লিখেছেন : Dharma-eye.

'ধর্মচক্ষু' বলতে লেখক ঠিক কী বলতে চাইছেন, আমরা বুঝিনে। যদি তা সত্যদর্শন হয় তবে ঐ অবস্থায় তা ছাখে কে? কুণ্ডলিনী প্রভাবে আত্মা বা জীবাত্মাই দেখেন। কিন্তু কথামৃতে যা আছে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ) তা হলো ঊর্ধ্বগতি মহাবায়ুর কথা। সুষুম্না দিয়ে মূলাধার থেকে সহস্রারে পৌঁছবার সময় মহাবায়ুর গতি হয় বিচিত্র : তাকে পাঁচ প্রকার বলা হয়েছে, অর্থাৎ পাঁচ প্রকার সমাধি। এই পাঁচ প্রকার পরমহংসদেবের নিজের ভাষায়—

"কখন কপিবৎ,—দেহবৃক্ষে বানরের ন্যায় মহাবায়ু যেন এ ডাল থেকে ও ডালে একেবারে লাফ দিয়ে ওঠে, আর সমাধি হয়।

"কখন মীনবৎ—মাছ যেমন জলের ভিতরে সড়াৎ সড়াৎ করে যায় আর সুখে বেড়ায়, তেমনি মহাবায়ু দেহের ভিতর চলতে থাকে আর সমাধি হয়।

"কখন বা পক্ষীবৎ,—দেহবৃক্ষে পাখীর ন্যায় কখনো এ-ডালে কখনো ও-ডালে।

"কখনো পিপীলিকাবৎ,—মহাবায়ু পিঁপড়ের মতো একটু একটু করে ভিতরে উঠতে থাকে, তারপর সহস্রারে বায়ু উঠলে সমাধি হয়।

"কখনো বা তির্যকবৎ,—অর্থাৎ মহাবায়ুর গতি সর্পের ন্যায় আঁকাবাঁকা; তারপর সহস্রারে গিয়ে সমাধি।"

স্পষ্টতই ব্যাঙের মতো থপ-থপে ভঙ্গিটি এখানে নেই। আছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে। সেখানে আবার 'মীনবৎ' নেই। সে যাই হোক, মেমসাহেবদের বোঝাবার জন্যে তাদের ভাষায় যা বলা হয়েছে আমাদের পক্ষে তাতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এক্ষেত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত যথাসম্ভব আঁকড়ে ধরেছি।

থেকে আকাশে ওড়ে, মনে হয় সে লক্ষ্যহীন এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে আকাশে। কিন্তু কিছু পরেই সে দূরের একটি গাছে গিয়ে বসে, সর্বক্ষণ ঐ তার লক্ষ্য ছিল। ভক্তির উদ্দীপনায় জীবাত্মারও সেই দশা। ওপরে উঠে প্রথমে এলোমেলো ঘুরলেও ঈশ্বরই তার লক্ষ্যবস্তু। পাঁচ নম্বর গতিটি ভিন্ন প্রকার। ঋষিরা তাকে বলেছেন: বানর-গতি। বাঁদরগুলো প্রথমে বসে থাকে বেশ চুপচাপ। তার পরেই লাফ-ঝাঁপ, যতক্ষণ না তাদের আমবাগানের লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌছয়। চুপচাপ কয়েকদিন বেশ ধ্যান চলছে, কিন্তু যেই সমস্ত সত্তায় ঈশ্বরবোধ একাত্ম হলো অমনি জীবাত্মা লাফ মেরে মেরে সমস্ত ডিঙিয়ে গিয়ে অদ্বৈতভাবে পৌছে যায়।"

এরপর রামকৃষ্ণদেব চোখ বুজলেন, ক্রমশ গভীর সমাধির মধ্যে গিয়ে পড়লেন। ভক্তশিষ্যরা দীর্ঘ প্রতীক্ষায় বসে রইলেন যতক্ষণ না সমাধি থেকে ব্যুত্থানের পর তিনি প্রকৃতিস্থ হন। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পিছনে কী অবিশ্রান্ত ধৈর্য তাদের! এইবারে রামকৃষ্ণদেবের সমাধি ভাঙতে সময় নিল প্রায় ঘণ্টাখানেক, তারপর কিছু সময় পর তিনি আবার কথায় ফিরে এলেন।

"সমাধিতে পৌছতে কুণ্ডলিনীর গতি যেমনই হোক না, ছটি চৈতন্যভূমি ছুঁয়ে যেতেই হবে। বুদ্ধ-ধ্যান বা যার ধ্যানই বলো না, এই ছটা ভূমি পেরোলে তবে গিয়ে সপ্তম বা শেষ ভূমিতে পৌছনো যায়। ব্যাঙের মতো থপথপে বা পাখির মতো শাঁই করে—গতি যেমনই হোক, সাত রাজ্য পার হতে হবে।"

"প্রত্যেক ভূমিতে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা কি একই রকম?" শিষ্যদের একজন জিগ্যেস করলেন।

"হ্যাঁ, মোটামুটি মানে, স্বরূপত একই।" বললেন তিনি।

আবার প্রশ্ন: "আপনার ধ্যানের শুরুটা কি প্রত্যেকবার একই রকম হতো? আমাদের পদ্ধতির চেয়ে আপনার পদ্ধতির কি তফাত নেই কোনো?"

তিনি বললেন: "না, তফাত নেই। গুরু যেমন বলে দিয়েছেন তেমনি করে শান্ত হয়ে বসি। সংসারের সকল তুচ্ছতা থেকে সরিয়ে এনে মন বুদ্ধিকে শুদ্ধ করি। তারপর অন্তরে মনে চিত্তে সর্বত্র তিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন এইভাবে তাঁকে খুঁজি। আমি তো তাঁর থেকে আলাদা নই, আমাতেই তিনি বর্তমান। এই ভাবনায় তন্ময় হয়ে গিয়ে ধ্যানের মধ্যে আকুল হয়ে বলি: 'ওগো তুমি এসো, এই খোলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসো।' এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। শেষে কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ টের পাই। সংসার সমুদ্র থেকে ব্যাঙের মতো টুপটুপ করে লাফিয়ে উঠে আসে। এটা মূলাধার, সপ্তভূমির প্রথম ভূমি। একটা আলো, একটা নতুন সূর্যের আলো চরাচরের সমস্ত বস্তুকে সুন্দর করে তোলে। সামনে পেছনে যেদিকেই তাকাও সব দিকেই তাই। বুঝলুম, এটাই ইন্দ্রিয়ের প্রধান স্থান। সমস্ত

রূপ-রস-গন্ধ যেন হিড়হিড় করে টানতে থাকে। তখন কে যেন বলতে থাকে: 'সাবধান, এখানে অনেক লোভ, অনেক কামনা-বাসনা। সাবধান!'

"শোনা মাত্র সাবধান হয়ে গেলুম। মনকে কুড়িয়ে নিয়ে মূলাধার থেকে উত্থানের জন্যে গভীরতর ধ্যান চলতে লাগল। মাস কয়েক পর ফল ফললো। কামনা-বাসনার মোহময় জগৎ ঝরে যেতে লাগল। দেখা দিল দ্বিতীয় ভূমি—স্বাধিষ্ঠান। এখানে আগেকার মতো বস্তুরূপ নেই। এখানকার সব-কিছুই স্বচ্ছতর, সূক্ষ্মতর ও সুখকর। ভালো লাগল। এই ভূমিতে টুকরো টুকরো রূপ-রস-শব্দ-বর্ণ আমাকে একেবারে মোহিত করে ফেললো। ভাবলুম এখানেই থাকি। অমনি জীবসৃষ্টির কামপ্রবৃত্তি জেগে উঠল। কী সে টান! এখানে প্রবল কামশক্তি ও মোহের আকর্ষণ। কিন্তু সে যাই হোক, নিবৃত্তি চাই. কঠোর নিবৃত্তি সহযোগে এ-ভূমি উৎরোতে হবে।

"আবার কঠোর সাধনা ও ধ্যান। তপস্যার আগুনে দ্বিতীয় ভূমি পুড়ে গেল, জেগে উঠল তৃতীয় ভূমি মণিপুর। দ্বিতীয়তে যে ইন্দ্রিয়াদিবোধ এখানে তা প্রচণ্ড। মনে হয় সূর্যটিকে হাতের মুঠোয় এনে গুঁড়ো করে ফেলা যায়। পাশব শক্তির এই একটা পরীক্ষা। সবচেয়ে খারাপ এই পাশবশক্তি। একে রুখতেই হয়। ইন্দ্রিয়াদির এইসব নিগড় থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমার কী অবস্থাই না গেছে। যতই লড়াই করো ততই চেপে ধরে, কিছুতেই কি ছাড়ানো যায়!

"কঠোর সাধনায় লড়াই করে-করে মত্ত হস্তীর মতো যেখানে এসে পড়লুম এটা চতুর্থ ভূমি—অনাহত। এখানে শুধু জ্যোতিঃ দর্শন হয়। আমার ভেতর থেকে ঈশ্বরের আলো ছিটকে বেরিয়ে এসে সবকিছু জ্যোতির্ময় করে তুলেছে। পৃথিবীর ধূলিকণা থেকে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সবই যেন এক সুরে বাঁধা। ঈশ্বরীয় ভাবে একাকার। এই চতুর্থ ভূমিতে কোনো প্রলোভন নেই দেখে কতকটা আশ্বস্ত হলুম। তবু সতর্ক থাকতে হলো। এই জ্যোতির্ময় ভূমিতেও কোথাও কোনো লোভ লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে। নিঃসংশয় নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। না, এখানে থাকা চলবে না। আরো ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।

"কিন্তু এবারে উঠতে বেশি সময় নিল না। ভিতরের আলোটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল, অসংখ্য সূর্যের আলোয় ভাস্বর বিশাল আকাশে গিয়ে পড়লুম। এই পঞ্চম ভূমির নাম বিশুদ্ধ। এটা বাক্‌ভূমি। আমার মন, বুদ্ধি, অনুভব, অণু-পরমাণু সব তখন জ্যোতির্ময় শিখার মতো জ্বলছে। আমার কণ্ঠ হতে ভগবানের স্তব-স্তুতি অনর্গল নির্গত হতে লাগল। এই সময়টায় এমন হতো যে ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কোনো কথা কইতে পারি না। বিষয় কথা যদি কেউ কয়েছে তো মনে হতো মাথায় লাঠি মারলে। বিষয়ী দেখলে ভয়ে লুকোতুম, দূরে পঞ্চবটীতে পালিয়ে যেতাম। আত্মীয়-স্বজনকে যেন কূপ বলে মনে হতো—মনে হতো তারা যেন টেনে কূপে ফেলবার চেষ্টা করছে, পড়ে যাবো

আর উঠতে পারব না। দম বন্ধ হয়ে যেত, মনে হতো যেন প্রাণ বেরোয় বেরোয়—সেখান থেকে বেরিয়ে এলে তবে শান্তি হতো।…কিন্তু কণ্ঠে এই যে পঞ্চম ভূমি 'বিশুদ্ধ'—এখানেও ভক্তি-বিশ্বাস-প্রেমের পূর্ণতা নেই। এখানে উঠলেও মন আবার নিচে নেমে যেতে পারে: সুতরাং কণ্ঠ ছাড়িয়ে যদি মন ভ্রূমধ্যে ষষ্ঠ ভূমিতে ওঠে তবে আর পড়বার ভয় নেই।

"আর তাই তো ওটা ছাড়িয়ে ওঠবার সংকল্পে আবার কঠোরতম সাধনায় লাগলুম। সুখ-শান্তি আর রইল না। মনকে বোঝালুম, 'হয় ঈশ্বর-দর্শন, নয় জীবন-বিসর্জন।' শুধু তাঁর স্তবগানেই হবে না, তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন চাই। কত যে কাঁদলুম, কত যে মিনতি করলুম। একটানা নিরন্তর। তারপর হঠাৎ একসময় ঊর্ধ্বলোকে ভ্রূমধ্যে কী একটা টের পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। এই ষষ্ঠ ভূমি তুরীয়। এখানেই পরমাত্মার দর্শন। সবিকল্প সমাধি। তখন পরমাত্মা এত নিকটে যে, মনে হয় যেন তাঁতে মিলে গেছি; এক হয়ে গেছি। কিন্তু তখনো এক হয়নি। এখানটায় আর সহস্রারের মাঝে একটা কাঁচের মতো স্বচ্ছ আড়াল মাত্র থাকে।

"ষষ্ঠ থেকে সপ্ত ভূমিতে—সহস্রারে—যেতে বেশি বেগ পেতে হয় না। কোনো বাক্য, কোনো চিন্তা এখানে পৌছয় না। নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। আমি-তুমি লুপ্ত হয়ে গিয়ে অখণ্ড শান্তি, অখণ্ড আনন্দ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ থামলেন। কারো মুখে কথা নেই। ঘরভতি স্তব্ধতা। ঠাকুর যা বললেন তারই অনুধ্যান চলছে সকলের মনে। কিন্তু একজন তরুণের মনে অন্য কথা এলো, সে বললে: "মশাই, এ যে বেদ-বেদান্ত যোগ-বিজ্ঞানের কথা, আপনি তো লেখাপড়ার কখনো ধার ধারেন নি, এত সব জানলেন কোথা থেকে?"

ঠাকুর হেসে বললেন: "নিজে পড়িনি, কিন্তু ঢের সব যে শুনেছি গো! সে-সব মনে আছে। অপরের কাছ থেকে, ভালো ভালো পণ্ডিতের কাছ থেকে, বেদ-বেদান্ত দর্শন-পুরাণ সব শুনেছি। শুনে, তাদের ভেতর কী আছে জেনে, তারপর সেগুলোকে (গ্রন্থগুলোকে) দড়ি দিয়ে মালা করে গেঁথে গলায় পরে নিয়েছি—'এই নে তোর শাস্ত্র-পুরাণ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে'—বলে মা-র পাদপদ্মে ফেলে দিয়েছি।"

এই সময়ে একজন একটা গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করলে। বললে: "মশাই, এতক্ষণ যা বলেছেন তাতে বড় আনন্দ পেলাম, বড় তৃপ্তি পেলাম। কিন্তু আমার চপল মন অন্য কথা ভাবছে। ধরুন, 'সোহং সোহং' করে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের জ্ঞান লাভে যিনি ধ্যানস্থ হলেন, আর যিনি 'তুমি তো আমি নও, তবু তোমাকে খুঁজে বেড়াই' এই করে-করে ভক্তিপথে চললেন—এই দু'জন কি সপ্তভূমি পার হয়ে গিয়ে সেই অখণ্ডে গিয়ে মিশবেন? না কি তাঁদের চিরবিচ্ছেদ থাকবেই?"

মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না-করে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন : "আরে, ওটা তো সব শেষের কথা। 'তুমি-তুমি' আর 'সোহং সোহং' যা-ই করিস না কেন, শেষে গিয়ে সবই এক, কোনো তফাত নেই। কি রকম জানিস ? যেমন অনেক দিনের পুরনো চাকর। মনিব তার গুণে খুশি হয়ে তার সকল কথায় বিশ্বাস করে সব বিষয়ে পরামর্শ করে। একদিন খুব খুশি হয়ে তার হাত ধরে নিজের গদিতেই বসাতে গেল ! চাকর সংকোচ করে 'কী করো, কী করো' বললেও মনিব জোর করে টেনে বসিয়ে বললে, 'আঃ, বোস না ! তুইও যে, আমিও সে।' সেই রকম। তুমি-আমি করে ঐকান্তিক ভক্তিতে ব্যাকুল হয়ে তাঁর আরাধনা করলে হঠাৎ একদিন তিনিই ডেকে নেন তাঁর কাছে, তাঁর সঙ্গে মিশিয়ে দেন। সেটাই সমাধি।"

কিংবদন্তি এই যে একসময় ঠাকুর রামকৃষ্ণের কতিপয় অন্তরঙ্গ সমাধি প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা চেয়ে ঠাকুরকে বললেন : "এ-বিষয়ে যদি কিছু বলেন তো সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়। সমাধির সংজ্ঞা যদি দেন তো আমরা ঈশ্বরের সংজ্ঞাও পেয়ে যাই।"

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বড় সাবধানী। বললেন : "ঈশ্বরেরর সংজ্ঞা দিয়ে কী করবি ? ও বুঝেছি, আমার নামে একটা সম্প্রদায় খুলবি তো ! না না, তা হয় না। একটা ধর্মসম্প্রদায় খুলতে তো পৃথিবীতে আসিনি।"

সে যাই হোক, শোনা যায়, আরেকদিন কথা প্রসঙ্গে আকারে ইঙ্গিতে তিনি ঈশ্বরের স্বরূপের কথা বলেন। উপস্থিত ভক্তশ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন : "আমাদের অনেক বিষয়েই একটু গোলমেলে ঠেকে, আপনি যদি একটু মীমাংসা করে দেন। লোকে বলে আপনি ঈশ্বরলাভ করেছেন, আপনিই ভগবান। তবে কেন আপনি ভবতারিণীর দোহাই দিয়ে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ? কিছু বলবার সময় 'আমি' কথাটা উহ্য রেখে বলেন 'ভগবান' 'ঈশ্বর' 'মা,' 'তিনি,' 'তুই' ? 'সোহহং' যদি হলেন তবে কেন ঈশ্বরকে বলেন তুই বা তুমি ?"

"এইসব আচরণ সবশেষের কথা।" ভাবমুখে বললেন তিনি। তাঁকে দেখেছি তাঁকে ছুঁয়েছি। অখণ্ড সচ্চিদানন্দে ছিলাম। কিন্তু সেই নিরাকার অদ্বৈত অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকা যায় না বলে নেমে এসেছি দ্বৈতর জগতে, আমি-তুমির মধ্যে। নিত্য থেকে লীলায়। নিত্য বা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অবস্থা – তার তো কূল-কিনারা নেই, সে যে কী তা মুখে বলা যায় না। মুখে বলতে গেলেই সীমা বা সাকার এসে যায়। তখন তুমি, তিনি, মা। যেমন সপ্ত স্বর। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি। 'নি'-তে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। আবার সা-তে নামতে হয়। নির্বিকল্প সমাধি থেকে নেমে যেই কথা ফুটল, অমনি 'সা', সাকার ঈশ্বর।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

সাম্প্রতিক এক দীক্ষা প্রসঙ্গে

দীক্ষা বিষয়ে খুঁটিনাটি কিছু তথ্য দিতে গিয়ে অল্পদিন পূর্বে আমার জনৈক বন্ধুর দীক্ষা প্রসঙ্গে কিছু বিবরণ দেবো। আমি আমেরিকায় ছিলুম বলে বারো বছর আমাদের কোনো দেখাসাক্ষাৎ বা যোগাযোগ ছিল না। আমি জানতুম না সে সংসার ত্যাগ করেছে, জানতুম না ঈশ্বর লাভের জন্যে সে অধ্যাত্মচর্চায় নিরত। তাই একদিন যখন তাকে ব্রহ্মচারীর বেশে দেখলুম, অবাক হয়ে গেলুম। কলকাতা থেকে খেয়া নৌকোয় আমরা বেলুড় মঠের দিকে যাচ্ছিলুম, তখনই এই দেখাসাক্ষাৎ। আনন্দ ও বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কেটে যাবার পর আমি বন্ধুর মুখটি ভালো করে লক্ষ্য করলুম। তার চোয়ালটি চৌকো ধাঁচের, কপালের দু-পাশটি সংকীর্ণ ললাট, জুলজুলে চোখ আর ছোট্টো একটি বড়ি-নাক—এসব সত্ত্বেও তার মুখটি মিষ্টি লাগল। পাতলা ঠোঁটের কোণে মিষ্টিভাবটি লেগে আছে। এই আবিষ্কারে আমি ততদূর বিস্মিত হলুম, শিকারী ঈগলের বাসায় শান্তশিষ্ট ঘুঘু পাখিটিকে দেখলে যেমন কেউ বিস্মিত হয়।

মঠের ঘাটে নৌকো লাগল। নৌকো থেকে নেমে আমরা মাঠ দিয়ে হাঁটতে লাগলুম। তখন তাকে অনেক কথা জিগ্যেস করার সময় ছিল না। কিন্তু একটি করলুম। মাস দুয়েক বাদে এক সকালে সে আমার ঐ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল সেই সঙ্গে আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর।

প্রায় পাঁচটা হবে, সবে ভোর ভোর হয়েছে, এমন সময় তার আহ্বানে তার সঙ্গে একটা ঝোপঝাড়ের বাগানে গেলাম। জংলা ফুলের মিষ্টি গন্ধ আর পরিত্যক্ত ফলমূলের জঙ্গল পেরিয়ে আমরা ছোট্টো একটা বেড়ার ধারে পৌঁছলাম। সেখানে কলাগাছের নিচে একটি বড় পাথর। বন্ধু আমাকে পাথরের উপর বসতে বলে নিজে আমার সুমুখে ঘাসের উপর বসে পড়ল। নানা জাতের পতঙ্গের গুনগুনানি আর সকালের ক্রমবর্ধমান তাপ নিয়ে জায়গাটি এমন নির্জন যে আমদের কথাবার্তায় কোথাও কোনো বিঘ্নের সম্ভাবনা ছিল না।

বন্ধুটি প্রথমে কোনো কথা কইল না। মিনিট পনেরো চোখ বুজে তন্ময় হয়ে রইল। এই ফাঁকে আমি তাকে দেখতে লাগলুম। তার গায়ের রংটি শ্যামলা, ললাট উন্নত। ব্রহ্মচারীদের মতো চুল কদম-ছাঁট। নাক আর কান একেবারে সাধারণ লোকের মতো, বিশেষত্বহীন, বরং যেন একটু বেশি থ্যাবড়া। কিন্তু তার হাত দু'খানি? কোলের উপর পড়ে আছে তার হাত দুটো। আহা, কী লম্বা, আর ফুলের মতো কী সুন্দর, ছিমছাম। হস্তরেখাগুলো

লক্ষ্য করে দেখলুম, কোনোটা সোজা কোনোটা এদিক-ওদিক গেছে, কিন্তু কী গভীর, যেন খোদাই করা। আঙুলের ডগাগুলো যেন তীব্র স্পর্শবোধের শিখর।

আমি চুপচাপ এইসব দেখছিলুম, এমন সময় সে চোখ খুলে আমায় দেখল। আমার একটু অসোয়াস্তিভাব লক্ষ্য করে সে বলতে লাগল : "ছাখো, যখন প্রথম এই মঠে প্রার্থনা করতে আসি, তা সে প্রায় বছর এগারো হবে, তখন আমার বাবা অসুখে শয্যাশায়ী। তখন জানতুম না কেন আমি বারংবার মঠে আসি। তার ছ'মাস আগে মা মারা যান, আমি একমাত্র ছেলে, বাবার দেখাশোনার সম্পূর্ণ ভার পড়ল আমার ওপর। কিন্তু সে-দায়িত্বভার যে কী কষ্টের তা আর কী বলব। তবে মানুষ তো অবস্থার দাস, আমিও ধীরে-ধীরে সব কিছু মানিয়ে নিলুম। কিন্তু প্রায়ই ক্লান্তি ও অবসাদে মুহ্যমান হয়ে পড়তুম। এমনি এক অসহ অবস্থায় একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণের মঠে প্রার্থনা করতে এলুম। ওখানে প্রার্থনা ও সন্ধ্যারতির পর নতুন শক্তিসঞ্চার অনুভব করে বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু এক সপ্তাহ না যেতেই আবার যেমন-কে তেমন। কোথায় সেই মনঃশক্তি, কোথায় আনন্দ? সব যে ফুরিয়ে গেল! আবার মঠে এসে প্রার্থনা করলাম। মনঃশক্তি ও আনন্দে অন্তর পূর্ণ করে আবার বাড়ি ফিরলাম।

"এইভাবে তৃতীয় কি চতুর্থবার যখন আসি তখনই একদিন হঠাৎই দেখা হয়ে গেল আমার গুরু স্বামী ব-র সঙ্গে। তিনি আমার বাবার বন্ধু। তাই দেখা হতেই বাবা কেমন আছেন সে-সব বিষয়ে জিগ্যেসবাদ করলেন। তারপর যখন বাবার গুরুতর অবস্থার কথা জানিয়ে বিশদ বললাম, তিনি বললেন : 'অসুবিধে বোধ করলেই আমার সঙ্গে এসে দেখা করবি।' তুমি তো জানো গুরুজীর কণ্ঠস্বর কেমন গমগমে ছিল, ঠিক যেন ঘণ্টাধ্বনির মতো। তাঁর কথাগুলো আমার কাছে আদেশের মতো মনে হয়েছিল। সে যাক, পনেরো দিন বাদে বাবার অবস্থা ভালোর দিকে গেল। শিগগিরই আপিসের কাজে যোগদান করতে পারবেন বলে বাবার মনে হলো। আমি চটপট মঠে এসে স্বামীজীকে এই সু-সংবাদ দিলাম। তিনি শান্তভাবে শুনলেন। তারপর আমার বকবকানি থামলে তিনি আমাকে শুধোলেন : 'তোর ব্যাপারটি কী? জীবনে কি করতে চাস?'

"আমি বললাম : 'আজ্ঞে, আমি তা ঠিক জানিনে। বাবা তো আমাকে বিয়ে দিতে চান।'

"আর তুই? তুইও কি তাই চাস?'

"কিছুক্ষণ তাঁর কথাটা একটু তলিয়ে নিয়ে বললাম : 'না, আমি তা চাইনে।'

" 'যা, ঠাকুরের বেদীর কাছে গিয়ে একটু ধ্যান কর। ওখানে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বোধ হয় কেউ যাবে না।'

"আমার মনে হলো তিনি আমাকে চটপট বিদায় দিলেন। কিন্তু তাঁর আদেশ

আমার মনে ধরল। তাই মন্দিরের অভ্যন্তরে বেদীর কাছে গিয়ে তদ্গতচিত্তে বসে থাকলুম। ক্রমে সন্ধে হলো, মঠের একজন সন্ন্যাসী এলেন সন্ধ্যারতি করতে। আমি উঠে বাইরে গেলাম। খেয়া নৌকোয় বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমার স্পষ্ট বোধ হলো আমার জীবনের গতি সন্ন্যাসের পথে।

"পরদিন নানা খবরাখবর দেবার সময় বাবাকে বললাম, আমি বিয়ে করব না, সমাধি লাভের জন্যে সাধকজীবন যাপন করব। আমি তাঁর কাছে সংসার ত্যাগের অনুমতি চাইলাম। সম্প্রতি আমার যা-যা অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি হয়েছে তিনি জানতে চাইলে সব তাঁকে বললাম। সব শুনেটুনে বাবা বললেন : 'কালকেই স্বামিজীর কাছে চলে যা। বলবি, আমি তোকে সংসার ত্যাগের অনুমতি দিয়েছি।'

"সুতরাং পরদিন সকালবেলাতেই চলে গেলাম মঠে। কিন্তু স্বামিজী মঠে নেই। গোটা সপ্তাহের প্রত্যেক দিন মঠে গিয়েও তাঁকে পাওয়া গেল না। শেষে দশদিনের মাথায় মঠে গিয়ে থাকলাম, সকাল থেকে সন্ধে। রাত আটটা নাগাদ স্বামিজী ফিরলেন। তিনি এক দেওয়ানি মামলায় সাক্ষ্য দিতে আদালতে গিয়েছিলেন।

"ঘাটের চাতালে বসে তিনি আমাকে বললেন : 'আদালতে আমি সত্য কথা বললুম, কিন্তু উকিলরা আমাকে বিশ্বাস করলেন না। শকুনীর মতো তারা মৃতদেহের কাছে এসেও ভাবে লোকটা মরেনি, মরার ভান করছে। মৃত্যু কী একটা পশুও জানে, তবু সন্দেহ মৃতদেহটা যদি লাফিয়ে উঠে একটা অনর্থ ঘটায়। উকিলরা আসল ব্যাপারটা জেনেও জেরার পর জেরা করে। এইভাবেই তারা অভ্যস্ত। সত্যকে জানলেও সত্যকে স্বীকার করার সাহস নেই তাদের।

"এরপর বাবা স্বামিজীকে বলবার জন্যে যা বলে দিয়েছেন আমি তাই বললুম। তিনি শুনে চুপ করে রইলেন। ভাঙা চাঁদের আলোয় তাঁর শান্ত ও সৌম্য চেহারা ফুটে উঠল। উদাত্ত কণ্ঠে নয়, অনেকটা ফিসফিসিয়ে তিনি অনেক কথা বললেন। শেষে বললেন : 'ঠিক আছে, পরের মাস থেকে তোকে ব্রহ্মচারী করব। ইতিমধ্যে তুই বিষয়টা ভালো করে ভেবে দেখিস।' উঠতে যাচ্ছি তখন বললেন : 'তোর বাবা তো তোকে মুক্তি দিলেন, তুই তাঁকে কী দিবি ?'

"আজ্ঞে, আমি, আমি তাঁকে— ?'

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী দিবি ? তিনি যদি নিঃস্বার্থ হন, নিষ্কাম হন, তাহলে তোকেও তো তা-ই হতে হবে! সংসারের নিয়ম তো তা-ই।'

"আমার মুখে একটাও কথা সরলো না। চুপ করে রইলাম। তারপর নিঃশব্দে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে চলে গেলাম। যেদিন ব্রহ্মচারীর দীক্ষা, তার দিন দুই আগে একদিন মন্দিরের ভেতরে গিয়ে বেদীর কাছে সারাটা বিকেল ধ্যান করলাম। (হঠাৎ সত্যের নির্দেশ পেলাম)। আমি স্বামিজীকে

গিয়ে বললাম: 'যতদিন আমার বাবা জীবিত থাকবেন আমিও ততদিন তাঁর সেবার জন্যে ব্রহ্মচারী অবস্থায় থাকব।'

"স্বামিজী আমার কথা শুনে বললেন: 'বেশ! তোমার কথা শুনে খুশি হলুম। যেমন বলেছি, আমি তোমাকে এখন কেবল প্রাথমিক দীক্ষা দেবো। তারপর থেকে প্রায় বছর দশেক তুমি অধ্যয়ন করবে, সাধন-ভজন করবে, যতদিন না শেষ দীক্ষার জন্যে উপযুক্ত হও। এই বছর দশেক আমাদের এখানে না-থেকে তুমি তোমার বাবার কাছে থাকো, তাঁর সেবাযত্ন করো, আমি তোমাকে এই অনুমতি দিচ্ছি। এই সময়টায় যদি বিয়ে করতে চাও, বিয়ে করতেও পারো।'

"দশ বছর পর আমি আবার স্বামিজীর কাছে ফিরে গিয়ে বললাম: 'বাবা এখন সুস্থ। তিনি আমাকে সংসারত্যাগের তাগিদ দিচ্ছেন। বলছেন, তাঁর প্রতি যদি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে তবে এ-ব্যাপারে যেন একটুও দেরি না-করি। আমি আসছে সপ্তাহে সন্ন্যাসদীক্ষা নিয়ে নেবো।"

আমি জিগ্যেস করলাম: "তুমি যে ব্রহ্মচারীর প্রাথমিক দীক্ষা নিয়েছিলে সে কী?"

"আচ্ছা, সে পরের সপ্তাহে বলব।" বন্ধুর উত্তর।

প্রায় পাঁচদিন পর তার দীক্ষা হলো। গেরুয়া ধারণের পর তার চোখে-মুখে যে দীপ্তি দেখা গেল তা অপূর্ব।

সেই সময়কার বাদবাকি ইতিবৃত্ত সে আমাকে ঐ পোড়ো বাগানে বসে বসে বললে। গল্পগাছায় গোটা দিনটাই গড়িয়ে গেল।

বন্ধু বললে: "স্বামিজীর কাছে ব্রহ্মচর্য নেয়ার পর আমি শপথ নিলাম যে আমার জীবনে ব্রহ্মচর্য, সত্যবাদিতা ও পবিত্রতা কায়মনোবাক্যে পালন করব। তারপর তিনি আমাকে তিনটি ধ্যান দিলেন। সে-সব বুঝিয়ে বলা ভারি মুশকিল। চেষ্টা করে দেখলে হয়...যেমন ধরো গোটা জীবনটাই তোমার পবিত্রতার প্রতিমূর্তি, এই রকম একটা ধারণা হলো। তখন তোমার শরীর থেকেই পবিত্রতার সুগন্ধ বেরোবে; শুধু মস্তিষ্কের প্রতি কোষে নয়, হৃদপিণ্ডের তালে তালে নয়, এই পবিত্রতার ঘ্রাণ তোমার শরীরের রোমকূপ থেকে বেরিয়ে আসবে। মস্ত বড় যোগী যাঁরা, ধ্যানের সময় তাঁদের তো ঘামের ভিতরেও সেই সুগন্ধ পাওয়া যায়।

"দ্বিতীয় ধ্যানটিও অনুরূপ। ধরো, তোমার ধ্যানের মধ্যে তোমার ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলোকে এমন এক স্তরে ত্বরান্বিত করলে যেখানে তোমার গোটা জীবনটাকেই বোধ হবে 'অহেতুকী দয়াসিন্ধু'। কার্যকারণহীন ভক্তি-ভালোবাসার মহাস্রোত। এইভাবে দু-এক বছর গেলে চিত্তটি হবে প্রশান্ত সরোবর। মনটি হবে স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। তখন তোমার সকল কার্য—খাওয়া-দাওয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো শারীরিক ক্রিয়াগুলি পর্যন্ত—হবে গভীর বিশুদ্ধতার অভিজ্ঞান। কোনো উত্তেজনা বা দুশ্চিন্তা ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

নাড়ির স্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া স্তিমিত হয়ে আসে। কর্মে আসে ভালোবাসার টান—অহেতুকী ভালোবাসার।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের পর প্রবল বোধশক্তির অধিকার জন্মে। তখন সকল প্রকার প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও কর্তব্যকর্ম সম্পাদন হয় সহজ ও মসৃণ। সূক্ষ্মতম অভিজ্ঞতা হয় বোধগ্রাহ্য। মানুষের চিন্তায় ভাবনায় যেসব কথার আনাগোনা তা স্পষ্ট ধরা পড়ে, শোনা যায় নৈঃশব্দের বাণী।

"একেবারে শেষের ধ্যানটিতে শেখানো হয়: 'যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতা, এমন কি প্রেমের শক্তিও ত্যাগ করলুম।' এটা কঠিন। এটা রপ্ত করতে আমার পাঁচ বছর লেগেছিল। আপনাকে বর্জন করা বরং সোজা—কিন্তু যেসব চিন্তা ও অভ্যাস আমার অচেতন মনে আছে তাকে বর্জন করা? সে ভারি কঠিন ব্যাপার। এমনকি স্বপ্ন, ক্ষমতাবোধ ও অলৌকিকত্বের গন্ধ থেকে স্বপ্নকেও মুক্ত রাখতে হবে। সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমাত্মার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ—এই হলো শিক্ষা ও সাধন। কিন্তু এটা একলা করা যায় না, সাধন-ভজনের সঙ্গে সহায়করূপে গুরুও সক্রিয় থাকেন—তা তুমি বাড়িতে বা যেখানেই থাকো, আর গুরুজী থাকুন মঠে বা অন্যত্র, তাতে কিছু এসে যায় না। ক্রমশ এটাও বেশ বোঝা যায়, কেবল গুরুজী নন, অন্যেরাও, যাদের তুমি চেনোনা জানোনা, তাঁরাও তোমার সাধন-ভজনে সাহায্য করছেন। এঁরা কারা? এঁরা জীবনের spiritual forces বা আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতিভূ। পাপকর্মে যেমন পাপশক্তি সন্নিকটস্থ হয়, তেমনি নিঃস্বার্থ কল্যাণকর্মে যত্নবান হলে কল্যাণীশক্তি সহায়ক হন। অদৃশ্যলোকের এই পারস্পরিক সহায়তার শিক্ষাই চরম শিক্ষা। এইভাবে আপনার ঐকান্তিক কঠোর সাধনা ও উপরের সহায়ক শক্তির সম্মিলিত প্রয়াসে নিত্যসত্যের দ্বারদেশে পৌছনো যায়। এমন অবস্থা যখন হয় তখনই গুরুর আহ্বান আসে পরম দীক্ষার জন্যে। মনঃসংযোগের ক্রিয়াকে সংহত করে ক্রমশ ধ্যানের দিকে নিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলে গুরুর সঙ্গে একসঙ্গে বসে ধ্যানাভ্যাস করতে হয়। ধ্যানের শেষ পর্বে সাধুরা আসেন সাক্ষী হিসেবে। তাঁরাও সেই পরম সত্যবস্তুর ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন; সাধক ক্রমশ আপন অন্তরের অভ্যন্তরে 'তৎ'-এর উপস্থিতি উপলব্ধি করে। যেন ভক্তির প্রবল টানে ভক্তের অন্তরে তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখাবেন বলে জগদীশ্বর নেমে আসেন। ঠিক সেই পরম লগ্নে সাধকের মেরুদণ্ডের মধ্যিখানে তর্জনী স্পর্শ করেন গুরু, ছিন্ন করেন মায়ার আবরণ। অমনি এই মরদেহের অভ্যন্তরে অমৃতের স্বরূপ দর্শন হয়। আলো, আলো—যেদিকে তাকাও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভাস্বর জ্যোতিঃসমুদ্র। রাস্তার ধুলো থেকে আকাশের পাখি, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও দৃশ্য প্রাত্যহিকতার পোশাক বদলে মধুময় হয়ে ওঠে। তখন চিরপরিচিত বস্তু আর বস্তুমাত্র নয়, বস্তুর আনন্দময় সত্তা।"

এই পর্যন্ত বলে বন্ধু থামল। কোনো কথা নেই, সে আর এখন কথা কইবে না। আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা নিঃসীম স্তব্ধতা নামল। আমিও নিঃশব্দে অপেক্ষা করে রইলুম। অনেকক্ষণ এইভাবে চুপচাপ থেকে এক সময় আমার মনে হলো, এখন কিছু বললে অসুবিধা হবে না। তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ তার কাছে উত্থাপন করলুম। —"এতক্ষণ যা বললে তার জন্যে ধন্যবাদ। সত্যি বলতে কি, তোমার দর্শন বা মননের চেয়ে আমার কাছে আরো বেশি আগ্রহের বিষয় তোমার অনুভূতি কী রকম?"

"অনুভূতি?" বন্ধুর কণ্ঠে হতবুদ্ধির ভাব।

"হ্যাঁ, তাই।" আরো বিশদ করে শুধোলাম: "মানে, সুখী কি অসুখী, কী রকম বোধ হয় তোমার? সংসারের পাঁচজনের মধ্যে তুমিও একজন, না কি বিচ্ছিন্ন, কোনটা মনে হয়? কোনো দুঃখের অভিঘাত অথবা—"

"বুঝেছি, বুঝেছি।" সে সানন্দে বলে উঠল: "বুঝেছি কী বলতে চাও। তা ছাখো, যদিও আমি খুব সুখী তবু দুঃখকষ্টের চেতনাও আমার মধ্যে প্রবল। স্বার্থ ও হিংসায় মত্ত হয়ে একজন আরেকজনকে কষ্ট দেয়, এ-বিষয়ে আমি বেশ সজাগ। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝিয়ে বলতে গেলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি ঘটনাকে বলতে হয়। তাঁর সাধনসিদ্ধির প্রথম দিকে, তখনো সংহত শক্তির পূর্ণ রূপটি তাঁর মধ্যে অপ্রকাশিত, এই রকম সময়ে তিনিও আর-পাঁচজনের সুখদুঃখের সঙ্গে এমন একাত্ম ছিলেন যে অন্যের সুখ-দুঃখের চিহ্নগুলো তাঁর মধ্যে স্পষ্ট দেখা যেত। যোগযুক্ত হয়ে একদিন তিনি গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, ঘাটে একটি নৌকো বাঁধা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জন মাঝির মধ্যে প্রবল ঝগড়া বেধে গেল। ঝগড়া থেকে মারামারি। একজন আরেকজনকে বেদম প্রহার করল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি অন্তত বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন। কালীঘরে ছুটে গিয়ে মাকে বললেন: 'মা গো, ওদের ঐ ঝগড়ার হুল আমার শরীর-মন থেকে তুলে নে। আমি যে আর 'সইতে পারছিনে'! তাঁর ভাগ্নে হৃদয় তাঁর আর্তনাদে ছুটে গিয়ে এদিক-ওদিক দেখে শেষে, কালীমন্দিরে গিয়ে শোনে তাঁর মামা কেঁদে কেঁদে মাকে বলছেন: 'মা, সংসারের এই ঝগড়া-কলহ জ্বালা যন্ত্রণা দূর করে দে। মুক্ত কর, মা, মুক্ত কর।' তারপর হৃদয়কে দেখে তিনি থামলেন, আপন শরীরে আঘাতের চিহ্নগুলো দেখালেন তাকে। হৃদয় বলে, ঠাকুরের সেই কালশিরে-পড়া ভয়ংকর দাগড়া-দাগড়া দাগগুলো সে কখনোই ভুলতে পারে না। হৃদয়ের মতে ঠাকুর একই কালে আনন্দ-বেদনা দুঃখ-কষ্টের পূর্ণতার মধ্যে থাকতেন। এই যে আপাত-বিরুদ্ধ একটা অবস্থার কথা বলা হলো, এটা কি তুমি বুঝতে পারো? তাঁর বহুবিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও বিশাল অনুভূতি, তার কণামাত্র যদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারো তাহলে আমারটাতো সে-তুলনায় কণার কণা! জানতে চাও

আমার অনুভূতি ? কি জানো, আনন্দে আমি এমন ভরপুর থাকি যে জীবের সকল দুঃখ-কষ্ট আমার নিজের বলে বোধ হয়। তাদের সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও একাত্ম হয়েও আমি আলাদা। একদিকে তাদের যন্ত্রণা অনুভব করি, অন্যদিকে তাদের নাগালের বাইরে পরম আনন্দে থাকি।

"এই যে একটা অবস্থার কথা বলা হলো, শঙ্কর তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। 'আকাশে মেঘের মতো প্রবুদ্ধ মনে কত অভিজ্ঞতার আনাগোনা। কিন্তু মেঘের কালিমা নির্মল নীল আকাশকে মলিন করে না, প্রবুদ্ধ মনের প্রশান্তি তেমনি সংসারের দুঃখ-কষ্টে বিনষ্ট হয় না।'

"সাধুরা শোক-তাপ জয় করেন বলে শোক-তাপ সাধুকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। সাধারণ লোকের সঙ্গে সাধুদের তফাত এই যে, সাধারণ লোকেরা দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তির উপায় খোঁজে বাইরে থেকে, আর সাধুরা তা থেকে উত্তীর্ণ হন অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তঃশক্তির জোরে।"

বন্ধু তো খুব সহজে তার কাহিনী বলে গেল, তবু সে চলে যাবার পর আমার মনে অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এলো। কে দেয় তার উত্তর ? সৌভাগ্যক্রমে দু-একদিন বাদে আরেকজন বৃদ্ধ সাধুর সাক্ষাৎ পেলাম যিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমার ভার লাঘব করলেন। এবার সেই কাহিনীচিত্রটি তুলে ধরি।

গ্রীষ্মের কোনো এক রাত্রি। পরিষ্কার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাশি নিচে নেমে এসেছে। পেছনে কুয়াশার মতো মিহি ও রূপোলি আস্তরণ, সুমুখে স্বর্ণচূর্ণের মতো আলোর নাচন; কালচে নীল আকাশে উঠছে, ফুটছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। আকাশের কত নিচে নক্ষত্ররাশি আর কত দূরে আকাশ! পায়ের কাছে কলস্বরা গঙ্গা, বহুদূর অন্ধকারে কোথায় বয়ে চলেছে।

আমার পাশে যিনি বসে আছেন তিনি বৃদ্ধ। দিনের বেলা তাঁর পাকা চুল ও তোবড়ানো গাল দেখেছিলাম। বিকেলবেলা তিনি ক্লাসে ভাগবত ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছিলেন। সেই ব্যাখ্যা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেই কারণেই তাঁকে আমি গঙ্গার ধারে নিয়ে এসেছি। আমি তাঁকে সাধারণ দীক্ষার কথা, বিশেষত তাঁর নিজের দীক্ষার কথা—জিগ্যেস করলুম। "আপনার পক্ষে এই দীক্ষার ফল কী হয়েছিল ?" না-শুধিয়ে পারলুম না।

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। একেবারে প্রথম থেকে শুরু করা যাক।" বললেন তিনি। "তুমি তো দীক্ষার পরম পরিণতিটাই আগে জানতে চাও।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" স্বীকার করতে হলো আমাকে। "অখণ্ডকে উপলব্‌ধি করবার সাধনায় গুরু কেন প্রথম থেকেই শিষ্যকে সাহায্য করেন ? মানুষের নিজের চেষ্টা বলে তো একটা কথা আছে, সে কেন আপন চেষ্টা ও প্রযত্নে তা অর্জন করবে না ?"

স্বগতোক্তির মতো বৃদ্ধ প্রথমে বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। তারপর শুরু

করলেন: "আপন চেষ্টা ও সাধনায় ঈশ্বরলাভই সাধকের জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁকে যে লাভ করবে আগেভাগে তাঁর সম্পর্কে টুকিটাকি কিছু-কিছু ইশারা-ইঙ্গিত তো চাই। ঈশ্বরভূমির প্রাথমিক খুঁটিনাটি বিষয় দীক্ষিতের চোখ খুলে দেয়াই হলো আমাদের দীক্ষার প্রণালী। কার সাহায্যে কী হলো বড় কথা নয়, দীক্ষিতের অন্তর্দৃষ্টি যদি একবার খুলে যায় তবে সে নিয়ত সে-দৃষ্টির জন্যে কাতর হবেই। আর এই কাতরতা তাকে ঈশ্বর পথের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ে যেতে বাকি জীবনটা কামনা-বাসনার সংসার থেকে ঊর্ধ্বমুখী করবে। মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য এই যে ঝকমকে শস্তা সংসার, এই সংসার তখন আর তাকে ভোলাতে পারবে না। ঈশ্বরমুখী এই দর্শনের ক্ষমতা এত অধিক বলেই সে নিরাপদ। এইজন্যে সাময়িকভাবে হলেও শিষ্যের মধ্যে ঈশ্বরবোধের ঝলকানি যে-গুরু দিতে অপারগ, শিষ্য করা ও তাকে শিক্ষা দেওয়ার অধিকার তাঁর নেই।"

আমি আবার প্রশ্ন তুললুম: "আচ্ছা, সত্যিকারের সাধু যিনি তিনি কি কেবল স্পর্শ দ্বারা কারো মধ্যে ঈশ্বরবোধের অভিজ্ঞতা এনে দিতে পারেন?"

"না, না, তা নয়। আধারভেদ আছে। কারো আধার তৈরি হয়েই আছে, কারো বা কাঁচা।" বৃদ্ধ সাধু প্রসঙ্গটি বিশদ করলেন: "এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণও কোনো-কোনো আধারে তা পারেন নি। একসময় কবিরাজ নামে একজন তাঁর কাছে আসত। কবিরাজ প্রকৃতই কবিরাজ, রসায়ন ওষুধ-বিষুধে পাকা। সে প্রায়ই এসে ঠাকুরের কাছে সাধন শিক্ষার জন্যে বায়না ধরত। কিন্তু এতে রামকৃষ্ণদেব বড় একটা সাড়াশব্দ করতেন না, চুপচাপ থাকতেন। তাই কবিরাজ একদিন বললে—'আপনি আমাকে একটু ছুঁয়ে দিন না।' একই কথা পঞ্চাশ বার বলতে লাগল। শেষে হলো কী, ভাবস্থ হয়ে ঠাকুরও রাজি হয়ে গেলেন। কবিরাজের মেরুদণ্ডের মধ্যিখানে তর্জনী স্পর্শ করে দিলেন। আর যায় কোথা। কবিরাজ চিৎকার করে যন্ত্রণায় লাফাতে লাগল। সে এক ভীষণ দৃশ্য। মনের প্রচণ্ড উল্লাসে শরীর ক্লিষ্ট হয় বটে, কিন্তু মনের নিদারুণ যন্ত্রণায় যখন আক্ষরিক অর্থে আর্তনাদ বেরোতে থাকে, সে বড় অসহ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি কবিরাজকে টেনে নিয়ে তার শরীরে হাত ঘষতে লাগলেন। কবিরাজ আবার যেমন-কে তেমন। তখন তিনি বললেন: 'বাপু, এ-জন্মে আর হলো না। আনন্দের স্পর্শ তোমার কাছে সাপের মতো। তোমার এখনো সময় হয়নি। যদ্দিন বাঁচো তাঁর নাম করে যাও, তাঁর শরণ নাও। তারপর যখন সময় হবে, এই খোলটা না-থাকলেও, ভগবান স্বয়ং এসে তোমায় দীক্ষা দেবেন।"

তখন আমি বৃদ্ধকে আরেকটা কথা জিগ্যেস করলুম: "এই-যে ছোঁয়া, পরম স্পর্শ এও কি এক রকম সম্মোহন নয়", মনে হলো তিনি ঠিক এই ধরনের প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিলেন না। বহুক্ষণ কথাটা বিচার করলেন মনে মনে। তারপর প্রায় মিনিট পনের বাদে বলতে লাগলেন—

"গুরুর অমিয় স্পর্শ আর সম্মোহন—এ দুয়ের বিস্তর তফাত। সম্মোহন কী? না, একজনের ইচ্ছাশক্তি অন্যের ওপর প্রয়োগ। আর দীক্ষার পথে শিষ্যের ইচ্ছাশক্তিকে আচ্ছন্ন না-করে বরং আপন সাধন-ভজনে তাকে বাড়িয়ে দেয়া হয়। শিষ্য একান্ত প্রার্থনা ও ধ্যানে লেগে থাকে। তার শ্বাসক্রিয়া চলে স্বচ্ছন্দে কিন্তু অত্যন্ত ধীরগতিতে। ক্রমশ তার চিত্ত যে প্রজ্জ্বলিত হয় সেটা কোনো বাইরের অনুষঙ্গ থেকে নয়। নিজেই সে অন্তরের গভীরে যেতে থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মায়ার আবরণ ভেদ করে করে চলে যায় অরূপের রাজ্যে। ধ্যানস্থ গুরু নিকটেই উপবিষ্ট, তিনি শিষ্যের এই পরিপক্ক সুন্দর অবস্থায় তাকে স্পর্শ করেন। ঠিক সেই মুহূর্তে শিষ্য তার আপন সত্তায় সমগ্র চরাচরের সারবস্তু জগজ্জননীকে দর্শন করে। মোদ্দাকথা, গুরু-শিষ্যের এই সমগ্র প্রণালীর মধ্যে বাইরের কোনো অনুষঙ্গের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। আর গুরুর পরম স্পর্শে শিষ্য তার চেতনাও হারায় না। বরং বলা যায়, চারদিকের নরনারী পশুপাখি গাছ-পালার মধ্যে যে সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার খেলা চলে, গুরুর অমিয় স্পর্শে সে-শিষ্যের চেতনা আরো তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সম্মোহনের অবস্থা থেকে কত তফাৎ ছাখো!

"জ্ঞানের পর মানুষ চৈতন্যময় হয়, চরাচরে সৎ ও নিত্যবস্তুকে দেখতে পায়। তখন তার ইচ্ছা মানেই ইচ্ছাশক্তি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে একাত্ম। বিচারবোধ তীক্ষ্ণ, আস্বাদন নির্ভুল, মানসিক গঠন সত্ত্বগুণাশ্রয়ী এবং দর্শন-ক্ষমতা অসীম।"

বৃদ্ধ সাধু মহারাজ থামলেন। তালের পাতায় মর্মরধ্বনির উচ্ছনাদ, পায়ের কাছে খরস্রোতা গঙ্গার খিলখিল কল্লোল—সবটা মিলিয়ে কেমন একটা অদ্ভুত পরিবেশ। হঠাৎ একটা পেঁচার ডাকে চমক লাগে। সেটা উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। তখন একটু ভেবে নিয়ে সন্তর্পণে আমি আমার শেষ প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিলাম: "আজ্ঞে, জ্ঞানের পর মানুষের কী রকম হয় সেটা বুঝলুম। কিন্তু জ্ঞান ও সমাধির মধ্যে পার্থক্য কী?"

বহুদূরে লক্ষ-কোটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন বৃদ্ধ। তারপরে দক্ষিণের অতিদূর শহরের দিকে। সেখানে মিটমিট করছে অসংখ্য আলোর মালা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন: "জ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞান কথাটা অস্পষ্ট। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির তিনটি পর্যায়ের কথা স্মরণ করো। প্রথম পর্যায়ে মন কী করে? সচ্চিদানন্দের স্তবস্তুতি করে আনন্দ পায়। কিছুই কামনা না-করে এই স্তবগানেই তার পরিপূর্ণ তৃপ্তি। জীবজগতের সব-কিছুর সঙ্গে ঈশ্বরকে মিলিয়ে নেয়।—

"তুমি আমাদের সকল পথের পন্থা,
কোনো পথ যাঁর নাগাল পায় না—

তুমি আমাদের সেই ধ্রুবলক্ষ্য।
সমুদ্রের বুকে নদীর মতো
আমাদের সকল বিধি-বিধান যেখানে লয় হয়,
তুমি সেই পরম বিশ্ববিধাতা।
দৃশ্য ও অদৃশ্য জীবজগতের
তুমিই তো অন্নদাতা ও ধাতা ;
তবু তুমি ভক্তি-প্রেমে ক্ষুধার্ত ;
শান্তি, শান্তি, শুধু শান্তির জন্য
তোমার তৃষ্ণার শেষ নেই।
যদিও তুমি দেশ-কালের অতীত
অনাদি ও অনন্ত,
তবু তুমি আমার আর্তিতে দীর্ণ হও,
বিদ্ধ হও আমার দিগন্তজোড়া আনন্দে।"...

"এইটেই জ্ঞানের প্রথম ধাপ।" বৃদ্ধ সাধু বললেন। "দ্বিতীয় ধাপে উঠে সাধকের আর ঈশ্বরবোধ থাকেনা, সুতরাং স্তবস্তুতি আর থাকে কী করে। সাধক তখন আপনাকে ঈশ্বরের অংশরূপে ভাখে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা থাক, তিনি সর্বদাই বিরল ব্যতিক্রম। কিন্তু সাধারণত গুরুর স্পর্শ শিষ্যকে এতদূর পর্যন্ত উত্তীর্ণ করে দিতে পারে, অর্থাৎ এই দ্বিতীয় ধাপে। এই অবস্থায়, ঈশ্বরের অংশ হিসেবে, সাধক সকল বস্তুকে চৈতন্যময় ঈশ্বররূপে আপনার মধ্যে বোধ করে। তখন জীবাত্মা ও বিশ্বাত্মা একাকার ও পরিপূর্ণ। যাকে জ্ঞান বল, এ-ই হলো তার বিস্তার। কিন্তু এর পরেও যা আছে তা হলো সমাধি, তার পারাপার নেই। সে-অবস্থাকে মুখে বলা যায় না। মনে করে ভাখো উপনিষদের সেই শ্লোকটি: 'অহং অস্মি প্রথমজ ঋতস্য'—আমি সত্যের প্রথম অজ।* 'কারণ বিশ্বচরাচরের আমিই সারবস্তু। আমি অমৃতস্য নাভি, অমৃতের ধমনী।' সমাধিতে ঐ রকমই হয়। চিন্ময় অভিজ্ঞতার সেটাই সারাৎসার। সমাধি অবস্থায় যদিও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়, মনও নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে সাধক তখন অনেক বেশি জীবন্ত, অধিক প্রাণবন্ত ও চেতনাযুক্ত। কারণ জীবজগতের পালনকর্তা যে-ঈশ্বর সাধক যে তখন সেই ঈশ্বরত্বেই অবস্থিত।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যকে এই রকম সমাধিতেও ঠেলে দিতে পারতেন, পারতেন না?" আমার জিজ্ঞাসা।

"একমাত্র তিনিই পারতেন।" স্বীকার করলেন বৃদ্ধ। "আধ্যাত্মিক জগতে তাঁর তুল্য অপরিমেয় শক্তি কারো ছিল না। অন্য কোনো শক্তিমান মহাপুরুষ

cf: "Before the world was born I am".—Jesus Christ

কেবল জ্ঞানরাজ্যে পৌছে দিতে পারেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কথা স্বতন্ত্র, যে-উচ্চতম ভূমি সমাধি সেখানে তিনি উত্তীর্ণ করেন কেবলমাত্র স্পর্শের দ্বারা। এখন বুঝলে তো?" বৃদ্ধ সাধুটি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এই বলে : "নানা খণ্ড সত্যের সঙ্গে আপনার ঐক্যবোধ—এই হলো জ্ঞান। আর অখণ্ড সত্যের সঙ্গে অভেদ—এই হলো সমাধি।"

দূরে গঙ্গা বইছে। আরো দূরে শহর। উপরে তারাভরা আকাশ। চারদিকে চোখ ফেলে দেখলেন তিনি। বললেন : "অনেক রাত হলো। এখন শোবার সময়। আচ্ছা, এসো তাহলে।" তিনি উঠলেন। উঠতে উঠতে বললেন : "সমাধি উপলব্ধির জিনিস, মুখে বলার জিনিস নয়।" তারপর আকাশে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে আবৃত্তি করলেন : 'হে তামসী রাত্রি, হে অসীমের অনন্ত ইশারা…' যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে ফিস-ফিসিয়ে বললেন : "সমাধিতে যে-অখণ্ডের বোধ হয় সেই অখণ্ডই জীবের খণ্ড সত্তাকে বিশ্বসত্তায় রূপান্তরিত করে। নিত্য নিত্যানাম…"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের অবতার

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবন সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রমাণাদি আমি পাঠ করেছি তার মধ্যে পরলোকগত স্বামী প্রেমানন্দর রচনাই শ্রেষ্ঠ। আমি বেলুড় মঠে যখন যাই তার আগেই তিনি দেহত্যাগ করেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ না-হোক পরোক্ষে তাঁকে জানবার একমাত্র উপায় হলো তাঁর বিভিন্ন রচনা। এইসব রচনায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে যা জানা যায় সে-কথায় পরে আসছি, তৎপূর্বে স্বামী প্রেমানন্দ বিষয়ে দু'এক কথা বলি।

গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বে তিনি ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ। বিবেকানন্দ ও তুরীয়ানন্দর মতো সুদর্শন পুরুষ না-হলেও তাঁর চেহারাটি ছিল বেশ চিত্তাকর্ষক। রোমানদের মতো তাঁর নাক, সুদৃঢ়, মুখাবয়ব ও চৌকো ধাঁচের চিবুক দেখলে তাঁকে কর্মতৎপর ও দৃঢ়চেতা বলে মনে হয়। কিন্তু এই চেহারার সঙ্গে মোটা মোটা ভুরু ও একজোড়া মমতাভরা চোখ বেশ মানিয়ে গেছে। তাঁকে যাঁরা জানতেন তারা বলেন—"ঐ চোখ দিয়ে যখন তিনি কারো দিকে তাকাতেন, ভালোবাসা ঝরে পড়ত।"

যৌবনের প্রারম্ভে প্রেমানন্দর চরিত্রে স্বাধীন বৃত্তিগুলো বিকাশলাভ করে। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন থেকেই দক্ষিণেশ্বরের সাধুর কাছে তাঁর

গতায়াত। মা-বাবার উপদেশ, বন্ধু-বান্ধবদের ঠাট্টা-পরিহাস কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। গুরুর সঙ্গে যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ, সেইদিনেই তিনি প্রেমানন্দকে জিগ্যেস করেছিলেন—"তোর কোন ঘর তা কি তুই জানিস ?" তখনকার মতো প্রেমানন্দ কোনো উত্তর না-করে চুপ করে রইলেন।

মাস পাঁচেক পর এক বিকেলে, মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে প্রেমানন্দ এলেন দক্ষিণেশ্বর। এসে বললেন: "আমার ঘর আমি জানি। মা-বাবাকে সঙ্গে এনেছি, আমি কোন সাধকের আশ্রয়ে থেকে তাঁর সেবা করব তা তাঁরা স্বচক্ষে দেখুন।" সেইদিন থেকে তাঁর ধ্যানের শিক্ষা শুরু হলো। একটানা ছ-বছর। ছ-বছর পর দীক্ষা। পূর্বাশ্রম তাঁর ঘরোয়া নাম ছিল 'বাবুরাম'। আত্মজ্ঞান লাভের পর তাঁর নতুন নামকরণ হলো 'প্রেমানন্দ'।* মহাপ্রেমে যে-আনন্দ তাই প্রেমানন্দ।

সর্বত্র ও সকলের প্রতি তাঁর ভালোবাসা। তবু তা বিশেষরূপে প্রকাশ পেত তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতি। তাদের জন্যে অনেক ঝামেলাও তাঁকে পোহাতে হতো। কেবল তাদের আধ্যাত্মিক সমস্যাবলীর মীমাংসাই নয়, তাদের খেলা-ধূলোর ব্যাপারেও তিনি যৎপরোনাস্তি সাহায্য করতেন। ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠ চাই, যাও তাঁর কাছে, তিনি নির্ঘাত একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। গঙ্গায় বাইবার জন্যে নৌকো চাই, কিন্তু কোথায় এত নৌকো? কিন্তু তাতে কী, যাও, তাঁকে গিয়ে ধরো, মঠ থেকে তিনি নৌকোর একটা ব্যবস্থা করবেনই। এইসব কারণে নবীন যুবকদের কাছে তিনি এত পেয়ারের ছিলেন। প্রেমা-নন্দর বয়স যখন পঞ্চাশ, আমার বয়সী ছেলেরা তখন ষোল কি সতেরো। তবু এই ছেলেদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ছিল ফুটবল টিমের ক্যাপটেনের মতো।

ঐ সময়টায় তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও তাঁর সম্পর্কে যেসব কথা তখন আমার কানে আসত তাতেই তিনি আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে প্রেমানন্দর লিখিত তথ্য প্রমাণাদি বিষয়ে আমি যে গভীর উৎসাহ বোধ করব সে তো স্বাভাবিক। অগৌণে ওগুলোর অনুবাদ কর্মে তৎপর হলাম। পাঠকদের বলা দরকার, প্রেমানন্দর ভক্তি-বিশ্বাস কিছু যেদাটে ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার, এ-বিষয়ে তাঁর প্রত্যয় ছিল সুদৃঢ়। অবতার প্রসঙ্গে বুদ্ধ ও যিশুর সমস্তরে প্রতিষ্ঠিত করলেও বুদ্ধ ও যিশু থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ব যে পৃথক, প্রেমানন্দ সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। প্রেমানন্দর উক্তি: "এখনকার যিনি অবতার তাঁর ভেতর থেকে সর্বাঙ্গীণরূপে ত্যাগের শক্তি বিচ্ছুরিত। ঈশ্বরের প্রত্যেক অবতারের একেকটি বৈশিষ্ট্য আছে। পাঁচ টুকরো রুটি দিয়ে পাঁচ হাজার লোকের উদরপূর্তি,

---

* পূর্বেই বলা হয়েছে, ঠাকুর দীক্ষান্তে কোনো শিষ্যের নামকরণ করেন নি। ঠাকুরের দেহ-ত্যাগের পর শিষ্যরা নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আটপুরে বিরজা হোমের পর সন্ন্যাসনাম গ্রহণ করেন। 'প্রেমানন্দ'ও ব্যতিক্রম নন।

বৃক্ষকে ফলবান করে সেই ফলে অসংখ্য লোককে খাওয়ানো, জলের উপর দিয়ে হাঁটা কিংবা আকাশে উত্তরণ—প্রসঙ্গক্রমে এইসব অলৌকিক ঘটনার কথা মনে করা যেতে পারে।

"কিন্তু এখনকার সর্বশেষ অবতারে এইসব অলৌকিক কাণ্ডকারখানা আমি দেখিনি : না, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অলৌকিক কিছু করেন নি।

"লক্ষ্য করবার আরো একটি বিষয় আছে। আগেকার প্রায় সকল অবতারের অবয়বে ও চেহারায় এমন আশ্চর্য লাবণ্য ও সৌন্দর্য ছিল যা সবাইকে মুগ্ধ করত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের চেহারায় তা-ও নেই। গিরিশ যখন প্রভুকে জিগ্যেস করলেন : 'এবারে কেন দিব্যকান্তি নিয়ে এলে না?' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : 'সাধন-ভজনের সময় মা'কে কাতর স্বরে বললুম, মা, তনুর চাকচিক্য চাইনে, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে, মা।'

"না, চেহারায় তিনি এমন কিছু বরতনু ছিলেন না, মনের দিক থেকে পণ্ডিত-টণ্ডিতও ছিলেন না। অন্যান্য অবতারেরা অল্প বয়সেই কত বড়-বড় বিদ্বান-পণ্ডিতদের তর্কবিতর্কে নাজেহাল করেছেন। নির্বাণ-মুক্তির ব্যাপারে বুদ্ধদেবের বিদ্যাবত্তার তো তুলনা নেই। সন্দেহ কী, সমগ্র উপনিষদের সারবস্তু তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন। আর এই যে আমাদের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, কেতাবি বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁর দৌড় কতদূর ? না, কোনো রকমে তিনি লিখতে পড়তে পারেন। তবু তাঁর বিদ্যা এমনই বিশাল, এমনই সুদূরসারী যে বড়-বড় পণ্ডিতেরা পালাতে পথ পায় না। পেঁচার কাছে সূর্য যেমন, পণ্ডিতদের কাছে তাঁর প্রভাব ছিল তেমনি অসহনীয়। মাটির নিচে গর্তে-ঢুকে-যাওয়া কীটের মতো তারা কেন তাঁর কাছ থেকে পালাতে চাইত? কারণ একটাই : তাদের তর্কবিতর্ক শাস্ত্রবিচার যেখানে পৌঁছয় না, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সেই অমৃতলোক থেকে। কাশীর পবিত্র ভূমিকে জানতে হলে কাশীতে যেতে হয়, মানচিত্র দেখে কি আর জানা যায়? কাশী কেমন তা কেবল কাশীবাসারাই বলতে পারে। যিনি অন্তহীন কেবল তিনিই জানেন অনন্তকে। মহাকালের প্রতিটি দরজা খুলতে পারেন কেবল শ্রীরামকৃষ্ণ, কেননা তাঁরই কাছে আছে অমৃত লোকের চাবি।

"শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য অবতারেরা যেকালে একটি বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাসের কথা প্রচার করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তা করেন নি। একবার শেষরাত্রে উঠে শুনি, তিনি বারান্দা দিয়ে পায়চারি করতে করতে থু-থু করছেন। ব্যাপারটি কি বোঝবার জন্যে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। এসে শুনি তিনি থু-থু করছেন আর জগন্মাতাকে বলছেন, 'গোষ্ঠী-গৌরব চাইনে। থু থু। আমাকে দিয়ে ধর্মের নামে কোনো সম্প্রদায় গড়ে তুলিসনে, মা।' তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন : 'নাম-যশের পাঁকে পড়িসনি। ও-সব ঘোলা জল কাটিয়ে নামহীনের পারে চলে যা। লোকেরা এখানে আসছে, আসুক। যে যেমন চায়

নিয়ে চলে যাক। একটা ফুলের মতো সম্পূর্ণ ফুটে ওঠ; মৌমাছিরা তোর বুকের মধু খাক, সবাই আনন্দে মেতে উঠুক, কিন্তু কাউকে তোর আত্মার আকর্ষণে আটকে রাখিস নি।'

"ঈশ্বরোপলব্ধির বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ এক-একজনার এক-এক রকম। তদনুযায়ী প্রত্যেক অবতার তাঁর আপন আপন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাদর্শকে একমাত্র বলে প্রচার করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রভুর মতে 'এসবই ভক্ত তীর্থযাত্রীর মতো। ভগবান অনন্ত, তাঁর ভাবও অনন্ত। তাঁর পথের কি শেষ আছে!' শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রত্যেক ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে উদঘাটন করবার জন্যেই। এখানে আমাদের উদ্দেশ্যও নানা মত ও পথ নিয়ে কলহ না-করে ঈশ্বরকে লাভ করা। তাঁকে না-পেলে কিছুই পাওয়া হলোনা, কেবল যন্ত্রণা, বেদনা ও পাপের অগাধ পারাবার। সুতরাং যে-করেই হোক, তাঁকে লাভ করা চাই। মত ও পথ নিয়ে কচকচি করে কী হবে!

"বাগানে আম খেতে এসেছ, খেয়ে চলে যাও। কটা গাছ আর তার কটা পাতা সে-সবে তোমার কী দরকার! ভগবানের পূজা করবে, তা সে মূর্তিতে করবে না অরূপে করবে সে-সব বাজে কথায় সময় নষ্ট করা কেন! তিনি কি কেবল সাকার? না, কেবল নিরাকার? অবতার-তত্ত্ব খাঁটি না অখাঁটি সে-সব কথায় কী এসে যায়!

"অনন্ত অমৃত লোকের বিষয় জানতে চাও তো যারা সেখানে গেছে তাদের কাছে খবর নাও। কাশীর খবর কেবল কেবল কাশীবাসীরাই দিতে পারে। খবর-টবর নিয়ে লেগে পড়, এগিয়ে যাও। তা না-করে ঘরে বসে যদি গাল-গল্প করো: 'পবিত্র ভূমি কাশী এই রকম কি ঐ রকম' তাহলে হাজার বছর কেবল ঐ করেই কাটে, কাশীর দিকে একচুলও এগোনো যায় না। এই জীবনেই আমাকে ভগবানের দর্শন পেতে হবে—এই সংকল্পের কাছে জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক কী। আর ধর্মান্ধতা? সে তো কোনো কাজেই লাগে না, বরং তা জীবাত্মার পক্ষে ক্ষতিকর। আসল কথা ঈশ্বরকে জানা, তাঁকে জানলে ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হয় না। যতই শাস্ত্র-পুরাণ ঘাঁটো আর ঋষি-বাক্য কপচাও, ওতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ঋষিরা কী বলেছেন, পুঁথি-পুরাণে কী আছে, এ-সবের উর্ধ্বে উঠে ঈশ্বরদর্শন। একবার দর্শন হলে জীবজগতের সকল গোপন রহস্য মুহূর্তে উন্মোচিত হয়ে যায়।

"তিনি ভগবান, পরমাত্মা। পরমের চাবিটি আছে তাঁর হাতে। তাঁর করুণা চাও। নিজেকে উৎসর্গ করো তাঁর কাছে। নিরন্তর আচার-অনুষ্ঠানে তাঁকে পাবে না। তিনি চান তোমার ভক্তি, ভালোবাসা ও ঐকান্তিক ব্যাকুলতা। তাতেই তিনি ধরা দেন।

"সে যাই হোক, প্রত্যেক অবতারেরই এক-একটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকেই

সংসারে ধর্মের একটি বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্যান্য আদর্শ তাঁর জানা নেই তা অবশ্য নয়, কিন্তু একটি বিশেষ আদর্শই তাঁর কাছে প্রবলরূপে দেখা দেয়। বুদ্ধদেবের কাছে তা ছিল নিষ্কাম জীবনযাপন। তিনি স্বয়ং ছিলেন কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণত নিষ্কাম ও অনীহ। এমনকি তিনি মোক্ষের আকাংক্ষাও করেন নি। অন্যদের জীবনেও তিনি তা চেয়েছিলেন।

"বুদ্ধদেবের পর এলেন জ্ঞানমার্গী শঙ্করাচার্য। নিতান্তই কিশোর বয়সে তাঁকে প্রশ্ন করা হলো: 'কস্ত্বং? কে তুমি? তোমার ঘরই বা কোথায়?' শঙ্কর বললেন:

'ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণ নেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমি র্ন তেজো ন বায়ু—
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।

* *

অহং নির্বিকল্পো নিরাকার রূপো
বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তি র্ন মেয়—
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।"

মন, বুদ্ধি, অহংকার বা চিত্ত—আমি এসব কিছুই না। শ্রবণ, নয়ন, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এইসব ইন্দ্রিয়াদিও আমি নই। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, বোম—এই পঞ্চতত্ত্বও নই। আমি চিদানন্দ স্বরূপ, শিব। আমি নির্বিকল্প, আমি নিরাকার।

শঙ্কর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পূর্ণ রূপ। আর এই প্রজ্ঞার সার্থকতার জন্যে পরবর্তীকালে এলেন প্রেমভক্তির অবতাররূপে শ্রীচৈতন্য। প্রত্যেক অবতারই একে অন্যের ফলশ্রুতি। কেবল ইতরজনেরা ধর্ম নিয়ে কলহ করে। সমস্ত তর্ক ও ঝগড়ার মীমাংসার জন্যে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি তাঁর নিজের জীবনে সমস্ত ধর্মকে সাধনার মধ্যে মিলিয়ে দেখলেন। সকল ধর্মের মূল্য লক্ষ্য যে ঈশ্বরোপলব্ধি সেইটে দেখালেন। এটা সম্ভব হলো, কারণ তিনি ছিলেন প্রেমভক্তি ও অনন্ত করুণায় পরিপূর্ণ। অন্তর্দৃষ্টি ও পরধর্ম সহিষ্ণুতার পূরিপূর্ণ রূপই শ্রীরামকৃষ্ণ। সংবেদনশীলতা বা পরদুঃখকাতরতার একটি উদাহরণ পাওয়া যায় বারাণসীতে তাঁর তীর্থযাত্রার সূত্রে। যে-ধনাঢ্য ব্যক্তিটি* শ্রীরামকৃষ্ণকে বারাণসী নিয়ে গিয়েছিলেন, দরিদ্র ও দুঃস্থদের দেখে তিনি তাঁকে বললেন: 'এদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা না-করলে আমি সাধুদর্শনেও যাবো না।' আরেকবার, তখন তিনি গলায় কর্কটরোগে মুমূর্ষু, গোটা একটা দিন গেল, অন্নবস্ত্রের সমস্যা বা ধর্ম-

* স্পষ্টতই মথুরবাবু। রাণী রাসমণির জামাতা।

জিজ্ঞাসার জন্যে কেউ এলো না। নিদারুণ রোগযন্ত্রণা ভুলে তিনি ককিয়ে উঠলেন : 'একী, আজ তো ওরা কেউ এলো না! ওরা না-এলে যে বিষম কষ্ট পাই!'

"কথা কইতে পারেন না, খাওয়াও প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, ঐ নিদারুণ অবস্থায়ও তিনি অন্যদের চেঁচিয়ে কাছে ডাকতেন। এমনই ছিল তাঁর ভালোবাসা ও করুণা। প্রায় দেড় বছর আমি তাঁকে দেখাশুনো করেছি। সেবা করেছি। তিনি প্রত্যেকটা দিন অন্যের কিসে ভালো হয়, কল্যাণ হয়, তা-ই ভাবতেন।

কুঁড়েমি তাঁর ধাতে ছিল না। এই ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন, এই আবার বাগানের খুঁটিনাটি করছেন। সর্বদাই একটা-না একটা কাজ নিয়ে আছেন। আশ্রমের সামান্য কাজের মধ্যে থেকেও কখনো লক্ষচ্যুত হননি। কাজের মধ্যে কোনো ফাঁকি, কোনো ঢিলেমি তিনি বরদাস্ত করতেন না। এমনকি চুন-সুপারি দিয়ে কত সুন্দর করে পানের খিলি সাজা যায় মেয়েদের এই কাজটিও তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন। ব্যবহারিক জ্ঞান তাঁর এমনই প্রত্যক্ষ ছিল।

"জনরবের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো ধর্মশিক্ষাকে ঋণ করে মেনে না-নিয়ে সেটা কতদূর টেঁকসই, আপন সাধনায় তা যাচিয়ে নিতেন। আর সেইজন্যেই সকল ধর্মের মত ও পথ যে একই ঈশ্বরের অভিমুখে নিয়ে যায়, এই সত্য তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল।

"শুধু সকল ধর্মে নয়, সর্ব জীবে তিনি পরমেশ্বরকেই দেখতেন। কোনো বাছ-বিচার ছিল না, আগে-পরের জ্ঞান ছিল না, সকল জীবের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমে তিনি বিহ্বল। বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় বা গোষ্ঠি গড়ার প্রবণতা তাঁর থাকবে কি করে। সর্বভূতে যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরে সর্বভূতকে দেখেছেন, কী করে তিনি নিতান্ত একটা ধর্মমতের গণ্ডিতে বাঁধা পড়েন? আধ্যাত্মিকতার নীলকান্ত-মণি কি বাক্সে বন্দী হবার বস্তু? আর আমরা, যারা শ্রীরাকক্লষ্ণের সন্তান, আমরা যেদিন কোনো একটা বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীকে আঁকড়ে ধরে আত্মনিয়োগ করব সেদিন থেকেই হবে আমাদের অধঃপাতের সূত্রপাত। পুকুরের চারদিকে বেড়া দিতে হয় মানি, কিন্তু স্রোতস্বিনী নদীতে তো বেড়া দেওয়া যায় না। স্রোতের অভাবে পুকুরের জল একদিন নষ্ট হয়, পচে যায়, সে তো স্বাভাবিক। তাই তিনি বারংবার আমাদের সাবধান করেছেন। 'আমরা রামকৃষ্ণপন্থী'—রামকৃষ্ণ ছাড়া জীবের মুক্তি নেই,' অতএব রামকৃষ্ণপদে আশ্রয় নাও'—এইসব দুষ্ট ও ক্লিন্ন প্রচারের বিরুদ্ধে তিনি আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন : 'সাবধান, ধর্মের নামে কোঁদল করিসনি।'

"আমাদের শাস্ত্রে আছে সিদ্ধ সাধকেরা সামগ্রিক আত্মিক ক্ষমতার অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখলে, তাঁর সংস্পর্শে এলে, এই শাস্ত্রবাক্যে প্রত্যয় জন্মে। তাঁর শরীরের প্রতিটি কোষ, শিরা-উপশিরা এমনকি প্রতি রক্তবিন্দুর ওপর তাঁর দখল

ছিল অপরিসীম। গলায় ক্ষতস্থানে কী অসহ্য যন্ত্রণা। সেই জায়গা ধুয়ে ওষুধ লাগাতে হয়। তাতে তো যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়। ভয়ে উদ্বেগে আমরা ইতস্তত করি। তিনি বললেন: 'একটু দাঁড়া···নে, এবার নে।' ততক্ষণে তিনি তাঁর মনকে ক্ষতস্থান থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। ক্ষতস্থান ধোয়া, পরিষ্কার করা, ওষুধ লাগানো—ডাক্তারি মতে যা যা করণীয় সবই আমরা করতাম। তিনি তখন বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা অনুভব করতেন না। করতেন না, কারণ সমস্ত শরীরে, মনে, হৃৎপিণ্ডে এমনকি চিত্তেও তাঁর দখল ছিল। সিদ্ধ যোগীর মতো তিনি তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রেখেও বেঁচে থাকতে পারতেন। শরীরের যে কোনো জায়গা থেকে মনকে সরিয়ে রাখা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য। না, কোনো আজগুবি কথা বলছি না। যা আমি নিজে দেখেছি তা-ই বলছি।

"তবু তিনি শরীরে ছিলেন। কি ভাবে ছিলেন? এ-বিষয়ে একদিন তিনি বললেন আমাকে: 'ত্মাখ, সিদ্ধাত্মা শরীরে অল্প একটু জায়গা নিয়ে থাকেন, খোড়ুলি নারকেলের মতো, কেবল একটুখানি লেগে থাকা।'

"তাঁর কোনো জাতপাতের বালাই ছিল না। বলতেন: 'ভক্তের আবার জাত কী, সে সমস্ত জাতপাতের বাইরে।' মাঝে-মাঝে দেখেছি, শুদ্ধভাবে দেখা হয়নি বলে অনেক গণ্যমান্যদের খাবার তিনি ছুঁতে পারতেন না। আবার সমাজের অবহেলিত ও অচ্ছুতদের থালা থেকেও খাবার তুলে নিতে তাঁকে দেখেছি। এরকমই একজন ব্রাত্য একবার ভয় পেয়ে হাত তুলে বলে উঠল: 'প্রভু, কী করছেন দাঁড়ান, আমি যে নিষিদ্ধ মাংস খেয়েছি।' কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমানন্দে খেতে খেতে বললেন: 'আহা তোর এই খাবার কী শুদ্ধ রে। কারণ কী জানিস? তোর মনে তো কোনো দাগ লাগেনি।' তাঁর কাছে বর পাবার আশায় কেউ কিছু দিলে তিনি কখনো তা গ্রহণ করতেন না। আবার কঠোর নিষ্ঠাবান শুচিবাইগ্রস্তদের কাছেও থাকতে পারতেন না। 'শুচিবাই একটা মারাত্মক ব্যাধি। ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় বাঁচিয়ে চলতে চলতে ভগবানে আর মন দিতে পারে না।'

"আমাদের একজন সতীর্থ গুরুভ্রাতা সাধনপথে নিজেকে বড় অক্ষম মনে করতেন। একদিন তিনি তো ঠাকুরের কাছে এসে নিজের মনের কথা অকপটে বললেন। ঠাকুর অমনি বলে উঠলেন: 'বেশ তো, তুই আমাকে বকলমা দিয়ে দে।'* তিনি তো বললেন, কিন্তু ব্যাপারটি বেশ গুরুতর। কারণ আধ্যাত্মিক জীবনে গুরুকে যিনি বকলমা দেবেন তাঁকে একান্তরূপে সৎ ও গুরুনির্ভর হতে হবে। তবেই তিনি শিষ্যের কাজ করতে পারেন। এইসব সহজ সরল কামনা-বাসনাহীন গুরুনির্ভর লোকেরও নানা বিষয়ে ক্ষমতার সঞ্চার হয়ে থাকে।

* 'বকলমা'র ব্যাপারটি যে গিরিশ ঘোষের বেলা ঘটেছিল, আজকালকার দিনে সেটা আর কারো অজানা নেই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : 'ওরে ঈশ্বরলাভের বকলমা যদি দিবি তো সংসারের ভালো-মন্দ কামনা বাসনায় একেবারে অনাসক্ত হয়ে থাকবি। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নাহলে কি হয় রে!'

"ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে নানা গ্রন্থাদির মধ্যে আমাদের সেই সতীর্থের একখানি গ্রন্থ ছিল। তার নাম : 'মোক্ষ ও তার উপলব্ধি।' সেখানা আমরা তাঁকে পড়ে শোনাতাম। ধর্মপুস্তকাদি বিষয়ে তাঁর অনুরাগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতেন : 'ঈশ্বর বিষয়ে পড়াশুনো মানে তাঁর পরিমণ্ডলে থাকা। সব সময় তো ধ্যান করা যায় না, সুতরাং ঈশ্বর-অনুশীলনের জন্যে শাস্ত্রাদি পাঠই সর্বোত্তম। সমুদ্রের শীতল বাতাস না-পেলে পাখার হাওয়ায় জুড়োতে হয়।'

"তীর্থাদি পরিভ্রমণ বিষয়ে ঠাকুর বলতেন : 'যার হেথায় আছে তার সেথায়ও আছে। যার হেথায় নেই তার সেথায় নেই। অন্তরে ঈশ্বরানুরাগ থাকলে তীর্থ স্থানেও সে-অনুরাগের প্রকাশ দেখা যায়। সাধু-মহাত্মাদের জন্যেই স্থান-মাহাত্ম্য। তাই তো তীর্থস্থান। নইলে কোনো স্থান কি কাউকে শুদ্ধ করে?'

"সুতরাং ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ নিয়ে আপন অন্তরে ডুব দাও। ঈশ্বরলাভ করতে হলে একেবারে তলিয়ে যাও। তত্ত্ব আলোচনা ও তর্কবিতর্কে তো তাঁকে পাওয়া যায়না, কিন্তু উপলব্ধির বিষয়। সমস্ত সম্ভাব্য পথ অনুসরণ করে এই জীবনেই তাঁকে পেতে হবে। ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। তিনি ছাড়া আনন্দ নেই, তিনি ছাড়া সংসারে প্রকৃত শান্তিও নেই।"

স্বামী প্রেমানন্দর বিবরণ এখানেই শেষ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে একজন অবতার সে-বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়। কিন্তু যাদের সে-বিশ্বাস নেই তাদের কথা কী। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : সকল মত সকল পথই তাঁর কাছে পৌছেচে।" বেলুড়মঠে তাই অন্যতম সিদ্ধান্ত হলো এই যে, "শ্রীরামকৃষ্ণকে কেবল একজন সাধু বলে যার প্রত্যয় হয়েছে এবং যার প্রত্যয় তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার, এতদুভয়ের মধ্যে কোনো ফারাক নেই।" আমার দিক থেকে পাঠককে যদি কিছু বলতে হয় তো বলি, দেখুন, কে কী বললো তাতে কিছু এসে যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের গোটা জীবনটা একবার দেখুন। সেটাই তো মস্ত জিনিস! আর সেই দিব্য জীবনই যদি আমাদের অধ্যাত্ম জীবনকে উদ্বুদ্ধ না করে, তবে তাঁর বাণী বা তাঁর বিষয়ে কিছু কথা বলে আর কী হবে?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও জনৈক স্বেচ্ছাচারীর কাহিনী

নাট্যকার গিরিশ ঘোষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের অন্যতম। এবং ব্যবহারে কঠিনতম। তিরিশে পা দেবার আগেই তাঁর প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত। প্রায়

ত্রিরিশ যখন তাঁর বয়েস, স্ত্রী মারা গেলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ঈশ্বরে বিশ্বাসও আর রইল না। 'এমন যৌবন ও সৌন্দর্যই যদি চলে যায় তবে আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব কী?' কেবল এই প্রশ্নেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, এর মীমাংসা খুঁজতে গিয়ে তিনি দুনিয়ার তাবৎ ধর্মের মূল বিষয়গুলো খুঁটিয়ে পড়লেন। কিন্তু ওতে কিছু হলো না। অবশ্য কলকাতার নাট্যমহলের উড়ুক্কুদের সঙ্গে নিরন্তর মেলামেশার ফলে ইতিমধ্যে তাঁর নৈতিক শক্তিরও অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর, ধর্মচর্চায় যখন শান্তি এলো না, গিরিশ চরম উচ্ছৃংখল জীবনযাপনে মজ্জিত হলেন। অল্পকালের মধ্যেই সকলে জানল তিনি একজন পাঁড় মাতাল। এতৎসত্ত্বেও মদের ঝোঁকে তিনি দু-দুখানা ধর্মীয় নাটক লিখে ফেললেন। আর সে-নাটক চললোও টানা পাঁচ বছর। সকলে তাজ্জব হয়ে গেল। তখনকার সময়ে তাঁর পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো জোরালো ধর্মবিশ্বাস যদিও তাঁর ছিল না, তথাপি বুদ্ধ, চৈতন্য বিল্বমঙ্গল (তুলসীদাসের জীবনের ওপর রচিত) ইত্যাদি নাটক রচনার অজস্র অনুপ্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগুরু ও তাঁদের জীবনচরিত থেকে। শেষোক্ত নাটকটি ইংরেজিতেও হয়েছে, নাম 'চিন্তামণি'।

ঐসব নাটকে গিরিশের স্থির মনোভঙ্গিটি এই রকম: 'সমস্ত ধর্মই শুষ্ক ও কঠিন, কিন্তু যাঁরা ধার্মিক তাঁরা তেমন নন। তাঁরা করুণাময়, তাঁরা প্রাণদ।' সাধুসন্তদের জীবনকাহিনী পড়ে পড়ে নিজের জীবনে তেমন একজন সন্তের দেখা পাওয়া যায় কিনা, সে-বিষয়ে তাঁর আগ্রহ জেগেছিল। উচ্ছৃংখল জীবন-যাপনের মধ্যে যখন কিঞ্চিৎ শান্ত থাকতেন সেই অবকাশে তিনি তাঁর মনোমত একজন সত্যিকার সাধকের সন্ধান করে ফিরতেন। কতজনের সঙ্গে দেখা হলো তাঁর, কিন্তু কোনো সাধুই তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারলেন না। তবু মনপ্রাণ খোলা থাকল, যদি কখনো—।

অবশেষে এক বন্ধু এসে বললে, দক্ষিণেশ্বরে যে-সাধু থাকেন তিনি নিশ্চয়ই গিরিশের কৌতূহল ও মনোবাসনা পূর্ণ করবেন। জনশ্রুতি এই, প্রচুর মদ্য পান করে সেই সাধুর দর্শনে গিরিশ বেরোলেন। স্পষ্টতই উদ্দেশ্যটা হলো সাধুকে যৎপরোনাস্তি উত্যক্ত করা। প্রথম দর্শনেই সাধুকে বারংবার কী অপমানই না করলেন! মুখে কেবল এক কথা: "আপনার ঈশ্বর-কিশ্বর মানিনা। আমি মদ খাই। বলবেন তো মদ খাওয়া পাপ? ও-পাপ আপনার ঈশ্বরও করেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ শান্ত স্বরে বললেন: "মদ খাবি তো খা না। ঈশ্বরের নামে খা। আরে, নেশা তো তিনিও করেন।" কথা শুনে গিরিশ ঝাঁঝিয়ে উঠলেন: "নেশা করেন? কী করে জানলেন, মশায়?" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "তিনি যদি নেশাই না-করবেন তবে এমন উল্টোপাল্টা জগৎসংসার সৃষ্টি করলেন কী করে!"

গিরিশের জারিজুরি কোথায় ভেসে গেল, তিনি কেমন চুপসে গেলেন।

—"গুরু কে ?" গিরিশ প্রশ্ন করলেন।

—"গুরু ? সে তো ঘটক।" জবাব দিলেন রামকৃষ্ণ। "সে যে মানুষের সঙ্গে ভগবানের ঘটকালি করে গো ! যদি চিনে নিতে পারিস, তোরও গুরু আছে রে।" এই শেষের কথাটা নেশাগ্রস্ত গিরিশকে তেমন নাড়া দিল না।

মনের মধ্যে এইসব খতিয়ে দেখবার জন্যে, থিতিয়ে যাবার জন্যে সময় চাই গিরিশের। যেন সেইজন্যেই বিষয়ান্তরের অবতারণা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ: "তোর থ্যাটার দেখাতে আমায় নিয়ে যাবি না ?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। যেদিন আপনার খুশি।"

গিরিশ বিদায় নেবার পর উপস্থিত ভক্তজনেরা ধিক্কারে সোচ্চার হলো: "কী পাপিষ্ঠ, নরাধম! ওকে কী রকম লাগল আপনার ?"

"আহা, কত বড় ভক্ত!" ঠাকুরের উত্তর নিগূঢ় তাৎপর্যময়।

কিছুদিন পর ঠাকুর গেলেন গিরিশের স্বরচিত নাটকে অভিনয় দেখতে। নাটক শেষ হলো। এমনিতে গিরিশের ভাঙা মনে তেমন উৎসাহ নেই; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সোজা সাজঘরে গিয়ে গিরিশকে অভিনন্দন জানালেন, উদ্ধত গিরিশ কপট বিনয়ে শুধোলেন: "আমার অভিনয় দেখে আপনি খুশি হয়েছেন জেনে ভালো লাগল। আচ্ছা, বলুন তো খারাপটা কোথায় ?"

সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্বিধায় বললেন ঠাকুর: "মনটাকে কপট করে রেখেছিস কেনে ? ওতে ভোগান্তি হয় না ?"

"বলুন এ থেকে কি মুক্তি নেই ?" বেদনার্ত গলায় জিগ্যেস করলেন গিরিশ।

ঠাকুর বললেন: "কেনে থাকবে না! একটু ধর্মকর্মে মতি আন্।"

শুনে তো গিরিশ মহা খাপ্পা। তিনি কারো উপদেশ কখনো বরদাস্ত করেন নি, আর তাঁকে কিনা শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন। ক্রোধে অন্ধ হয়ে মদো-মাতালের যত রকম খিস্তি-খেউড় তাঁর জানা ছিল তাই দিয়ে তিনি ঠাকুরকে অভিষিক্ত করলেন। এসব যে হবে ঠাকুর যেন পূর্বেই তা জানতেন, ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিরিশের খিস্তি শুনলেন। গিরিশ থামতেই তাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর চলে গেলেন দক্ষিণেশ্বর।

পরদিনই সকালবেলা গিরিশ এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে পাঠালেন রামকৃষ্ণদেবের কাছে —গিরিশকে যেন ঠাকুর ক্ষমা করেন। বন্ধুটি করুণাময় ঠাকুরকে চিনত। সে গিরিশের হয়ে একটু ওকালতি করল: "মশাই, গিরিশ মদ খায় বটে, কিন্তু মদে উচ্ছন্নে যাবার মতো লোক সে নয়। সে খুবই উদার।"

ঠাকুর বললেন: "কিন্তু সে যা কাঁচা খিস্তি করে, বাপ্‌স।"

"একটু ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন।" বললে সেই বন্ধুটি।

ঠাকুর হাসলেন। চোখ মিটমিট করে বললেন: "কিন্তু ধরো, সে যদি আমায় পেটায় ? পিটিয়ে মেরে ফেলে ?'

"তা-ও নিজগুণে মার্জনা করবেন।" বন্ধুটি সরলভাবে জবাব দিলে: "ঐ রকম উড়নচণ্ডী, গালাগাল ছাড়া আপনাকে দেবার মতো তার আর কী আছে, বলুন। সাপ তো কেবল বিষ ঢালতেই পারে।"

গিরিশের বন্ধুর মুখে এইসব শুনে ঠাকুর অনুনয় করে বললেন: "এক্ষুনি একটা গাড়ি নিয়ে আয়। আমি ওকে দেখতে যাবো। নিয়ে যাবি?"

ঠাকুর যখন পৌছলেন গিরিশ তখন টালমাটাল। কিন্তু শান্ত ও সংযত লোকের সঙ্গে যেমন কথাবার্তা হয় তিনি গিরিশের সঙ্গে সেইভাবে কথা বললেন। ফল ভালোই হলো। মেজাজ খারাপ না-করে গিরিশ ঠাকুরের সব কথা চুপচাপ শুনে গেলেন। গিরিশ ঘুমিয়ে না-পড়া অবধি ঠাকুর গিরিশের কাছে রইলেন।

সেই থেকে গিরিশের ঠাকুরের সঙ্গলাভের আসক্তি। তাই বলে তিনি মদও ছাড়লেন না। উড়ুক্কু বন্ধুবান্ধবদেরও না।

গিরিশের প্রতি ঠাকুরের ব্যবহারিক চাতুরিও প্রণিধানযোগ্য। একদিন তো গাড়ি করে গিরিশ এলেন দক্ষিণেশ্বরে। একেবারে শান্তশিষ্ট ভালো মানুষটি। বাগানের মধ্য দিয়ে তাঁকে আসতে দেখে ঠাকুর তাঁর এক ভক্তশিষ্যকে বললেন: "ওরে, ওকে তো আজ বেশ শান্তই মনে হয়। কিন্তু গাড়িতে মদের বোতল রয়েছে। যা, যা, চুপ করে বোতলটা হাতিয়ে নিয়ে আয়।"

তারপর ঈশ্বর প্রসঙ্গে ঠাকুর যেখানে কথাবার্তা বলছিলেন সেইখানে গিরিশ এসে বসলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল, গিরিশের গলা শুকিয়ে কাঠ। শেষে আর সইতে না-পেরে তিনি উঠে যেই গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন অমনি ঠাকুর বলে উঠলেন: "আরে, তোকে আর কষ্ট করে আনতে হবে না। এই যে নিয়ে এসেছি। নে, খা। খেয়ে নে বাবা।"

সেই থেকে গিরিশের মদের মাত্রা কমতে থাকল। তারপর বেশ কিছুদিন পর তিনি মদ একদম ছেড়েই দিলেন। এই প্রসঙ্গে জনৈক হিতৈষীকে গিরিশ নাকি বলেছিলেন: "কেন ছাড়লুম জানো তো? কারণ আমার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো মদ ছাড়বার আদেশ করেন নি। সাধুতা ও পবিত্রতাই নয়, তিনি আমাদের স্বাধীনতাও দিয়েছিলেন। তিনি কখনো আমদের তাঁর স্বার্থে কিছু করতে বলেন নি।"

কিন্তু ওটাই একমাত্র নয়, মদের চেয়েও ঢের সমস্যা আছে গিরিশের। বস্তুত সাধনা বা কৃচ্ছ্রসাধন—গিরিশের কাছে এসব ভয়াবহ। ঈশ্বর উপলব্ধির জন্যে প্রবল আকাংক্ষা থাকলে কী হবে সাধনভজন ধ্যান এসব তাঁর আসে না। তাঁর ধৈর্য যে কত কম সে-কথা সকলেরই জানা আছে। চুটিয়ে ফুর্তি করতে ভালোবাসেন তিনি, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত কোনো আচার-অনুষ্ঠান? ওরে বাবা!

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা যতই বাড়ল, মনের শান্তি না-পেয়ে

তিনি ততই ক্লিষ্ট হতে থাকলেন। একদিন ঠাকুরকে শুধোলেন: "ধরো, আমি আমার উচ্ছৃংখল সঙ্গীসাথীদের ছেড়ে দিলুম। তবে কি ধর্মলাভ হবে?"

"না, না, ওসব করবি কেনে? যারা পতিত তাদের কি ছাড়তে আছে?" বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ: "ভগবান তো ওদের উদ্ধারের জন্যেই আসেন। তুই কি ভগবানের চেয়ে বড় না কি রে?"

এর ঠিক পরেই গিরিশ একদিন সটান এসে জিগ্যেস করলেন: "মদটদ ছেড়ে দিলে কি ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ হবে?"

"ওসব ছাড়লে কী হবে। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে হয়।" বললেন ঠাকুর: "তুইতো রোজ মদের মাত্রা কমিয়ে দিয়েছিস। তাতে কি তাঁকে কাছে পেয়েছিস? তিনি অখণ্ড চৈতন্য, তাঁকে কে ফাঁকি দেবে?"

"আমি কী করবো তবে? আমি ধ্যান করতে পারি না, কাতর হয়ে ডাকতে পারিনা। আমার উপায় কী হবে!"

শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন কিছু বললেন না। গিরিশ বিদায় নিলেন। তারপর পনেরোটা দিন একটানা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও ধ্যানের বিস্তর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র ফল হলো না। গিরিশ ক্ষেপে গেলেন। 'এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার'—মনে মনে ঠিক করে রীতিমতো ধোপদুরস্ত হয়ে তিনি দক্ষিণশ্বের রওনা হলেন। তাঁর গুরুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

ভক্তশিষ্য পরিবৃত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁর ঘরেই ছিলেন। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গিরিশকে দেখতে পেয়ে তিনি উছলে উঠলেন: আরে, গিরিশ যে! গিরিশের যন্ত্রণা তাঁর অজানা নয়। এখন আবার তার মুখে যা জানলেন তাতে বোঝা গেল গিরিশ মর্মবেদনায় মরীয়া হয়ে উঠেছেন এবং ধ্যানভজনের চেয়ে তিনি আত্মঘাতী হওয়াই শ্রেয় মনে করেন।

"আরে গিরিশ, আমি তো তোকে এত এত সাধনভজন করতে বলিনি। খাবার আগে শোবার আগে তুই শুধু একবারটি তাঁকে স্মরণ করবি। ব্যস, এইটুকুন। এইটুকুনই যথেষ্ট। তুই এটা পারবিনি?"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গিরিশ ধীরে ধীরে বললেন: "না প্রভু, আমি তা-ও পারি না। আমি নাটক নিয়ে থাকি, কখন খাই কোথায় শুই তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই।" আবার খানিকটা চুপ করে ভেবে নিয়ে বলতে লাগলেন: "রুটিন মাফিক চলা, ধরাবাঁধা নিয়মকানুন—ওসব আমার পোষায় না। না না, সাধনভজন আমার দ্বারা হবে না। না, মুহূর্তের জন্যেও ঈশ্বরকে আমি স্মরণ করতে পারি না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ চুপ। তখন তাঁর অর্ধবাহ্য দশা। "তাঁকে পাবার জন্যে তুই যদি কিছুই করতে না-পারবি তবে দে, আমায় বকলমা দে।"

"বকলমা? কী বলছেন আপনি?" গিরিশ হতবুদ্ধি।

"তোর হয়ে ধ্যান-প্রার্থনা আমিই করব" বললেন রামকৃষ্ণ : "হলো তো? যা, এখন থেকে নিশ্চিন্তে নাটক-টাটক কর। যেমন-খুশি খা দা। কাউকে কিছু বলার নেই। কোনো দায় নেই। যা-কিছু ঘটবে মেনে নিবি। কারো কাছে কিছু চাইবি না। শুধু জানবি : ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন, নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' তুমি যা করাও তাই করি, তুমি যেমন রাখো তেমনি থাকি—এই ভাব নিয়ে থাকবি, ঈশ্বরের কৃপার ওপর ষোল আনা নির্ভর করে চলবি।"

গিরিশ গুরুকে তক্ষুনি বকলমা দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। মনে মনে সংকল্প করলেন : গাছের পাতাটি যেমন রোদ্দুর আর হাওয়ার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, তেমন থাকব। বেড়াল-মা বাচ্চাকে কখনো রাখে ফিটফাট বিছানার উপর, কখনো বা টুকিটাকি আবর্জনার এক পাশে। বেড়ালের বাচ্চার কাছে বেড়াল-মা-ই ভরসা। সেই ভরসা নিয়েই বাঁচব। ঈশ্বরের কাছে ষোল আনা আত্মসমর্পণ করব।

শিষ্যকে শিক্ষা দিয়ে গড়েপিটে তুলতে শ্রীরামকৃষ্ণ বড় কঠিন। গিরিশের মানসিকতায় এই যে নতুন মোড় নিয়েছে সেটাকে আধ্যাত্মিক স্তরোন্নতির ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার জন্যে তিনি গিরিশকে ধীরে ধীরে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

কারো কাছে কিছু চাইব না—এটা গিরিশের পক্ষে বড় বিষম ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু দিনের পিঠে দিন এই উড়নচণ্ডীর এইভাবেই কাটল। নিজে কিছু চায় না, যে যা দেয় তার উপরই নির্ভর। তিনি যে গুরুকে কথা দিয়েছেন।

একদিন গিরিশ ঠাকুরের সামনে কোনো একটি সামান্য ব্যাপার নিয়ে 'আমি করব' বলায় ঠাকুর বলে উঠলেন : "ও কি গো? অমন করে 'আমি করব' বল কেন? যদি না করতে পার? বলবে—ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তো করব। তুমি না বকলমা দিয়েছ? এখন থেকে মনে রেখো তোমার জীবনযাপন চলাফেরা সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। নিজের ইচ্ছা আর 'আমি টাকে ত্যাগ করে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হও। তবে তো হবে।"

সেই থেকে গিরিশের জীবনে এক মস্ত পরিবর্তন। তিনি বকলমা দেয়ার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলেন। নিজের সকল দায়দায়িত্ব একবার যখন পরমপুরুষের কাছে সমর্পণ করা যায়, তখন আর নিজের সুখদুঃখ ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু থাকে না। গিরিশের স্বভাব একগুঁয়ে, তিনি বিষয়টি যতই হৃদয়ঙ্গম করলেন ততই গুরুর প্রতি তাঁর নিষ্ঠা অবিচল হলো। এইভাবে ধর্মপথে তিনি এতদূর অগ্রসর হলেন যে, তৎকালীন সময়ে তিনি আত্মিক ক্ষমতার অগ্রগণ্যদের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন। অপরপক্ষে নাট্যশিল্পে কঠোর পরিশ্রমের ফলে আধুনিক নাট্যকার হিসেবে তিনি হয়ে উঠলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে ক্লাসিক যুগের কালিদাস, ভবভূতি, ভাস এবং আধুনিক যুগের গিরিশ—এর মধ্যবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার নাস্তি।

শুধু শ্রেষ্ঠ নাট্যকারই নন, মহৎ অভিনেতা ও প্রযোজক রূপেও গিরিশ স্বনামধন্য। অভিনয়শিল্পকে পেশা হিসেবে গ্রহণ ক'রে পতিতা নারী যে অভ্যস্ত জীবনের পরিবর্তে উন্নত জীবনযাপন করতে পারে তারও পথপ্রদর্শক গিরিশচন্দ্র। অভিনয়ে শিক্ষা দিয়ে দিয়ে তিনি বহু পতিতার জীবন রক্ষা করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ভদ্র সমাজে যারা কলঙ্কিত ও পতিত সেই বারবণিতার সমাজ থেকে তিনি অন্তত আধডজন নারীকে উচ্চশ্রেণীর অভিনেত্রীরূপে জনসমক্ষে হাজির করেছিলেন। তখন মঞ্চে পুরুষমানুষেরা অভিনেত্রীরূপে অভিনয় করত। গিরিশ যা দেখালেন এরপর থেকে সে-রেওয়াজ উঠে গেল।

কিছুদিন পূর্বে ভারতবর্ষে বসবাসকালে একদিন এক বৃদ্ধা আমার ও আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এককালে ইনি গিরিশের নামকরা অভিনেত্রী-দের অন্যতমা ছিলেন। 'বাবা' কীভাবে তাদের শিক্ষা দিতেন তিনি সে-প্রসঙ্গে কিছু বলছিলেন। তিনি গিরিশকে 'বাবা' বলতেন। "সাধারণভাবে নারীজীবনে বাবা এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন। নিদারুণ দারিদ্র্য ও অর্থকষ্টে যেসব মেয়েরা পাপের অতলে তলিয়ে যেতে বাধ্য, মঞ্চকে আঁকড়ে ধরে তারা রক্ষা পেলো। কিন্তু বাবা ওখানেই থামলেন না। তিনি আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রমে, তাঁর কথামৃতে অভিষিক্ত করালেন। সন্ধ্যারতির সময়ে আমরা আশ্রমে হাজির থাকি এটা উনি খুব চাইতেন। আমাদের মধ্যে কারো কারো খুব ভয়, পাছে আমাদের পাপের স্পর্শে এই পবিত্র আশ্রম কলুষিত হয়। বাবা বলতেন: 'ভয় কী, তিনি আমাদের সবাইকে ভালোবাসেন। আমাকে ও তোমাদের সবাইকে স্বয়ং শিক্ষা দেবেন বলেই তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ। তিনি যে করুণাময়। আমাদের মতো পতিতকে উদ্ধারের জন্যেই তো তাঁর আসা।"

ইদানিং বৃদ্ধ হয়েছেন এরকম অনেক তৎকালীন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সঙ্গে আমরা কথা কয়েছি। এই কথাবার্তা ও আলাপচারিতায় আমাদের দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, উড়ুক্কু ও উচ্ছৃংখল সঙ্গীসাথীদের ত্যাগ না করে তাদের মধ্য থেকে গিরিশ তাদের জীবনে প্রভূত আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করতে পেরেছিলেন। ধর্মজীবনে তাঁর নবজন্মের পর তিনি আচারে-ব্যবহারে নীতি-বাগীশ ভুঁইফোড়ের ভূমিকা নেননি; তাঁর অতীত জীবনের কোনো কিছুকে অস্বীকারও করেন নি। পরিবর্তে তিনি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ব্যবহারে এবং তাঁর রচনার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা ও চেতনা ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করিয়েছিলেন। আর গুরুকে বকলমা দেয়ার ব্যাপারে? না, তুরীয়ানন্দ ও অন্যান্যরা বলেন, সেদিক থেকে তিনি বিন্দুমাত্র নিয়ম-লংঘন করেন নি।

* ইনি যে স্বনামধন্য বিনোদিনী সেটা কাউকে না-বললেও চলে।

গুরুভ্রাতাদের দৃঢ় অভিমত এই : "গিরিশ ছিলেন আমাদের সকলের চেয়ে ধার্মিক। তিনি অন্তর্যামীর নির্দেশে জীবনযাপন করবেন বলেছিলেন, সারাজীবন তা-ই করেছেন।" এমনকি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বকলমার কথাটি ভোলেন নি। শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে তিনি কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন : "হে ঠাকুর, হে দয়াময়! এই প্রমত্ত সংসারের কঠিন আবরণটি আমার চোখ থেকে সরিয়ে দাও, প্রভু!"

চতুর্দশ অধ্যায়
মহাপ্রস্থান

১৮৮৫ সনের কাছাকাছি সময়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে কণ্ঠনালীতে স্পষ্টত ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, ইতিপূর্বে আমি তার উল্লেখ করেছি। শিষ্যদের মধ্যে থাকবার দিন যে তাঁর দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, একথা তিনি খুব দৃঢ়ভাবে তাঁদের বলেওছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই, এই সংবাদে শিষ্যরা খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। ঠাকুর চলে যাবেন, আর তো সময় নেই, এই ভেবে ভেবে তাঁরাও তাঁদের সাধনভজনের নিত্যক্রিয়া প্রবলবেগে চালাতে লাগলেন। শিষ্যদের নেতৃত্বে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি গুরুভাইদের চাড় দিলেন : "ছাখো হে, ঠাকুরের তো এই অবস্থা। কে জানে কতদিন শরীরে থাকবেন। তাঁকে যথার্থ সেবা করতে হলে, এসো আমরা কঠোর সাধনভজন ও ধ্যানধারণায় লেগে যাই। এখন থেকে যদি কঠোর সাধনভজনে না লাগি, তিনি চলে গেলে শেষে হয়তো আক্ষেপ করতে হতে পারে। আজেবাজে জল্পনায় সময় নষ্ট করে কী হবে। সংসারের কামনা-বাসনায় আমরা যেন না জড়াই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিত্যকর্ম ও কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের অবস্থান যতক্ষণ না-হচ্ছে ততক্ষণ কঠোর কৃচ্ছ্র তার মধ্যে আমাদের চলতে হবে।"

ঠাকুরের ক্যানসার রোগ আর আরোগ্য হবার নয় এ-কথাটা যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল, দলে দলে লোক এসে তখন ঠাকুরকে বলতে লাগলেন, ঠাকুর যেন ঐশী শক্তি প্রয়োগে আপনাকে রোগমুক্ত করেন। তাঁরা প্রত্যেকে এসে অনুনয় করতে লাগলেন : "হে ঠাকুর, তুমি তো তিনিই, ইচ্ছে করলেই তো তুমি নিজেকে সারিয়ে তুলতে পার।"

ঠাকুরের গলার অবস্থা এখন এমন যে কথা বললেই বিষম যন্ত্রণা। বললেন : "কী সব আজেবাজে বকছিস তোরা। এই এটাকে তো (নিজের শরীরকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) চিরকালের মতো তাঁর কাছে সমর্পণ করেছি। এখন কী করে আর এটার বিষয়ে বলতে যাই?"

অসুখের এই সময়টায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তশিষ্যদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। "যারা এখানে আসে যায়"—বললেন তিনি—"তাদের মধ্যে দুই থাকের লোক আছে। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। অন্দরের ও বাইরের লোক। এই অসুখ সেটা চিনিয়ে দেয়। যারা সব ছেড়ে-ছুড়ে এখানে থাকে তারা অন্দরের লোক। তারা সবাই মিলে চৈতন্যকে মূর্ত করতে অবশ্যই যত্ন করবে। যুগে যুগে কত স্ত্রী পুরুষ তাতে উদ্বুদ্ধ হবে।"

পরবর্তী বছরে যদিও তাঁর গলদেশের এই মারাত্মক ব্যাধি ক্ষিপ্রগতিতে বৃদ্ধি লাভ করল, তবু শিষ্যবর্গকে যথাযথ উপদেশ-নির্দেশে শারীরিক যন্ত্রণাকে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন। তিনি শিষ্যদের মনে ও অন্তরে আপনাকে নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁর তখন এমন অবস্থা যে গলা দিয়ে কোনো শক্ত খাবার নামত না, তাই তাঁকে এখন-তখন একটু-একটু দুধ খেয়ে থাকতে হতো। কিন্তু এই যৎকিঞ্চিৎ দুগ্ধপানে কি শরীরের কাঠামো টিঁকে থাকতে পারে! অথচ শরীরের বল যতই ক্ষীণ হলো, শিষ্যদের আধ্যাত্মিক জীবন ও সাধনভজনের প্রতি তাঁর প্রচেষ্টা তীব্রতর হলো। বিশেষত বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীসারদা মা-র বেলা। কেননা সকলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার কার্যত ছিল এঁদেরই উপর। তিনি প্রকাশ্যেই বলতেন: "ভাখো, ওদের ভার তোমদের উপর দিয়ে যাচ্ছি।"

আরো এক-দেড় বছর পর এই কালান্তক ব্যাধি ভয়ংকর রূপে বৃদ্ধি পেয়ে প্রভুর দেহকে জীর্ণশীর্ণ করে দিলে। একেবারে অন্তিমকাল দেখা গেল। তখনো জনস্রোতের বিরাম নেই: তুমি তোমার অলৌকিক শক্তিবলে ব্যাধিমুক্ত হও—এই আকুতিরও বিরাম নেই। বাইরের লোকের সঙ্গে শিষ্যদের দুই-একজনও তাঁকে এই মিনতি করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর নির্বিকার উত্তর: "সে হয় না, আমার নিজের কোনো ইচ্ছাটিচ্ছা নেই। সবই তাঁর ইচ্ছা।"

ক্রমে ক্রমে ঠাকুরকে বিছানায় শুইয়ে রাখাও শক্ত হলো। তিনি উঠে বসে সকলের সঙ্গে কথা কইবেন, অন্তরের উপলব্ধির বিষয়গুলো বিলিয়ে দিয়ে হালকা হবেন—এই তাঁর ইচ্ছা। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন, চারদিক থেকে উঁচু করে বালিশের বেড়া, প্রত্যেক শিষ্যের সমস্যা নিয়ে বলতে লাগলেন।

অন্তিমকাল যে সন্নিকট সেটা জুলাইয়ের এক সন্ধ্যায় স্পষ্ট বোঝা গেল। অসহ্য যন্ত্রণা। তবু তিনি বিছানায় উঠে বসবার জেদ ধরলেন। বসলেনও। বড় বড় দাড়ি গজিয়ে গেছে, বিষম যন্ত্রণায় মুখের একদিক বেঁকে আছে, তবু আয়ত কালো কালো চোখে আলোর দীপ্তি। নদীর স্রোতের মতো সেই আলো ক্রমশ সারা মুখে ছড়িয়ে গেল। এই আলোর দীপ্তি এমনই প্রচণ্ড সুন্দর ও উজ্জ্বলন্ত যে কেউ আর মুখের দিকে তাকাতে পারে না। যতক্ষণ না তাঁদের গুরু এই ধকধকে আলো কমিয়ে আনেন শিষ্যরা অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

কখনো কখনো তিনি এইভাবে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট অবস্থান করতেন। তারপর আস্তে আস্তে কথা বলতেন। কথা বলতে গেলে হাজারো গোখরোর কামড়ের মতো বিষম যন্ত্রণা। তবু তিনি সকলের সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। শিষ্যদের শেষতম সমস্যার সমাধানের পূর্বে তিনি চলে যাবেন, এটা তিনি চান নি। অপার্থিব দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলতেন: "যা জানি তা এত করে তোদের বলি কেন? কারণ তোদের যে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। প্রত্যেক ধর্মগুরু যে ধরাধামে তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। সেই পার্ষদরাই প্রথম তাঁকে বোঝে। তারপর সংসারের আর-পাঁচজনকে বলে। এই যে তোদের বলছি, তোরাই আবার নিরঞ্জন সহজ সত্যটা জগতকে জানাবি। তাতে কোনো ধন্দ থাকবে না, কোনো কেরামতি থাকবে না।...এই যে তোদের নিয়ে এসেছি, আমরা সব বাউলের দল। বাউলেরা দোরে দোরে নামকেত্তন করে ফেরে। কেউ তাদের নাম জানেনা, জানতে চায় না। আমরাও সংসার জগতে তাঁর নামগান করছি, যখন ফিরে যাব কেউ জানবে না আমাদের আসল পরিচয়।...শরীরের খোলের মধ্য থেকে আত্মা যখন কথা বলেন তখন শরীরের বড় কষ্ট, সে-কষ্ট এড়ানো যায় না। যত কষ্ট সব শরীরের, আত্মার কোনো কষ্ট নেই। শরীরের ভাবনা, বস্তুর ভাবনা ছাড়তে হবে। একটা চৌকিতে কেউ বসে আছে, চৌকিটা দেখতে চাস তো লোকটাকে সরাতে হবে। আত্মাও তেমনি, বস্তুর মধ্যে শরীরের মধ্যে সে লুকিয়ে থাকে। সর্বভূতে সেই আত্মা বিরাজমান। দিন আসবে যখন তোরা সব জানতে পারবি। কিন্তু সে-সব পরের কথা।"...একজন শিষ্যকে দেখিয়ে বললেন: "ঐ যে ও, চলছে ফিরছে, যেন খাপ-খোলা ঝকঝকে তলোয়ার। আর ঐ যে হীরানন্দকে দেখছিস, কেমন নম্র ও বিনীত হয়ে আছে, কিন্তু ভিতরটা ভরপুর ব্রহ্মশক্তিতে ঝিকমিক করছে। সাপুড়ের বাঁশি শুনে যেন গুটিয়ে আছে কাল-কেউটে।"

তিনি থামলেন। একটু পরে আত্মমগ্ন হয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন: "কিছুই নিয়ে যাচ্ছি না। সব তোদের দিয়ে ফতুর হয়ে গেলুম। কারো ওপর আর তোদের নির্ভর করতে হবে না। নির্ভর যদি করতে হয় তো এক ঈশ্বরকেই করবি। কেবল তাঁরই শক্তিতে তোরা কাজ করবি। তাঁরই শক্তিতে জগতের সেবা করবি। কাজ শেষে তোরা সব বাউলের দল আবার ফিরে যাবি তোদের আপন ঘরে, ঈশ্বরের কোলে।"

কথা কইতে কইতে সন্ধ্যা নামল। সহসা তিনি সমাধিস্থ হলেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া স্তিমিত হলো, স্তব্ধ হলো হৃৎপিণ্ড আর নাড়ির চলাচল। তাঁর সমস্ত শরীর পাথরের মতো নিশ্চল। প্রদীপের আলোয় অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ধর্মপ্রাণ পার্ষদেরা। এইভাবে একটানা গভীর রাত্রি অবধি। গভীর রাত্রে সমাধি থেকে ব্যুত্থানের পর তিনি প্রায় ঘণ্টা খানেক ধর্মালোচনা করেন।

তারপর রাত যখন একটা, তিনি আবার সমাধিস্থ। আলো-ঝলমল চোখ দুটি অর্ধনামিলিত। ঠোঁটের কোণের স্মিতহাসি ছড়িয়ে গেল সারা মুখে। উজ্জ্বল হলো মুখমণ্ডল। তারপর আস্তে আস্তে ভুরু ও গালের কাছ থেকে সেই হাস্যচ্ছটা অস্তমিত হয়ে মুখের দু'পাশে লেগে থাকে। সেখানে হয়তো ঈষৎ কম্পন। আনন্দের দু-একটি স্ফুলিঙ্গ। ধীরে ধীরে তা-ও মিলিয়ে যায়। অধরোষ্ঠ ক্রমে ক্রমে শক্ত হয়। সমস্ত মুখে নামে মৃত্যুর মতো কঠিন স্তব্ধতা।

পঞ্চদশ অধ্যায়
স্বামী তুরীয়ানন্দর সিদ্ধান্ত

স্বামী তুরীয়ানন্দর কথা যে বলব তা আগেই বলেছিলাম। স্বামী তুরীয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের অন্যতম। আমি তাঁকে জানতাম। এখন তিনি দেহান্তরিত। সেই জন্য তাঁর সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করা যায়।

অন্যান্য সতীর্থ সাধুদের মধ্যে তিনি কী রকম শক্তিমান ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ ছিলেন আমি পূর্বে তার উল্লেখ করেছি। ভারতের ধর্মশিক্ষার সারমর্ম আমি তাঁর পদতলে বসে জেনেছি, তা লিখে বোঝানো যাবে না। আধ্যাত্মিক শক্তিতে তিনি এতই বিশাল ও গভীর ছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে আমাকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হলো।

বেনারসের মঠের সভাপতি ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। মঠ পাঁচিল দিয়ে বিভক্ত। একদিকে গুণাতীত ধাম, অন্য অংশে সগুণের উপাসনা। মঠের গুণাতীত ধামের অংশে থাকতেন প্রায় বারো জন সন্ন্যাসী। নিরাকার ব্রহ্ম বা গুণাতীতের সাধনায় তাঁরা ধ্যানমগ্ন থাকতেন। তাঁদের কোনো পূজানুষ্ঠান ছিল না। ধ্যান-ধারণা ও আত্মোপলব্ধির সাধনায় দিন কাটত। অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও ছিলেন তাঁরা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন বিষয়ে তাঁরা গভীর পড়াশুনো করতেন। দোতলার যে-বাড়িতে তাঁরা থাকতেন তা ছিল নিতান্ত শাদাসিধে, ছায়াচ্ছন্ন। দেয়ালে দরজায় আসবাবপত্রে কোথাও কোনো অনর্থক কারুকর্ম ছিল না। সৌন্দর্যের আড়ম্বরের পরিবর্তে ছায়াশীতল শান্ত পরিবেশ। তপস্যার উপযোগী।

জানিনা কেন যে স্বামী তুরীয়ানন্দর মতো যোগী ও সাধু মহাত্মা গুণাতীত ধামে থাকতেন না। বরং তিনি থাকতেন মঠের সগুণ ধামে। সগুণ অর্থাৎ ঈশ্বরের সাকার উপাসনায় নানাবিধ পূজার্চনা, আচার-অনুষ্ঠান উৎসবাদি ছিল। বস্তুতপক্ষে নিরন্নকে অন্নদান, অনাথকে সাহায্যদান, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা,

জিজ্ঞাসুকে যথাবিধি উপদেশ-নির্দেশ—এই সমস্ত হাজার রকম কাজকর্ম সগুণ পন্থীদের নিত্যকর্ম। ওঁদের কর্মকাণ্ডের পরিধি এত ব্যাপক ছিল বলে নানা রকমের বাড়ি ও মস্ত মস্ত বাগান সমেত জায়গাও ছিল প্রচুর। বাগানের শেষ প্রান্তে বড় বড় বৃক্ষের নিচে স্বামী তুরীয়ানন্দর কুঁড়ে ঘরটি। এসব বিষয়ের বিশদ বর্ণনায় যাব, নাকি সদাচার ও সৎকর্মের মধ্যে মোক্ষের যে পথ স্বামী তুরীয়ানন্দর দৃষ্টিভঙ্গিতে নিহিত সে-প্রসঙ্গে বলব? তার চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত বাণী তাঁর মুখে শোনা যাক।

জুন মাসের এক সকালে স্বামিজীর কুঁড়ে ঘরটিতে আমি গিয়ে হাজির। ঘরে ঢুকে দেখি কী শীতল ছায়া চারদিকে। ঝাঁঝালো রোদ্দুর না-থাকলেও আলোর অভাব নেই, ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তি ও বস্তুকে স্পষ্ট চেনা যায়। সন্ন্যাসীর গেরুয়া বসন পরিহিত তুরীয়ানন্দজী ঘরের মধ্যিখানে একটা কুশন চেয়ারে বসে ছিলেন। তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র বোঝা গেল তিনি পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি পূত পবিত্র। যাকে বলে খাঁটি সাধু। আমি তাঁর চরণধূলি নিয়ে তাঁর সুমুখে মেঝের উপর বসলাম। বসে তাঁকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। আর ঐ সিংহপ্রতিম ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে যেন অজস্র ধারায় স্নেহ ও মধুরতা ঝরে পড়তে লাগল। তার বর্ণনা করা যায় না। তাঁর চোখ-মুখ এমন কি সুমুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়া ইস্তক সমস্তটাই যেন একজন মহান দ্রষ্টা ও প্রেমিকের ঝরণা ধারার মতো। তিনি স্মিতমুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন—কতক্ষণ তা বলতে পারব না, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে শুধোলেন: "তোমার কিছু প্রশ্ন আছে, না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ। আমার প্রশ্ন এই মঠের বিষয়ে, আপনার গুরু পরমহংসদেবের বিষয়েও।"

"তাঁর বিষয়ে আমার মনের কথা অনেকেই জানেন। তিনি তোমার মঙ্গল করুন।"

"মহারাজ, আপনাকে দেখে অবধি শ্রীরামকৃষ্ণের মহান মর্যাদাকে বুঝতে পারি।"

"কী যে বলো! হিমালয়ের সঙ্গে ছুঁচোর তুলনা?" তুরীয়ানন্দ মহারাজ উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। দ্বেষহীন সহজ সরল হাসি, শিশুর মতো দুষ্টুমিতে ভরা। হাসতে হাসতে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে স্থির হতে একটু সময় নিল। —"তোমার প্রশ্নটা আবার বল তো?"

আমি বললুম: "হাসবেন না। আমার জানবার বহু কথা আছে। প্রথম কথাটা আপনারই কাজকর্ম নিয়ে। এই সগুনধামে আপনি কেন বসবাস করছেন? গুণাতীতের চেয়ে কি সগুণ উপাসনা ভালো?"

ঝটপট কোনো উত্তর না-দিয়ে খানিকক্ষণ ভাবলেন তিনি। হাত দুটো জড়ো করে একটু তাকিয়ে রইলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন: "ভাখো, নামরূপহীন গুণাতীত সন্ন্যাসীরা ধ্যান অভ্যাস করে, অন্যান্য অধিবিদ্যার সঙ্গে বেদান্তপাঠও করে। এই সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরকে তাড়াতাড়ি পেতে চায় বলে সর্বদা তাঁর ধ্যান করে। যখন ধ্যান-মনন আর চলে না তখন শাস্ত্রপাঠ। এইভাবে শরীর-মনকে তারা এক ঠাঁই রাখে। আহার-নিদ্রা ছাড়া তাদের এই ভগবদচর্চার কোনো কামাই নেই। ঘুমও তাদের সীমিত। কারণ এ হলো কঠোর জীবনযাপন। সগুণাত্মিকা নাম রূপের সহজ পথ ছাড়লে এ তো অনিবার্য।"

"কিন্তু মহারাজ, আপনি আমাদের কালের অন্যতম প্রধান সাধু, আপনি কেন ও-ধারে সগুণধামে না-থেকে এদিকটায় থাকেন?" আমার প্রশ্নে অধৈর্যের সুর।

তিনি মৃদু হাসলেন। হাসির রেখা মিলিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন: "ভাখো আমি সবই নিই। ঈশ্বরের পথে যে যায় সে সবই নেয়, তার দিকে পদ্মফুল বা ঘুঁটে যা-ই ছোঁড়ো সে সবই নেয়। আমি কেন ও-পাশে গুণাতীতধামে যাই না তোমার এ-প্রশ্নের জবাব আছে শ্রীরামকৃষ্ণে। তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয়েও যখন এদিকটায়—সগুণধামে—ছিলেন তখন আমার মতো চুনোপুঁটির কথা কী। কথাটা এই যে, নাম-রূপের সগুণধামে যাঁরা আছেন, গুণাতীত ধামের মতো তাঁরাও পবিত্র সাধু। বেশি ছাড়া কম নয়। কত অসংখ্য কত বিচিত্র লোক। ঈশ্বর তো সকলের জন্যেই আছেন। কত বিচিত্র তাঁর লীলা। এই সগুণে তাঁর আস্বাদ পাওয়া যায়।

"তোমার যে-প্রশ্ন ওসব প্রশ্ন আমাদের সাধুদের অহংকার জাগিয়ে তোলে। সব কামনা-বাসনা ত্যাগ করে ঈশ্বরের পথে যাওয়া, মুক্তি লাভ করা—সে তো ছেলেখেলা নয়। আমি অবশ্য নানা মত ও পথে ছেলেখেলা বা আনন্দকেই দেখতে পাই, কারণ তিনি আনন্দময়—রসো বৈ সঃ। অন্ধকে আলো দেখাতে গেলে সেই আলোটা তোমার দেখা চাই, সে-আলো কত মধুময়! ঈশ্বরের পথে নানা মত হতে পারে, কিন্তু তিনি যে স্বতঃসিদ্ধ সে-বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। ঈশ্বরকে ভালোবাসলে, তাঁকে দর্শন করলে এ-রকম আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক যে, সকলেই নিজ-নিজ সাধনপথে তাঁকে লাভ করুক। সকল পথে অমৃতের সন্ধান হলে আপন স্বকীয় পথটিও পাকাপাকি জানা যায়। ভারতের সনাতন সত্যটি শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিখিয়ে গেছেন: 'আত্মনো মোক্ষার্থ জগজ্জনো হিতায় চ।' সগুণে থাকলে এই উভয় দিক ভালোভাবে জানা যায়। আমার মতো লোক সগুণ উপাসনারই পক্ষপাতী। নানা নামে নানা রূপে তাঁকেই জানি। সকলেই তাকে জানুক সেটাও চাই। সকলের অন্তরে মুক্তিচেতনা জলে উঠুক। নানা পথে নানা অভিজ্ঞতায় চৈতন্যের রূপটি পাকা হোক।"

"সগুণ অতিক্রম করে গুণাতীত ধামে যিনি মুহূর্তে চলে যেতে সমর্থ; কেন তিনি তবু সগুণে আছেন এখন বুঝতে পারলাম।" আমি বললাম।

"আমি এদিকটায় আছি"—তিনি সপ্রত্যয়ে বললেন: "কারণ এদিকটায় থেকে দু-দিকের হদিশ পাওয়া যায়। সগুণ হলো সহজের পথ। কর্ম আছে, ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আছে, এমনি আরো কত কী। যিনি কর্মিষ্ঠ তিনি কর্মের ফললাভে নিষ্কাম হলে তক্ষুনি ঈশ্বরলাভ করবে। অন্তরে কামনা-বাসনা শূন্য হয়ে যে সাধনভজন করে, ঈশ্বরলাভে তার বিলম্ব ঘটে না। কামনা বাসনা শূন্য হয়ে জীবে প্রেম করলেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। সগুণধামে এই রকম সবই আছে। এ যেন ঈশ্বরের আম-দরবার। এই সগুণে থাকতে আমার ভালো লাগে। শ্রীরামকৃষ্ণই এই সব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।"

তুরীয়ানন্দর মুখমণ্ডল আনন্দে উৎসাহে জ্বলজ্বল করতে লাগল। কোলের উপর হাত দু'খানা চিৎ হয়ে অনড় পড়ে আছে। দীপ্তিময় চোখ ও ঠোঁট-নড়া বাদ দিলে যেন এক অখণ্ড প্রশান্তির প্রতিমূর্তি। যেন বিদ্যুৎপ্রভ প্রশান্তি।

এরপর আমি আসল বিষয়ে এলাম। ধীরে ধীরে এমন স্পষ্ট করে বলতে লাগলাম যেন তাঁর মনোগ্রাহী হয়। "মহারাজ, পশ্চিমের জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী কী?"

"পশ্চিমও যাতে আরো বেশি করে ঈশ্বরকে জানতে পারে তা-ই। এই জানতে পারা বা হৃদয়ঙ্গম করা ব্যাপারটাকে তিনি প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কার কেমন বিশ্বাস তার থিয়োরি নয়—ধর্ম হলো ঈশ্বরাভিজ্ঞতা কার কেমন হলো তারই রেকর্ড। ঠাকুরের বাণী এ-দেশে যেমন ও-দেশেও তেমনি। খোঁজো খোঁজো। ঈশ্বরলাভ করো। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন স্পষ্ট জিগেস করলেন: 'আপনি কি ঈশ্বরকে দেখতে পান?' তিনি বললেন: 'হ্যাঁরে, এই যেমন তোকে দেখছি, তার চেয়েও ভালো করে।' যদি শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনলাভ করে ঈশ্বর হন, তবে তুমি আমিই বা পারব না কেন? ধর্মপথে এগিয়ে পড়। অভিজ্ঞতা হোক, তবে না-হয় বিশ্বাস করো। অভিজ্ঞতা হতে হতে বিশ্বাস আপনিই আসে। অভিজ্ঞতা হলো না, আগেভাগে বিশ্বাস করে বসলুম, সেটা কোনো কাজের কথা না।"

"কিন্তু বিশ্বাসও তো এক রকম নয়। তিনি এক, কিন্তু নানা ধর্মে নানা রকম বিশ্বাস।" আমি বাধা দিয়ে বললুম।

তুরীয়ানন্দজী খুব সহজেই আমার চিন্তাধারাকে গ্রহণ করলেন। বললেন: "হ্যাঁ, সত্য একটাই, সেই সত্যের নাম ঈশ্বর, কিন্তু তাঁর বিষয়ে নানা লোকের নানা পথের নানা অভিজ্ঞতা। তাই তো হবে, তাই তো হওয়া উচিত। নানা যুগে নানা মানুষ ঈশ্বরোপলব্ধি করে যে-বক্তব্য উপস্থিত করেছে, প্রামাণ্য ও আদৃত বিশ্বাসই তাই। আবার এই অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্য বা বিশ্বাসের কথাই

যদি ধরো, ছাখো, তা নানা জনে নানা রকম। জাগতিক সূর্যকে নিয়ে যেমন। আফ্রিকার মানুষদের সূর্য সম্পর্কে ধারণা ল্যাপল্যাণ্ডবাসীদের চেয়ে ভিন্ন। সূর্যপরিক্রমা বিষয়ে তাদের নানা গল্প। আফ্রিকাবাসীরা মনে করে সূর্য দিনে বারো ঘণ্টা কিরণ দেয়, আর ল্যাপল্যাণ্ডবাসীরা বলে সূর্য বছরে ছ-মাস কিরণ দেয়। সূর্য কিন্তু সেই একটিই। ঈশ্বর সম্পর্কেও এই রকম সব অভিজ্ঞতা। তাঁকে আমরা আপনজন বলে উপলব্ধি করি, কিন্তু অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাঁর সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যে কত তফাৎ! কিন্তু সেটাই তো স্বাভাবিক। এক-মেবাদ্বিতীয়ম্ হয়েও তিনি যে বিচিত্র, তিনি যে সহস্রমুখ। এক এক জনের কাছে তাঁর এক এক রূপ ও ছন্দ। নিত্য নূতন বলে অধিক আকর্ষণীয়। ঈশ্বরের রূপে কোনো একঘেয়েমি নেই, কারণ স্বরূপত এক হয়েও তিনি নিত্য নবীন ও বিচিত্র। আনন্দময়। ছেলের কাছে মা কত রূপে কত ভাবে আসে, আমাদের কাছে জগজ্জননীও তা-ই। আধ্যাত্মিক স্তরে আমরা যখন নাবালক তখন ঈশ্বরই সহায়ক ও পালক। একটু সাবালকত্বে পৌছলে তাঁকে আমরা বন্ধুরূপে পাই। বড় হলে জানি তিনিই আমাদের সকল অভিজ্ঞতার সারাৎ-সার। তাঁর সকল রূপই তাঁর এক একটি অংশ মাত্র। আমাদের অমৃত আত্মার এক একটি কলা।"

"মহারাজ, আত্মাকে লাভ করা যায় কী করে?" আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম: "নানা ধর্মের এত গুরু এত শিক্ষাগুরু এত উপদেশ, কেমন ধন্দ লাগে!"

তুরীয়ানন্দজী একটু নড়েচড়ে বসলেন। আমার দিকে একবার তাকালেন, তারপর জানলার বাইরে বাগানের দিকে। আস্তে আস্তে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আমার প্রতি নিবদ্ধ রেখে বললেন: "যাঁরা গুরু তাঁরা ঈশ্বরদর্শন করেছেন। তাঁদের একজনকে খুঁজে বের কর। তিনি তোমাকে বিবাহ বাসরে চারচক্ষু এক হওয়ার মতো এমন সুন্দর রাজ্যে নিয়ে যাবেন যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে সকল খণ্ডাত্মার মিলন ঘটে। যে-কোনো জাত বা ধর্ম থেকে এমন গুরুর আবির্ভাব ঘটতে পারে। হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান যাই হোক-না কেন, এমন গুরু শিষ্য গ্রহণের ক্ষমতা ধরেন। তেমন কারো সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হলে তাঁকে ধরে থাকো, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে পরমপুরুষের দরজা খুলে দেবেন।" এই সময়ে কেউ এসে বিঘ্ন ঘটায় আমার বাদবাকি প্রশ্ন পরের দিনের জন্যে তোলা রইল।

পরদিন বিকেল চারটেয় স্বামী তুরীয়ানন্দর সঙ্গে আবার কথা। মঠের বাগানে সবুজ ঘাসে বেড়াতে বেড়াতে কথা হচ্ছিল। এ-সময় তিনি অন্য মানুষ। সচল, তৎপর, সকলের প্রতি ও সকল কর্মের প্রতি পরিষ্কার নজর। বেড়াতে বেড়াতে শ্বেতবসন ব্রহ্মচারীকে চেঁচিয়ে ডাকলেন, হাসপাতালের কোনো বিশেষ রোগী কেমন আছে খোঁজখবর করলেন। বাগানে মালী কাজ করছে। খানিকক্ষণ তার সঙ্গে দাঁড়িয়েও কথা কইলেন। রোগগ্রস্ত হয়ে কোনো গাছ

শুকিয়ে যাচ্ছে—এইসব কথাবার্তা। বেড়াতে বেড়াতে এইরকম প্রায় দু'ঘটা। এই দু'ঘণ্টা কিন্তু তিনি আমাদের আলোচনার সূত্রটিকে একবারও হারান নি। মালীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: "তোমার তো আরো একটি প্রশ্ন আছে, তাই না? কী সেটা?"

সপ্রশ্ন হলাম: "প্রত্যেক মানুষের যদি ঈশ্বরলাভের পন্থা থাকে, যোগাভ্যাসটি কেমন পন্থা?"

"সে তো চমৎকার!" বললেন তিনি। "এ-বিষয়ে তুমি শিবানন্দর পুস্তিকাটি ভালো করে পড়েছ তো? ঐ রচনাটি গভীর, তাই ছোট। যোগীরা নানা কথা বলে, তাতে বিভ্রান্ত হতে হয়। বিভ্রান্ত না-হয়ে বরং শিবানন্দর কথা শোনো। শিবানন্দ যথার্থ বলেছে। শ্বাসপ্রশ্বাস আয়ত্তে এনে প্রাণায়ামের অভ্যাস করলে, মনঃসংযোগের ক্ষমতা বাড়লে, মানুষ অনেক শক্তিশালী হয়। এতে শারীরিক স্বাস্থ্যও অটুট থাকে। 'ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যু প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং।' যোগশুদ্ধ শরীরের কোনো বয়েস নেই, জরা নেই, ক্ষয় নেই। এটা সত্য। কিন্তু ঈশ্বরলাভ না-হলে দীর্ঘকাল নবীন থেকে কী হবে। ঈশ্বর চিরনবীন।

"যারা যোগাভ্যাস করেন তাদের প্রায়ই একটা বিষয়ে নজর থাকে না। সে হলো অভিজ্ঞতার পারম্পর্য। ধরো, ঈশ্বর পরম সুন্দর—একটা প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর তুমি মনঃসংযোগ করছ। এই সময়টায় তুমি অনেক অভিজ্ঞতার ঢেউয়ের উপর দিয়ে ভেসে যাবে যা আগে লক্ষ্য করনি, লক্ষ্য করনি একটার সঙ্গে আরেকটা অভিজ্ঞতার যোগসূত্র রয়েছে। ক্রমশ দু'এক বছর বাদে চিন্তা-শক্তি গভীর হয়ে, মনঃসংযোগ ক্ষমতা চরম পর্যায়ে পৌছবে। শারীরিক আচরণও বদলাবে। যোগাভ্যাসের সময় বেশ কয়েক মিনিট শ্বাসক্রিয়া বন্ধ থাকে, নাড়ির গতি শিথিল ও বহির্চেতনা রুদ্ধ হয়। এই অবস্থা চলতে চলতে মনঃসংযোগ ক্ষমতা এমন গাঢ় ও গভীর হয় যে সে-অবস্থায় কখনো কখনো হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর যখন উদ্দেশ্য হলো, ঈশ্বরের পরম সৌন্দর্যের গভীরতাকে জানা গেল, তখন যাকে বলে যোগসিদ্ধি তা-ও লাভ হলো।

"ঈশ্বরের ধ্যানে সদামগ্ন প্রাচীন ঋষিরা যে যোগবিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসেছিলেন সে তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনের একটা ঘটনা মাত্র। কিন্তু পরবর্তীকালে যাঁরা যোগবিষয়ে চর্চা করেছেন, তাঁরা ঈশ্বরচিন্তার ধারও ধারেন নি। তাঁরা যোগাভ্যাসের ভেলকি চেয়েছেন। যোগের উদ্দেশ্য ও মর্যাদাকে তারা অধঃপতিত করেছেন। সব রকম আধ্যাত্মিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সতর্ক করেছেন। যদি ক্ষমতাই কাম্য হয় তাহলে তো যে-কোনো রকমের বড়মানুষ, জেনারেল বা দস্যু জমিদার হলেই হয়। যোগের আশ্রয় কেন? যোগের সর্বনাশ করা কেন? অনেক যোগীদের আমি দেখেছি যারা অনেক অদ্ভুত কাণ্ড

ঘটাতে পারেন, কিন্তু তাঁরা ঈশ্বরের ধারেকাছেও নেই । এই ভেলকিবাজদের ধারণা তাঁরা এমন কিছু পারেন দুনিয়ায় আর-কেউ তা পারেন না । কিন্তু সেটা সত্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তো যোগী ছিলেন না, অথচ বহু যোগীকে ঘায়েল করেছেন । কারণ ঐশী সাধনায় এমনিতেই তাঁর হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসক্রিয়া, এমনকি শরীরের সর্ববিধ প্রাকৃতিক প্রণালী আপনা-আপনি কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ থাকত। যোগাভ্যাসের মধ্যে না-গিয়েও যোগীদের সর্ব লক্ষণ তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট ছিল।

"সিদ্ধাই সম্পর্কে সাবধান। যদি তুমি ঐশী সাধনা নিয়ে থাকো, সিদ্ধাইয়ের ক্ষমতা তোমার আপনি আসবে। আর বামন হয়ে চাঁদের নাগাল পাওয়ার চেয়েও অদ্ভুত কথা এই যে, একবার যদি পরম সুন্দরের দর্শন লাভ করা যায় তখন আর-কিছুতেই নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে ইচ্ছে হয় না । যাঁরা বড় ও মহান, সম্পূর্ণ মুক্ত হলেও তাঁরা ক্ষমতার ব্যবহার সীমিত রাখেন। অমৃতের পুত্র অমৃতত্ব লাভ করলে আর ভেলকিবাজী বা ক্ষমতা জাহিরের দিকে ঝোঁকেন না।

"তাছাড়া, আমরা এখন এমন এক ব্যস্ত যুগে বাস করি যে যোগের ভেলকি বা ক্ষমতা অর্জনের জন্যে কারো সময় নেই, ধৈর্যও নেই । মেয়ে-পুরুষ সকলেই আজকাল ভারি ব্যস্ত । এই কারণে ঈশ্বর সাধনায় তারা সহজ ও কম সময়ের রাস্তা চায় । এই কলিযুগে আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে চাওয়াই একমাত্র কথা। সেটা চাইতে হবে। দীর্ঘকাল অন্তর দিয়ে তাঁকে চাইলে তিনি দেখা দেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। বেড়াল-মা বাচ্চাদের কান্না শুনে থাকতে পারে না, তিনি সেই বেড়াল মা'র মতো। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকেই ছাখো না। তিনি বিশ্বেশ্বরী মা-কে পেলেন কেবল দিনরাত্তির কান্নাকাটি আর অনুনয়-বিনয় করে। এই কান্নাটা চাই । এই আর্তি চাই । তবেই তিনি তাঁর মায়ার জাল সরিয়ে দিয়ে তোমার কাছে প্রকাশিত হবেন। তিনি যে করুণাময়ী, তোমার মধ্যেই বিরাজমান। আহা, ঈশ্বরলাভ আজকাল কত সহজ হয়েছে!...নাও, ওঠো, সন্ধ্যে হলো, উপাসনায় বসতে হবে, তুমিও এসো। হরি ওঁ, হরি ওঁ।"

শেষ অঙ্ক

আমার হাতে অধিক সময় নেই। তার মধ্যে যতটা সম্ভব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে জনশ্রুতি ও কাহিনীগুলো সংগ্রহ করেছি। এখন ঠাকুরের সাধনস্থল দক্ষিণেশ্বরে শেষবারের মতো একবার যেতে হবে। এই শেষ তীর্থযাত্রার জন্যে তাগিদও দিয়েছিলেন এক বৃদ্ধা। তিনি ঠাকুরকে দেখেছেন, বিষয়ে আশ্চর্য গল্পও বলেছিলেন আমাকে।

সুতরাং একদিন খুব ভোরে, গঙ্গার উপর সবে সূর্যের প্রথম সোনালি আলো পড়েছে, দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌছলাম। অতি পরিচিত, প্রাচীন ও ক্ষয়িষ্ণু সেই মন্দির, নানা গম্বুজে শোভিত, ধূসর ও জরাজীর্ণ। চারিদিকের অত বড় বাগানটাও আগাছায় ভর্তি। একদিন এখানে কত ধূমধাম ছিল, কত জাঁক ছিল, লোকসমাগমে কী রকম গমগম করত, আজ তা অনুমান করাও শক্ত। তৎপরিবর্তে চারদিকের ধূসর অবক্ষয় আমাদের অভ্যর্থনা করল। যে-বৃক্ষের নিচে ঠাকুর ধ্যান করতেন তা-ও শুকিয়ে যাচ্ছে। চারদিকের এই দৃশ্য আর সহ্য হয় না, তাড়াতাড়ি বৃদ্ধা সঙ্গিনীকে বলি মন্দিরের ভিতরে নিয়ে যেতে। সেখানেও সেই একই অবক্ষয়ের দৃশ্য। মস্ত টানা বারান্দা, বেদীর উপরের মনোজ্ঞ ছাদ—সবই ভয়াবহরূপে ধ্বংসোন্মুখ। রঙের কাজ, পলেস্তারা ঝরে গিয়ে সেখানে মাকড়সার জাল ছড়িয়ে আছে। মাথার উপর সর্বত্র খোপে খোপে কালো জংলি পায়রাদের সংসার। ছায়াচ্ছন্ন নিরানন্দ পরিবেশ। বেদীর অদূরে, পুরোহিত উদাত্ত কণ্ঠে যে-স্তব পাঠ করেছেন তাও যেন ক্ষুধার্ত প্রেতের গোঙানি।

ফেরবার সময় বৃদ্ধা সঙ্গিনীকে তিক্তকণ্ঠে না-বলে পারলাম না: "কোথায় সেই আনন্দ, সেই স্নিগ্ধ জ্যোতি? কী নির্জন ছন্নছাড়া পরিবেশ! এটা কী করে হলো?"

লোলচর্ম বৃদ্ধার চোখেমুখে আভা ফুটল। পাহাড়ের কোলে জলের ধারার মতো তাঁর ললাটে ঈষৎ আলোর ঝলকানি। "আরে, তুমি যে সুখের সন্ধানী গো! ঠাকুরের মহত্ত্ব ও আনন্দ বাইরে পাবে কোথায়? সে তো তাঁর অন্তরের জিনিস! অমন যে বাঁশির সুর সে কি বাঁশিতে থাকে? না কি সে বাঁশিওলার মনের মধ্যে? ঠাকুরের তেমনি। তাঁর আমলে এই দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে দেখেছি কত শত তীর্থযাত্রী, কত বড় বড় রংচঙে বজরা, কত ভিড়! আর এখন? কিছু নেই, সব ফাঁকা। কেন? না, তিনি আর নেই এখানে। তিনি যতদিন দেহে ছিলেন এখানকার সব প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ছিল। তখন বড় মানুষের মেয়েরা কত শত দামী দামী সিলকের শাড়ি ও গয়না পরে আসত। বাড়ির দেয়াল ছিল চাঁদের মতো ঝকমকে। বাবা, এইসব কি প্রাণ দিয়েছিল এখানকার? দিয়েছিলেন তিনি—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি ছিলেন বলেই সব মধুর ছিল।

তিনি চলে গেলেন, সব চলে গেল। নামজাদা পুরোহিত পণ্ডিত বড় বড় রাজা-রাজড়া—তাঁরা কি আর প্রাণসঞ্চার করেন? ঠাকুরের আনন্দময় অস্তিত্ব ছিল বলেই এখানকার সবকিছু প্রাণময় আনন্দময় ছিল। দ্যাখো না, এখন আর ঠাকুরের শ্রীচরণ স্পর্শ পায় না বলে বড় বড় গাছগুলো পর্যন্ত কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে।"

তবু আমার গজগজানি থামে না। "এই যে কত শত সহজ সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন—কই, এগুলো রক্ষা করবার ব্যবস্থা কোথায়? এ যদি ইয়োরোপ হতো, অন্য রকম হতো। ইতিহাসের সামগ্রী হিসেবে সমস্তই সাজানো-গোছানো থাকত।"

বৃদ্ধা আমার কথা শুনে একটু হাসলেন। বললেন: "সঞ্চয় নয়, ত্যাগ। ত্যাগই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী। তা দিয়ে কি ইতিহাস রচনা করা যায়? ওগো, আমি যে তাঁকে দেখেছি। কত কথা শুনেছি তাঁর কাছে। পঞ্চবটীতে ধ্যান-ভজনের পর তিনি প্রায়ই যেতেন আমাদের আটচালার কাছে। তখন তাঁর মুখের সেই ঝলমলে লাবণ্যময় দীপ্তি যদি দেখতে তো বুঝতে কী রকম সর্বত্যাগী ছিলেন তিনি। মনে হতো যেন দেহটাকেও ত্যাগ করেছেন। তিনি ছিলেন সর্বান্তঃকরণে মুক্ত পুরুষ। কোথাও কোনো বন্ধন নেই। এমনকি যে-ঘরটিতে থাকতেন সেটিকে কেউ মনের মধ্যে পুষে রাখবে এমন ব্যবস্থাও রাখেন নি। স্থানকালপাত্রে সীমাবদ্ধ ছিলেন না তিনি। অখণ্ডের ঘর তো, আমাদের সবাইকে উদ্ধার করতেই জন্ম নিয়েছিলেন।"

কথাচ্ছলে বললাম: তাঁকে জানবার মতো কোনো সামগ্রী যদি তিনি না-রেখে যান তো তাঁকে কেমন করে জানব আমরা?"

"দেহ ছেড়ে দিলেও তিনি তো তাঁর সত্তাটিকে রেখে গেছেন।" বৃদ্ধা বললেন। "যে-কেউ নিঃস্বার্থভাবে তাঁকে ধ্যান করবে সে তাঁকে দেখতে পাবে। তাঁকে পেতে চাও তো সর্বত্যাগী হও, ঈশ্বরমুখী হও।"

আমি কিঞ্চিৎ অধৈর্য হয়ে বললাম: "এসব বেশ কথা, মা। আমাদের উদ্ধার কল্পে মহাপুরুষেরা আসেন সে-ও মানি। কিন্তু তাঁরা তো এমন কিছু চিহ্ন ও স্মৃতি রেখে যাবেন যা উত্তরপুরুষকে পরিচালিত করবে।"

"সে-সব এখানে নেই।" বৃদ্ধা বললেন: "আছে গঙ্গার ওপারে—ওই যে ঐ মঠে। ঈশ্বরলাভের জন্যে তিনি যে-রকম ধ্যান করতেন, ওখানে নারী-পুরুষেরা তেমনি করে ধ্যান করে—ধ্যানই তো তাঁর আসল নিদর্শন। ওঁরা তাঁর মতো সাদাসিধে জীবনধারণ করার চেষ্টা করে। এতে কি তাঁকে স্মরণ করা হয় না?"

"দেখুন, কথাটা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারিনি।" অকপটে বললাম: "এমন ঈশ্বর-পাগল দেশে স্থান-কাল-পাত্রের এমন অবহেলা তো কখনো দেখিনি। ভাবতে পারেন, ইতিহাস-ভূগোলের তথ্য নিয়ে বুঝি দাসত্ব করি। না, তা নয়। আপনার মতো আমিও বিশ্বাস করি—ঠাকুরের ব্যাপারে বিস্তর

আলাপ-আলোচনা বা লেখাপড়া নিরর্থক। ও দিয়ে তাঁকে পাওয়া যাবে না। কেমন, তাই তো?"

"হ্যাঁ। শুধু বাক্য দিয়ে কী হবে? অখণ্ড ভাবসত্তাকে কি বাক্যের নাগালে পাওয়া যায়? তাঁর নিজের সম্পর্কে ঠাকুর প্রায়ই একটি কাহিনী বলতেন। একবার তিনি কাশীতে যান তৈলঙ্গের সঙ্গে দেখা করতে। তখন তৈলঙ্গের কঠোর মৌনাবস্থা। কারো সঙ্গে একটি কথা নেই। এই অবস্থায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফিরে এলেন ঠাকুর। এবং আমাদের কাছে তার বৃত্তান্ত বললেন: 'তৈলঙ্গের সঙ্গে আমার কত কথাই না হলো। প্রায় হপ্তা খানেক ধরে আমরা পাশাপাশি বসে ধ্যান করতুম। আর আমাদের কথা হতো। চমৎকার বলেন তিনি, আর কী সহজ তাঁর ভাষা!' আমরা ঠাকুরকে অমনি বলে উঠলুম: 'সে কি গো, তৈলঙ্গ তো কথাই বলেন না, তিনি তো মৌনী।' ঠাকুর বললেন: 'তাতে কী, মৌনী তো হয়েছে কী, মুখের ভাষায় আর কী কথা হয়!'

'তাহলেই ছাখো বাছা, লেখার ভাষা বা মুখের ভাষা কত তুচ্ছ। বাক্য দিয়ে আমরা কোথাও পৌঁছতে পারি না। সামান্য একটু মগজ দিয়ে ভগবান আমাদের বোকা বানিয়েছেন। কিন্তু ঠাকুর তো তেমন সোজা পাত্তর নন, তিনি বোকা হবেন কেন, তিনি ঈশ্বর হলেন। তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।"

"সে যাই হোক, মা। আমি আর ঐ জরাজীর্ণ ঝুরঝুরে জায়গায় তিষ্ঠোতে পারছি না। আমি এখন ঐ মঠে যাবো। মঠের উদ্যম ও নবীনতা আমার বড় ভালো লাগে।"এই বলে আমি বেলুড় মঠে যাবার জন্যে পা বাড়ালুম।

বৃদ্ধা আমাকে কাছে টেনে বললেন: "তোমার কল্যাণ হোক, বাছা। আজ আমার সঙ্গে খাবে তো? বলো।"

কথা দিলুম। তিনি খুশি হয়ে আশীর্বাদ করলেন। বললেন: "তুমি এখানে একটু ঘুরেফিরে ছাখো। আমি বাড়ি গিয়ে রান্নাটা সারি। তুমি দুপুরবেলা আমার ঘরে চলে এসো। খেয়েদেয়ে তারপর বেলুড়মঠে যাবে কেমন? তোমার ভালো হোক বাবা, ভালো হোক। ঠাকুর তোমাকে পথ দেখান।"

বৃদ্ধার সঙ্গে কথাবার্তা বেশ ভালো লাগলেও তাঁর সঙ্গে কাটাবার মতো সময় হাতে ছিল না। আমাকে বেলুড়মঠে যেতে হবে। সেখানে পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে শেষবারের মতো আমার সাক্ষাৎকারের কথা আছে। রামকৃষ্ণ-কথামৃত রচয়িতা পণ্ডিতমশাই বিকেলের দিকে কলকাতা থেকে মঠে আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।

নৌকো করে গঙ্গার উপর দিয়ে যেতে-যেতে দক্ষিণেশ্বরের শুকনো গাছপালা ও ধূসর রঙের মন্দিরের চূড়ো ক্রমশ মিলিয়ে গেল। সমুখে ভেসে উঠল শ্বেতশুভ্র

বেলুড় মঠের শিখর-বৈজয়ন্তী। তালগাছের পাতায় পাতায় তখন বিকেলের রৌদ্র ঝিকমিক করছে। সবুজ বাগানের ফাঁকে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের আনা-গোনা দেখা যায়। নৌকো যতই এগোতে লাগল হলুদ রঙের মঠের দেয়াল, ছাদ, ছাদের চুড়ো ততই স্পষ্ট হলো। পাথর-বাঁধানো ঘাটে নৌকো লাগল। আমি লাফিয়ে নামলাম। কাঠবেড়ালীর মতো তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। ওখানকার জীবন ও কর্মের উদ্দামতা যেন আমাকে পেয়ে বসল।

প্রথম বাড়িটা পেরোতেই লাল-টালির ছাউনির নিচে দেখি পণ্ডিতমশাই আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। তাঁর কাছে গুছিয়ে বসে তাঁর শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম: "পণ্ডিতমশাই, কাল চলে যাচ্ছি।"

তিনি বার কয়েক শাদা দাড়িতে হাত বুলোলেন। তারপর শুধোলেন: ঠাকুরের বিষয়ে যেসব কিংবদন্তি ও জনশ্রুতি সংগ্রহ করেছ তা কি খুব অতি-রঞ্জিত আর লম্বাচওড়া হয়েছে? ওগুলো এমন হওয়া উচিত যাতে ঠাকুরের মহত্ত্বকে বোঝাবার সহায়ক হয়।"

"না, তেমন একটা লম্বা চওড়া নয়। আর তাছাড়া ওগুলোকে বেশ স্বাভাবিক ও বাস্তবসংগত বলেই মনে হয়।"

"না হে, আমি তা বলছি না" তিনি তাঁর মস্ত মাথাটি আমার খুব কাছে এনে বললেন: "আমি বলছিলাম কি, তাঁকে ঘিরে লোকমুখে যেসব কথা আছে তা একদিন সত্য বলে প্রমাণিত হবে।"

"বুঝলাম না।" আমি একটু থ' হয়ে গেলাম।

"এটা তো সোজা কথা।" পণ্ডিতমশাই মাথাটা একটু পশ্চাতে ঠেলে দিলেন: "আরে, যিশুখ্রীস্টকে ছাখো না। সাংসারিক অর্থে তাঁর কোনো জনক নেই। অথচ তাঁর জন্মটা তো সত্য। কেন? কারণ তাঁর পরম সত্তাটি এমন জীবন্ত ও জাগ্রত যে, তাঁকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওরা ভার্জিন মেরীর 'নিষ্কলুষ গর্ভধারণ' নামক ভাষার প্রচলন করলেন। বুদ্ধদেবের বেলাও সেইরকম। তাঁর ঐশী সত্তার সারাৎসারকে বোঝাতে গিয়ে ঐরকম কথাই বলা হলো। সমস্ত কিংবদন্তি ও জনশ্রুতির মর্মকথা আধ্যাত্মিকতার আলোয় যখন জীবনের রসসঞ্চার করে, তখন তা ইতিহাস হয়ে ওঠে।"

"বুদ্ধদেব ও যিশুখ্রীস্টের বেলায় 'নিষ্কলুষ গর্ভধারণ' কথাটা এলো তাঁরা ঈশ্বর হবার পরেই।" আমি বললাম।

"ঠিক কথা।" বললেন পণ্ডিতমশাই। "শ্রীরামকৃষ্ণের বেলাও তা-ই হবে। তিনি এমনই ঈশ্বরান্বিত যে তাঁকে ব্যাখ্যা করে বুঝতে আধিদৈবিক ও অতি জাগতিক ভাষার আশ্রয় ছাড়া লোকেদের উপায় নেই। আমার যা কাজ ছিল, করেছি। তাঁর কথামৃত ধরে রেখেছি।"

"আহা, আমি যদি ঠাকুরের বিষয়ে উঁচুদরের কিংবদন্তিগুলো ধরে রাখতে

পারতুম!" আক্ষেপ করে বললুম: "মুশকিল এই যে, লোকেরা আমাকে যা বলে তার সবটাই অল্পবিস্তর ঘটনার সামিল। একদিন হয়তো আসবে যখন উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভূমির আধিদৈবিক জনশ্রুতি শুনতে পাবো। কিন্তু মশাই, এই একটা কথা জিগ্যেস করতে চাই। ঠাকুরের দেহত্যাগের বহু বছর পর এই বেলুড় মঠের পত্তন। আপনারা এ-জায়গাটার কত যত্ন নেন, আর দক্ষিণেশ্বরে সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আপনারা তার দিকে ফিরেও তাকান না—এর কি কোনো কারণ আছে?।"

"না, কোনো কারণ নেই।" তক্ষুনি জবাব দিলেন তিনি। "তাকিয়ে ভাখো, এখানকার বৃক্ষসকল কী দৃঢ় ও সতেজ, ঘাস কী সবুজ, গাভীরা কত বলশালী, আর সাধুরা, তাঁদের কথা না-বললেও চলে। এখানেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের অধিষ্ঠান। সত্যের সাধকেরা যেখানে বসবাস করেন পরমসত্তা তো সেখানেই বিরাজমান। তাঁর সঙ্গে জীবনের সবুজ বিকাশ। এখানে যা-কিছু দেখছ সবই তাঁর বিচ্ছুরণ।"

"ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভক্তশিষ্যদের বেলাও সেটা সমান সত্য।"

"অনস্বীকার্য।" তিনি বলতে লাগলেন। "গুরুমহারাজের দেহত্যাগের পর আমাদের আর-কোনোখানে যাওয়ার জায়গা ছিল না। এখন তো বেনারস কনখল, বোম্বে, ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ—ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাইরে নানা জায়গায় রামকৃষ্ণ আশ্রম আছে যেখানে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষেরা সম্মিলিত হয়, অমর আত্মার সান্নিধ্যলাভ করে। এইসব আশ্রম ও আস্তানার প্রতিষ্ঠা এত দ্রুত সম্ভব হবে ভাবিনি। কিন্তু সাধুসন্ত ও মহাপুরুষদের অন্তর্জীবনের শক্তিতে সবই সম্ভব। আমরা যারা ঠাকুরের সঙ্গে থাকতাম, আমরা জানতাম সকল তমসার ঊর্ধ্বে তাঁর জ্যোতির্ময় শিখাটি জ্বলছে। মানুষের মধ্যে সেই শিখাটি আমরা সাধনার বলে জাগ্রত করতে পারি। মানুষের জীবনযাপন প্রণালীতে সত্য সংযম ও পবিত্রতা থাকা চাই।"

"তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে থাকেন না কেন?" পুনবায় প্রশ্ন করি।

ঈষৎ পীতাভ চোখে তাকালেন। ভারি অসোয়াস্তি লাগল। মনে হলো আমার অসোয়াস্তি বুঝতে পেরে তিনি চোখ সরিয়ে নিলেন। বললেন: "দক্ষিণেশ্বরে একটা গহীন দিক আছে। তার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের বাইরেটাকে কেন একাকার করে ফেলছ বুঝতে পারি না। ঠাকুর ঐ অন্তঃস্থলে থাকেন, সকল জীবের অন্তরেও তা-ই। জীব চলাফেরা করে, তিনিও চলেন। দেশকালে আত্মা অনিকেত, তাঁর আবার ঘরবাড়ি কী!"

"যদি তাই হয়, তাহলে তো আজ থেকে একশো বছর পর ঠাকুরের সাধনভূমি দক্ষিণেশ্বরে তীর্থযাত্রীরা আর যাবে না?"—পণ্ডিতমশাইয়ের অভিমত জানতে চাইলাম।

"তীর্থ কি বাইরে? তীর্থ তো মানুষের অন্তরে! তবে আর বাইরে ঘোরা

কেন ? মুনাফা লুঠবার জন্যে দক্ষিণেশ্বরকে অযথা ব্যবহার করে কেউ হালকা করে ফেলুক, এটা কাম্য হতে পারে না। ঠাকুর সেখানে এমন-কিছু নিদর্শন রেখে যাননি যাকে সম্বল করে পুরোহিত সমাকীর্ণ একটা মারাত্মক ব্যবসাদারির সূত্রপাত করা যায়।"

"তাহলে আপনিও ইতিহাসের শিক্ষা মানেন না ?" আমি টিপ্পনি কাটলুম।

পণ্ডিতমশাই বললেন: "জানো, সকল নারী-পুরুষের আত্মাকে উদ্দীপিত করার মতো উজ্জ্বলন্ত বিশাল মশাল নিয়ে তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি কি চেয়েছিলেন আমরা সবাই কেবল বিশেষ বিশেষ ধর্মপথ অবলম্বন করি ? তিনি চেয়েছিলেন জাগ্রত ধর্ম আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে মূর্ত হোক। তিনি স্বয়ং তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।"

"পাদরি নয় পুরোহিত নয় যাজক নয়, সব ছেড়ে-ছুড়ে সাধারণ মানুষ আপন-আপন অন্তরে ঈশ্বরলাভ করবে, তা-ও কি কখনো হয়।"

আমার এই মন্তব্যে তিনি বললেন: "ধর্ম তো কোনো যাজকের মুখাপেক্ষী নয়। মানুষের ব্যাকুলতা ও আর্তির মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব। ঠাকুর তা-ই বলেছিলেন। আর আমাদের কালে সেটা একান্ত সত্য। এটা নতুন যুগ। সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্য দিন। বুদ্ধির উজ্জ্বলতা ও অনন্যতায় আজকের মানুষ গর্বিত ও সুস্থিত। ব্যাপার-স্যাপার এমন যে দর্পভরে তাঁরা বলছেন, তাঁরা নিজেরাই এক-একজন ঈশ্বরের বরপুত্র। বহির্জীবনেই যখন এই, অন্তর্জীবনে তখন তার দৌড় কতটা ভেবে দ্যাখো। এখনকার মানুষ মহাপুরুষ ও অবতারের কাছে আর নত হতে চায় না। তাঁরা নিজেরাই অবতার হবেন। তাঁদের চিত্ত স্বর্ণগর্ভ। তাঁরা জন্ম দেবেন ঈশ্বরের, যে-ঈশ্বর সকল কালাকালের পরপারে। একটা দক্ষিণেশ্বর, কপিলাবস্তু বা বেথেলহেম আগলে রেখে সে-জিনিস হবে না। অন্তর্জীবনের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সংসারে যে-আত্মচৈতন্যের স্ফুরণ অনবরত ঘটছে, তার সঙ্গে বিশেষ স্থান বা বিশেষ ধর্মমতের কী ? চিত্তের প্রসন্নতা ও উজ্জীবনের জন্যে নারী-পুরুষেরা মিলে যেখানেই ধ্যানভজন উপাসনা করেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যস্বরূপ সেখানেই বিরাজমান।"

কথা বলার সময় পণ্ডিতমশাইয়ের দু'চোখে আলোর দ্যুতি দেখা গেল। টলমলে অশ্রুকণার মতো পরিপূর্ণ।

আলাপ-আলোচনায় বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যে হয়-হয়। ওপারে দক্ষিণেশ্বর গোধূলির গাঢ় ছায়ায় ডুবে গেল। অস্তসূর্যের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় আলোকিত মেঘের মতো নৌকোর পালগুলো শিথিল করছে মাঝিরা। নৌকোগুলো ধীরে ধীরে পাড়ে আসছে। ডজন খানেক এসে মঠের ঘাটে ভিড়ল। অর্ধনগ্ন মাঝিরা দলে দলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো ফল ফুল আর চালের ধামা নিয়ে। সন্ন্যাসীদের দেবার জন্যে ওরা এনেছে। তাদের চালাঘরের দোরগোড়ায় রেখে ওরা মন্দিরে

গেল আরতি দেখতে ।

সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্রি । চারদিক নিঃশব্দ । পবিত্রতায় ভরপুর ।

পণ্ডিতমশাই জিগ্যেস করলেন : "তুমি কি এখন মন্দিরে গিয়ে ভজনটজন করবে, না চলে যাবে ?"

"না, এখন আর মন্দিরে যাবো না । চলি ।"

চলে আসবার আগে তিনি আশীর্বাদ করে বললেন : "আমায় তো মন্দিরে যেতে হবে । আমি যাই । সকলের প্রতি স্নেহমমতা রেখো । আচ্ছা, এসো তাহলে ।"

তিনি চলে গেলে আমি ঘাটে নামলাম । মন্দিরের ঘণ্টা বাজল । কিছুক্ষণ বাদে সমবেত স্তব-বন্দনার বৃন্দধ্বনি । নৌকোয় বসে শুনতে লাগলাম । এই স্তব-বন্দনা আমি জানি । আমিও তাই গুনগুন করে গাইতে লাগলাম ।

নিস্তব্ধ সুরধ্বনির মধ্যে নৌকো তরতরিয়ে চললো কলকাতার দিকে । ভাবতে লাগলাম, আমি যেন মঠের মন্দিরে বসে বসে সন্ধ্যারতি দেখছি । মনশ্চক্ষে দেখতে লাগলাম, বেদীর ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্রহের সম্মুখে নাচছে সুগন্ধ ধূপ আর অসংখ্য দীপশিখা । অন্দরে সন্ন্যাসীর হাতে নাচছে প্রদীপমালা, আর বাইরে আমি বসে গান গেয়ে চলেছি ।

গঙ্গার ধারে কলকাতায় যখন পৌছলাম, তখন রাত্রি হয়ে গেছে । আকাশে অসংখ্য তারা । নীলচে কালো আকাশ মাথার ওপরে । নির্বিকার । তারাগুলো যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে নিচে নেমে এসেছে । দূরে, পশ্চিম পাড়ে কত রকমের মন্দির, নিচে কত নৌকোর ভিড় । ওখানে আলো জ্বলছে একে একে ।

এই যে গভীর পরিবেশ, গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার আনন্দ ও শান্তি—তার কণামাত্র কি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি ? না, পারি না । মানুষের জীবনধারা এমন স্বচ্ছন্দ ও প্রোজ্জ্বলন্ত হয় কী করে ? এ যেন সত্যের মশাল জ্বালিয়ে বসে আছে । এমন যে আমাদের যুগের বস্তুতান্ত্রিক কালিমা তাকে স্পর্শ করতে পারে না । কী দেখে এলাম ? এতদিন বেলুড় মঠে কি স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম ? জীবনের যে সাত্ত্বিক স্বাদ কখনো পাইনি তাই-ই পেলাম ওখানে ?

এইসব ভাবনার দোলায় দুলতে দুলতে বাড়ি পৌছলাম । 'তৎ' মানে তিনি ঈশ্বর । গঙ্গার ওপারে ঐ সন্ন্যাসীদের চোখেমুখে সেই ঈশ্বরের আভা । পাঠকদের তা কেমন করে বলি ! এই সমাজে সংসারে বাস করে কঠোর সাধনায় মানুষ আত্মার যে-বলিষ্ঠ শান্তি অর্জন করেছে, কোনো ভাষা তাকে ব্যক্ত করতে পারে না । 'তৎ' শব্দের গভীর তাৎপর্যকেও না । সৎ জীবনযাপনই সৎ-কে জানে, সাধু জানে সাধুকে । যেসব মহাপুরুষেরা, ঈশ্বরের সন্তানরা সমগ্র মানবসমাজকে স্তরোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে গেছেন, তাঁদের বুঝতে গেলে আমরাও যে অমৃতের সন্তান সেইটে উপলব্ধি করতে হবে ।

গ্রন্থকার / গ্রন্থ পরিচিতি

ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার কথা পাশ্চাত্য জগতের কাছে প্রচার করে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, বিপ্লবী ও লেখক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৩৬ খ্রী) নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। পিতা তমলুকের বিশিষ্ট আইনজীবী কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে (১৯০৮-৯) ধনগোপাল জীবিকার্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভার্থে জাপান যাত্রা করেন। কিছুকাল পরে মাত্র ১৭-১৮ বছর বয়সে ধনগোপাল আমেরিকায় পাড়ি দেন (১৯১০)। সেখানে কঠোর কায়িকশ্রমের বিনিময়ে তাঁকে জীবন যাত্রা ও লেখাপড়ার খরচ চালাতে হতো। এই সময় তিনি কিছুকালের জন্যে স্থানীয় অ্যানার্কিস্টদের দলভুক্ত হয়ে পড়েন এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভ করেন। অ্যানার্কিস্টদের পক্ষে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করতে গিয়ে ধনগোপালের মধ্যে ভাষণদান ও নিবন্ধাদি রচনার ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে। তাঁর এই ক্ষমতা লক্ষ্য করে অগ্রজ যাদুগোপাল তাঁকে বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবের পক্ষে যথাসাধ্য কাজকর্মে, বিশেষত গুপ্ত সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে নিযুক্ত করেন। এই কাজ করতে করতেই ধনগোপাল বিদেশে ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির দুতিয়ালির কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং আজীবন সে কাজ তিনি ব্রতধারীর মতো নিষ্ঠা ও সাফল্যের সঙ্গে করে গেছেন। তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাই ভারতের প্রতি বিদেশিদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। স্বদেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তুলনাহীন। ইংরেজি ১৯২৬ সনে মিস মেয়ো 'মাদার ইণ্ডিয়া' গ্রন্থ রচনা করে দুনিয়ার সামনে ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইলেন; অতঃপর ধনগোপাল তার জবাবে লেখেন, *A Son of Mother India Answers* (1928)। বিদেশিদের বিদ্বেষভরা এই জাতীয় রচনাদির জবাবে তিনি পরবর্তী কালে আরেকখানি মূল্যবান বই লেখেন, *Visit India with me* (1929)। তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করে ও আমেরিকান এক মহিলাকে বিবাহ করে স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। বিদেশে অবস্থানকালে মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৬ বছর বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয় (১৪-৭-১৯৩৬)। তাঁর একমাত্র পুত্র ধনগোপাল-২য়, নিজগুণে আমেরিকায় সুপরিচিত।

ধনগোপাল রচিত বইপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *Karl the Elephant* (1923), *Caste and Outcaste* (1923), *My Brother's Face* (1924), *Face of Silence* (1926), *Gay Neck* (1927), *A Son of Mother India Answers* (1928), *Chief of the Herd* (1929), *Visit India mith*

Me (1929), *Song of God* (1931) ইত্যাদি। তাঁর একাধিক বইপত্র আমেরিকার বাজারে 'বেস্টসেলার' হিসেবে বহু সংস্করণে প্রচারিত হয়েছে। ধনগোপালের বইপত্র সোভিয়েত রাশিয়াতেও খ্যাতিলাভ করেছে।

বইগুলির মধ্যে *My Brother's Face* রচনাটিতে তাঁর অগ্রজ বিপ্লবী যাদু-গোপালের অসাধারণ বিপ্লবীজীবন উপলক্ষ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিঃস্বার্থ জীবনপণ সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে ; *Gay Neck* বইখানির জন্যে তিনি আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশান কর্তৃক নিউবেরি-মেডাল পুরস্কারে ভূষিত হন (১৯২৭)। শেষোক্ত এই বইখানি চিত্রগ্রীব নামে এবং *Chief of the Herd* বইখানি যূথপতি নামে বাংলায় ইতিপূর্বে কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক সাধকজীবন অবলম্বনে রচিত *Face of Silence* নামক বইখানির ভাষান্তর প্রচার বাংলা অনুবাদ সাহিত্য ও প্রকাশনা জগতে এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি বিশেষ।

আমাদের আলোচ্য ধনগোপালের *Face of Silence* (1926) বইখানি বিদেশে ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা এবং সনাতন সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচারে অসাধারণ কৃতিত্বের দাবিদার হিসেবে স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতিলাভ করেছে। সর্বধর্ম সমন্বয় ও জনকল্যাণকামী শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক সাধকজীবন অবলম্বনে রচিত বইখানি প্রসঙ্গে ধনগোপালের অগ্রজ বিপ্লবী যাদুগোপালের কথায় জানা যায় : ফরাসি মনীষী রোমাঁ রোলাঁ তাঁর ইংরেজি নবিশ সহোদরার কাছ থেকে বইখানির কথা ইংরেজিতে শুনে তিনি ফরাসি ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর সাধকজীবন অবলম্বনে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, ১৯২৭)। এবিষয়ে মতান্তর থাকলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধনগোপালের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

একাধারে ধনগোপালের চিত্রকাব্যময় ভাষা ও বর্ণনার সঙ্গে সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের তদ্‌গত অনুবাদ যেন সোনায় সোহাগার মতো আশ্চর্য এক যোগাযোগ ও উপভোগ্য সৃষ্টিকর্ম। এ রচনার প্রতিটি ছত্রই অধ্যাত্মজগতের রূপ-রস ও বর্ণগন্ধময়। পাঠক তার পরিচয় পাবেন প্রতিপদে।

অনুবাদক সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ম্যাক্সমুলার রচিত, শ্রীরামকৃষ্ণ : জীবন ও বাণী শীর্ষক বইখানি অনুবাদ করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন।

অমলেন্দু ঘোষ।